নিশীথ সূর্য্যের দেশ

অমল সান্যাল

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৫২

দাম—আড়াই টাকা মাত্র

দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ, ২১৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
২২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
অমল সান্যাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমার স্ত্রী কমলাকে

র্চন্দ্রিকা

াতেও দ্বীপ আছে। সে দ্বীপ—চাবাগান।
একটা উপনিবেশ—সবুজ উপনিবেশ। আবহমান
লয় হ'তে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত এমন কি তাকেও
াতি এসেছে—তারা পাঞ্জাবী াালী, বিহারী,
, সাঁতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওঁ, র ।।৳ম।, মেচ, নেপালী,
, চীনা। বুকের র ল ক'রেছে এরা সেই
নিজেরা প্রদীপের তেল মেখে আলো তুলে ধ'রেছে
কয়েকজনে ন্যে। অত্যাচার আর শোষণে রক্তাক্ত হ'য়েছে
বুজ মাটি।

এখানে দাস সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ পর্য্যন্ত সব সমাজের
াবাণুর সংঘর্ষ চলেছে—কারও ধ্বংসের জন্যে, কারও সৃষ্টির জন্যে।

দিগন্তে যখন সূর্য্য উঠেছে তখনও এখানে রাত্রি—নরওয়ের হেমারফেষ্টের মত। এই হেঁয়ালিভরা, সুন্দর অথচ কুৎসিৎ দেশটির পরিচয় রইলো এই উপন্যাসখানায়।

উপন্যাস খানা ঠিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই লেখা। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বেদনার টিকা বহন করতে হ'য়েছে তাকে। আমি কেন বইখানা এতদিন ছাপাতে পারিনি সেইটাই আজকের রাজনীতির বড় প্রশ্ন।

—লেখক

কোরকদী (ফরিদপুর)।

প্রভাতের নীল আলোয় ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে আছে চায়ের সবুজ পাতারা। মাঝখানে লাল টকটকে ফ্যাক্টরীটা সৃষ্টির ধ্যানে স্বপ্নাতুর।

উত্তর দিগন্ত জুড়ে হিমালয়ের বাক্‌হারা-ধূসর-চাহনী। চা-গাছের পাহারাদার শিরীষ-গাছেরা শুধু চেয়ে থাকে সেই নির্বাক-রহস্য-চাহনীর দিকে। অপলক দৃষ্টি।

ম্যানেজার অশোকবিজয় সেনও চেয়ে ছিলেন। কিন্তু শুধুই চেয়ে ছিলেন। তাঁর সুদূর দৃষ্টি জুড়ে ছিলো চা-বাগানের অতীত ইতিহাসের এক অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতা—এক তরঙ্গায়িত উপলব্ধি।

চা-বাগানের এই প্রাভাতিক শান্ত পটভূমিকায়ও ঝড়ের গুমরানি ...ছ। সে ঝড় ম্যানেজারের মনে। তাঁর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মনে কালকের ...ক্ষুব্ধ ঘটনার ঢেউ উঠেছে।

...লকের হতবুদ্ধিকর ঘটনাটা তাঁর এই জ্যোছনা টী এষ্টেটের ...বছরের ঠাস্‌-বুনোট স্মৃতি একের পর এক হাজির ক'রছে এনে। ... মত ইন্‌স্‌পেক্‌সান্‌ বাংলোর সবুজ জানালার দিকে স্তিমিত ...য়ে তিনি ভাবছিলেন এ বাগানে তাঁর জীবনের আদি

... জঙ্গলে পূর্ণ ছিলো এ অঞ্চল—যখন তিনি প্রথম এ বাগানে আসেন। এতই ঘন যে গাছের আগায় নিশান উড়িয়ে তবে রাস্তা

বানাবার নিশানা ঠিক ক'রতে হ'য়েছে। দিন-দুপুরে সে বনে বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতো। কতদিন কত গরু-বাছুর গোয়ালেই মারা প'ড়েছে বাঘের হাতে। কান পাতলে আজও বাঘের ডাক শোনা যায়,—কিন্তু সেদিন কান পাতারও প্রয়োজন ছিলো না। আজও অসতর্ক কুকুরের গায়ে রাত্রির অন্ধকারে বাঘ এসে লাফিয়ে পড়ে,—কিন্তু সেটা ক্বচিৎ কোনদিন। আগের সাথে তার তুলনাই হয় না।

সেই অরণ্যের চির-স্তব্ধতার রাজ্যে আজ কলের ঝঙ্কার উঠেছে। একদিন যেখানে বাঘ আর ভালুক, হাতী আর গণ্ডার নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা ক'রেছে, আজ সেখানে, ভোটানের সেই সীমান্তে সভ্য মানুষের সর্বাধুনিক জীবনযাত্রা! এর পেছনে কার দান? বন্য প্রকৃতির পরাজয়ের যে অজস্র স্বাক্ষর চারিদিকে—এ কার স্বাক্ষর? ম্যানেজার ভাবেন কত সুদীর্ঘ দিন আর রাতের কত কামনা-বাসনা, স্বপ্ন-আকিঞ্চন রূপায়িত এই বাগানের মধ্যে। ফ্যাক্টরী আর বাগান, বাংলো আর বস্তী যেন তাঁরই অখণ্ড অস্তিত্বের বিক্ষিপ্ত রূপান্তর। ওরা আর তিনি যেন এক এবং অভিন্ন।

বাগানের প্রথম পর্বে বছরে মাত্র একশো কুড়ি মণ চা উৎপাদন হ'তো। আর আজ? আজ সেই উৎপাদন চব্বিশ হাজার মণে দাঁড়িয়েছে। চা-ও এতই নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিলো যে স্থানীয় বাজারেই শুধু সেটা বিক্রী হ'তো। আর আজ? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরী ক'লকাতায় সে চায়ের কত আদর, কত চাহিদা। কিনবার জন্যে কী অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা!

আগে কিম্ভূতকিমাকার প্রাগৈতিহাসিক মেটে রাস্তা বেয়ে গরুর গাড়ী কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ ক'রতে ক'রতে ঢিমে তেতালায় নিকটবর্তী রেল ষ্টেশানে সেই চা-এর চালান নিয়ে যেতো। আর আজ? পাঁচখানা

বড় বড় ফোর্ড কোম্পানীর লরী পাথরে-বাঁধানো পথ দিয়ে চায়ের সদাচঞ্চল পাহাড়টিকে খালি ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে সদাই মোতায়েন।

ম্যানেজারী নিতে আসার পর থেকে কত জন কত ভয় দেখিয়েছে—এ বাগানের মাটির অল্প নীচুতে নাকি বালুর স্তর আছে—কিছুদিনের মধ্যেই গাছপালা সব শুকিয়ে যাবে ইত্যাদি।

তিনি ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার ক'রে ভাল সারের ব্যবস্থা করে গাছের কি চমৎকার উন্নতি ক'রেছেন। কাল্পনিক বালুস্তরের কোন চিহ্নই আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। রোলিং আর রোষ্টিং-এর উন্নতি ক'রে চায়ের কুয়ালিটির কি চমৎকার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

কুলি আর বাবুদের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধু কাজের ছিলো না—হৃদয়েরও সম্পর্ক ছিলো। তাই তারা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রতো, ভালবাসতো। কত কুলি তাঁকে বাবা বলে ডাকে; কত বাবু তাঁকে দাদা, কাকা ব'লে থাকেন। চা-বাগানের ম্যানেজারের জীবনে সেটা ব্যতিক্রম। কিন্তু কালকের ঘটনার পর কে বিশ্বাস ক'রবে সেসব কথা। কালকের ঘটনা প্রমাণ ক'রে দেয় কতখানি মিথ্যা আর কৃত্রিমতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো সে সম্পর্ক। ম্যানেজারের আত্মস্থ দৃষ্টিতে কেমন হতাশা ঘনিয়ে ওঠে। নিজের শত কীর্তি যেন ধূসর পাহাড়ের শৃঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায়। যতখানি শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন, আজ যেন ততখানি উপহাস, বিদ্রূপ আর রোষের পাত্র তিনি। এ জীবন তিনি বইবেন কি ক'রে!

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, ম্যানেজার তাঁর ছবির মত বাংলোর সাদা রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাক্টরীর মধ্যে যেন নিজের বিশ্বরূপ আবিষ্কার করেন। ধীরে ধীরে একটি সুন্দরী তরুণী পেছন থেকে এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে ডাকে—বাবা!……

জ্যোছনা টী এষ্টেটের বৈচিত্র্যহীন জীবনে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্য জেগেছে। ম্যানেজার বাবু নাকি ক'লকাতা থেকে একজন ডাক্তার কুড়িয়ে এনেছেন। কতজনে কত কি মন্তব্য করছিলো—রং চড়িয়ে অথবা একেবারেই রং নামিয়ে।

সেই কথাই বলছিলেন ম্যানেজার বাবু অফিসে বসে, একদল কর্মচারী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে।

বুঝলেন ইঞ্জিনীয়ার বাবু, ছেলেটির পরিচয় পেয়েই আমার কেমন মনে লেগে গেলো। অমন স্বার্থত্যাগী ছেলেই তো আমাদের চাই ।

সবাই কৌতূহলী চোখে ম্যানেজার বাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। কেবল ইঞ্জিনীয়ার বাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে তাঁর টাক মাথাটা কয়েকবার নাড়লেন সম্মতির ভঙ্গিতে। ম্যানেজার যা বলেন ভালোভাবে না জানলেও তাতে তাঁর সমর্থন থাকে বরাবরই। ওটা তারই চিহ্ন।

ম্যানেজার বাবু তাঁর উজ্জ্বল চোখ জোড়া এইবার এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের দিকে ফিরিয়ে বললেন,—কাশীপুর থেকে শ্যামবাজার যাচ্ছিলাম। বাসের প্রতীক্ষায় আছি হঠাৎ দেখি কিছুদূরে একটা কার-খানার গেটের সামনে একটা ছোটখাট ভীড়। কেমন কৌতূহল হ'লো। গিয়ে দেখি একটা লোক চীৎ হ'য়ে পড়ে কাৎরাচ্ছে। তার বুকে প্রকাণ্ড একটা দগ্‌দগে ঘা। লোকটা যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে উপস্থিত লোকজনের প্রশ্নের উত্তরে বলছিলো,—কারখানায় কাজ করতে করতে হঠাৎ কেমনভাবে তার বুকটা পুড়ে গেছে। কয়েকদিন সে কারখানায় কাজে যেতে পারে নি। সেদিন কোন রকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এসেছিলো। কিন্তু ম্যানেজার তাকে আর কাজে নেন্ নি। কত কাকুতি-মিনতি করেছে সে। কোনই ফল হয় নি তাতে। এদিকে

ঘায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর ফিরে যেতেও পারে নি। তাই সেখানে পড়ে আছে। কথাগুলো শোনার পর কেউ কেউ একটু সহানুভূতির মন্তব্য ক'রলো কতজন মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলো। একটি ছেলে কেবল দেখি এগিয়ে গিয়ে অসঙ্কোচে এবং নিঃশব্দে তাকে ঘাড়ে তুলে নিলো—তার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। গম্ভীরভাবে ছেলেটি শুধু বললো—'চুপ ক'রে পড়ে থাকো তুমি, নড়াচড়া ক'রো না!' প্রবল কৌতূহল হ'লো। ছেলেটিকে অনুসরণ ক'রলাম। এমন প্রাণবান্ ছেলেটির পরিচয় না নিয়ে ফিরে যাবো! বাগানে তো আমরা মানুষ চোখে দেখতে পাই না বড়।

বাবুদের মুখটা একটু কাল্‌চে মারলো।

তিনি বলে চললেন, হাসপাতাল পর্যন্ত পাছ পাছ গিয়ে ছেলেটির পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে সম্প্রতি ডাক্তারী পাশ করে চাকুরী খুঁজছে। তক্ষুনি সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললাম মনে মনে। বাগানে আর একজন ডাক্তার না হ'লেও চলছিলো না তো—তাই! একটু হেসে তিনি পাশের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, ডাক্তাররা প্রায়ই মানুষ হয় না কিনা—তাই একজন মানুষ ডাক্তার নিয়ে এসেছি।

ইঞ্জিনীয়ার বাবু আবার টাক্ আন্দোলিত ক'রে বললেন,—ঠিকই ক'রেছেন; আমিও আর একজন ডাক্তারের কথা ভাবছিলাম। আপনাকে ব'লবো ব'লবোও মনে করেছি—

ম্যানেজার বাবু হাত উঠিয়ে আবার ব'ললেন, এই দেখুন মশাই, আপনাদের আমি অনেকবার বলেছি না—I hate the brown capitalists! এরা মানুষ না! দেখুন তো—যে লোকটা সারা-জীবন তোমার ফ্যাক্টরীতে কাজ ক'রে এলো প্রাণপাত ক'রে, তাকে অক্ষম দেখে তুমি আজ ঘাড় ধ'রে তাড়িয়ে দিলে! এদের ধ্বংশ যে অনিবার্য সেটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি দিব্যচোখে!

একটু থেমে তিনি বল'লেন, এ বিষয়ে আমাদের বাগান কিন্তু ঢের ভালো, কি বলেন? ব'লে তিনি গর্বের সাথে তাকালেন সবার দিকে মতামতের জন্যে—যদিও তিনি জানেন, চা-বাগানের ম্যানেজারদের কথায় অমত করে না কেউ কোনদিন।

ইঞ্জিনীয়ার বাবু আর একবার মাথা দুলিয়ে ব'ললেন,—হ্যাঁ আমাদের বাগান ঢের ভালো। দেখছি তো সব আশেপাশের বাগান-গুলো এই কুড়ি বছর ধ'রে।

দু'একজন ছোকরা বাবু মুখ টিপে হাসলো। চুনাইএর ওদিক থেকে বইদারের নাম ডাকার একটানা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। ইন্‌স্‌পেকসান্‌ বাংলোয় কোন্‌ সাহেব নাকি এসেছে শুনে ম্যানেজার বাবু উঠে পড়লেন। সভা সে সময়ের মত ভাঙলো।

ম্যানেজার বাবুর মুষ্টিমেয় গুপ্ত বিরোধী পক্ষ ব'লে বেড়ালো—লোকটা একেবারেই পাগল, না হ'লে রাস্তা থেকে ডাক্তার কুড়িয়ে আনে! বুড়ো হচ্ছে আর ভীমরতি ধরছে লোকটার।

সেই ডাক্তার। অল্পবয়সী ছোকরা ডাক্তার। রাত্রে শুয়ে আছে। ঘুম আসছে না ভালো ক'রে। নতুন জায়গা। বিচিত্র ধরণ। কেমন মাইলের পর মাইল সবুজ চা বাগান; দিগন্ত জোড়া হিমালয়। কেমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘর, কেমন সব লোকজন। এমন জায়গার অভিজ্ঞতা তার জীবনে প্রথম। শেষ রাত্রের দিকে আধো তন্দ্রার মধ্যে সে কতকগুলো পায়ের ধুপ্‌ ধাপ্‌ শব্দ শুন্‌লো বাইরের বারান্দায়। ধড়মড় করে উঠে ব'সে তাকালো। সার্সীতে যেন কাদের সচল ছায়া। রাত্রির নিঝুমতার সাথে অদ্ভুত চলাফেরার শব্দ আর অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ মিলিয়ে কেমন যেন ছমছমে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি

ক'রেছে। একটু ভয়ই হ'লো তার। ডাকাত পড়লো নাকি! অবশ্য, ভয়ের কারণ ছিলো না তার। কেননা, সে শুনেছিলো, বাইরে বারান্দার বেঞ্চে নেপালী চৌকিদার তার ভোজালি খুলে শুয়ে থাকে। পাহারা দেয় এই বাসা।

তাই, একটু পা টিপে টিপে গিয়ে দরজার ছিট্‌কানিটা একটু খুলে সে দেখলো, কতকগুলো লোক ম্যানেজারের ঘরের সিঁড়ির দিকে চলেছে। হঠাৎ দুর্বোধ্য একটা হুঙ্কারের সাথে সাথে অন্ধকারের মধ্যে নেপালীর ভোজালি ঝলকে উঠলো। লোকগুলো ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলো। নেপালী ওদের দিকে রুখে এসেছে। একটু পরেই জায়গাটা জনশূন্য হ'য়ে গেলো। এইবার সাহস পেয়ে ডাক্তার গিয়ে হিন্দীতে চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে চৌকিদার?

চৌকিদার দীর্ঘ একটা সেলাম দিয়ে হিন্দীতে বললো —এখানে সোমবারে এই রকমই হয় বাবু। সোমবারে হাট হয় কিনা। তার আগের দিন ওরা মজুরী পায়। হাট থেকে হাঁড়িয়া কিনে খায় আর মারামারি করে ম্যানেজার বাবুর কাছে নালিশ ক'রতে আসে।

ডাক্তারের মানস চোখে এক আজব দেশের সীমান্ত ভেসে ওঠে। সেই দেশেই তাকে কাটাতে হবে ভেবে মনটা কেমন হতাশার গভীর সমুদ্রে ডুবে যায়। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার যেন তার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের একটা প্রতীক হয়ে ওঠে।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। তবু ম্যানেজারের বাংলো যেন ঘুমের দেশে তলিয়ে আছে—এমনি নিঃসাড়,

নিস্পন্দ। ডাক্তার কাঁচের সার্সী দিয়ে উত্তর দিকে একবার চাইলো—অতলস্পর্শী রহস্যময়তায় হিমালয় দাঁড়িয়ে। মনের মধ্যে একটা উল্লাসের সাড়া জাগে। দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সে। কি চমৎকার! কি অপূর্ব! কুয়াসা মাখানো সকালের সোনালী রোদে ছবির মত পাহাড় উত্তর সীমান্ত-আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া। সামনেই বাগানে ফুলের গাছে থোকা থোকা রঙীন ফুল। শরতের সোণালী রোদ মেখে যেন সমগ্র বাগান অঞ্চল ঝলমল করছে। চারিদিকের সবুজ আর নীলের দিকে চেয়ে কিছু আগেকার অন্ধকার ভবিষ্যতটাকে আর তত অন্ধকার ব'লে মনে হলো না তার। ডাক্তার দাঁড়িয়ে এই স্বপ্নময় প্রভাতের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছে। হঠাৎ নজরে পড়লো কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ, সম্ভবতঃ বাগানের কুলি দাঁড়িয়ে আছে,—ছন্নছাড়া চেহারা লেংটী পরা। দেখলে কেমন লজ্জা হয়। একজনের চোখ টক্‌টকে লাল। এরাই বোধ হয় কাল রাত্রে সোরগোল করছিলো।

প্রভাতের মোহন স্পর্শে তার রাত্রির ভয় ও হতাশার ভাব কেটে গিয়েছিল অনেকটা। এগিয়ে গিয়ে সেই লালচক্ষু লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো—ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

লোকটা হিন্দী বাংলা এবং সাঁওতালী ভাষা মিশিয়ে ছাড়া ছাড়া ভাবে যা বললো তার অর্থ হচ্ছে এই—কালরাত্রে তার শ্বশুর তাকে মেরেছে। চোখে মারের চিহ্ন দেখালো।

বৌকে কাপড়-চোপড় দেয় না বলে এবং আরও অনেক পারিবারিক কারণে কাল রাত বারোটায় সে যখন ফ্যাক্টরী থেকে ফিরছিলো তখন মেরেছে। কথা বলার সময় লোকটার মুখ থেকে ভক্‌-ভক্ করে হাঁড়িয়ার গন্ধ বের হচ্ছিলো। জিভেতেও বেশ কিছুটা জড়তা। শরীরের টলায়মান ভাব। পাশেই একজন স্ত্রীলোক

দাঁড়িয়েছিলো। যেন মূর্তিমতী বিষাদ। সম্ভবতঃ ওর স্ত্রী। শ্বশুরের জামাই আদরের হয়তো ও নীরব সাক্ষী। বাপের বিরুদ্ধে সাক্ষী।

ডাক্তার আরও প্রশ্ন ক'রে জান্‌লো, লোকটার বাড়ী তুমকা জেলায়। রাণীগ্রামে। জাতিতে মোহলী। মত্তাবস্থায়ও তার ঠিক আছে সাঁওতালদের চেয়ে জাতিতে সে বড়।

ইতিমধ্যে সারা বাড়ীতে সাড়া জেগেছে। একজন ঝি এসে ঘর ঝাঁট দিয়ে গেলো। কোন্ জাতির সে বলা মুস্কিল। একটু পরে ঠাকুর এসে লুচি ও চা রেখে গেলো ছোট্ট গোল টেবিলটায়। চেয়ারটা টেনে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিলো। ফিট্‌ফাট্ তার ধরণ। কিন্তু, নীরব।

স্বাচ্ছন্দ্যের একটা মোহময় আবেশ সৃষ্টি হলো ডাক্তারের মনে। তার অন্ধকার অতীত যেন ব্যঙ্গভরা হাসি হাসলো লুচির টেবিলের দিকে চেয়ে। স্প্রিংএর খাটের ধব্‌ধবে বিছানা আর ফুলকাটা রূপালী বিদ্যুতের শেড যেন তার জীবনের পেছনের অধ্যায়কে উপহাস করলো একটু।

জলখাবার খেয়ে বারান্দায় পায়চারী করছিলো ডাক্তার। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামছিলেন ম্যানেজার বাবু। শুভ্র-জ্যোতির্ময় মূর্তি। যেন নবারুণের আভাস জেগেছে তাঁর মুখে। সুস্নিগ্ধ গাম্ভীর্য তাঁর ঠোঁটে, তাঁর কপালে। তুষার শুভ্র হাতের রক্তপদ্মের মত তালু দিয়ে কপালটা দু'একবার রগড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সামনেই ডাক্তারকে দেখে প্রসন্ন হেসে বললেন—কি, কেমন লাগছে?

ডাক্তার ওঁর মুখের দিকে একবার চেয়ে মাথা নীচু ক'রে মৃদু হেসে ব'ললো এখনও বলবার ঠিক সময় হয়নি।

মৃদু হেসে ম্যানেজার বাবু বললেন, তা ঠিক। রাত্রে ঘুম হ'য়েছিলো তো? নতুন জায়গা—

'বাবা'—বলে সেই রক্তচক্ষু লোকটা হঠাৎ কোত্থেকে হাত জোড় করে এসে হাজির। সে এই সময়টিরই প্রতীক্ষা করছিলো অনেকক্ষণ ধ'রে। যেমন আচমকা সে এসেছিলো, তেমনি আচমকাই কেঁদে ফেললো ঝর ঝর করে। মাথা নীচু ক'রে ঠোঁট বিকৃত ক'রে কান্না চাপতে চাপতে বলতে লাগলো, 'শ্বশুর আমাকে মেরেছে বাবা কাল রাত্রে! আমি'—

ম্যানেজার বাবু ওকে আর বলবার সুযোগ না দিয়ে কাঁধে একটা সস্নেহ চাপড় দিয়ে ব'ললেন,—যা, যা, এখন কাজে যা, পরে শুনবো সব—বলেই হেসে ডাক্তারবাবুর দিকে এগোতে এগোতে বললেন—যত সব! হাঁড়িয়া খেয়ে মারামারি করবে আর এসে জ্বালাতন করবে। কাল সোমবার গিয়েছে কিনা। আচ্ছা, এবার চলুন যাই ডাক্তারখানায়। আজই কিছু কিছু কাজকর্ম বুঝে—

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ কথাটা লুফে নিয়ে ব'ললো হঁ্যা, হঁ্যা—দেরী ক'রে আর লাভ কী।

দু'জনে ডাক্তারখানার দিকে চললেন। লোকটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে একবার পিছু পিছু যাবার চেষ্টা করলো। আরও কিছু বলার ছিলো যেন তার।

ডাক্তারখানা। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ওষুধের আলমারী সাজানো। রং-বেরংএর ওষুধে ভর্তি। দেখলেই বোঝা যায় যুদ্ধের বাজারেও এ বাগানের ওষুধের ষ্টক্ মন্দ নয়। এসব অঞ্চলে আগে রীতিমত ম্যালেরিয়া হতো। ম্যালেরিয়ার আতঙ্কে কুলিরা আসতে চাইতো না। স্যানিটেশান-চিকিৎসা প্রভৃতির উন্নতিতে আজকাল আতঙ্ক কিছু কিছু কমেছে।

ডাক্তারখানার লাগোয়া একটা ছোটখাট হাঁসপাতাল আছে। জন্ আষ্টেক রোগীর থাকার বন্দোবস্তও আছে। কিন্তু, যে কোন কারণেই হোক হাঁসপাতালকে কুলিদের বড় ভয়। নেহাৎ বিপদে না পড়লে আর আসতে চায় না এখানে। ঠাট্টা করে ডাক্তারখানাকে ‌ ‌ বলে ডাকাতখানা।

আইডোফর্ম এর এক ঝলক গন্ধের সাথে সাথে শব্দ উঠলো—'নমস্কার'। সঙ্গে কয়েক জোড়া জুতোর মৃদু শব্দ। নমস্কার বিনিময়। নতুন ডাক্তার এখানকার বড় ডাক্তারের প্রদর্শিত একখানা খালি চেয়ারে আড়ষ্টভাবে বসলো। সামনেই লম্বা টেবিল। সবার মুখেই সস্মিত হাসি। বড় ডাক্তার একটু হেসে বললেন—তাহলে শেষ পর্যন্ত এলেন চা বাগানে!

নতুন ডাক্তার লজ্জিতভাবে হাসলো একটু।

ম্যানেজার বাবু ব'ললেন, কেমন এবার হলো তো। আর একজন ডাক্তার চাই, আর একজন ডাক্তার চাই বলে আমাকে একেবারে পাগল ক'রে তুলেছিলে তোমরা।

—কি অপরাধ বলো! চা-বাগানে ডাক্তারী ক'রতে ক'রতে হাড় কালো হ'য়ে গেলো একেবারে! এই বাইশ বছর চারদিন চাকরী হলো। একই সাথে তো এসেছি আমরা। আর কত সয় বলো?

বড় ডাক্তার ম্যানেজারেরই আত্মীয়; তাই, তুমি বলেন ম্যানেজার বাবুকে।

—তা হইলে ম্যানেজার বাবু, আর একজন কম্পাউণ্ডারের দরকার হইলো যে—আমারও চাকরী তো এই বাইশ বছর কুড়ি দিন।

নতুন ডাক্তার তাকিয়ে দেখলো ডাক্তারখানার ঘর আর ওষুধ দেবার ঘরের মাঝে একখানা কালো পর্দার সঙ্কুচিত অংশে একজোড়া সাদাটে

ভ্রূর নীচে দুটো জোরালো চোখ তাঁর দৃষ্টির দিকে স্থির হ'য়ে আছে। সেই তেরছা দৃষ্টিওয়ালা মুখে একটু একটু রহস্যের রেখা।

ম্যানেজার হেসে ব'ললেন, তাহ'লে আমাকেও বলতে হয় আর একজন ম্যানেজার চাই, আর একজন ম্যানেজার চাই!

বড় ডাক্তার খাতায় লিখতে লিখতে কলম থামিয়ে খাতার দিকে চেয়েই বললেন, তা তোমাদের তো আছেই বাপু আর একজন—সুধীরদা।

কথাটা এমন স্বরে ব'ললেন বড় ডাক্তার যে ম্যানেজার বাবু হেসে ফেললেন।

ম্যানেজার উঠতে উঠতে ব'ললেন—যাক্ গে এবার কাজ-টাজ কিছু কিছু ওঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দাও। আমি যাই দেখিগে ওদিকে কারখানার ডাইনামোটায় কি গণ্ডগোল হ'য়েছে। দেখো তো হাজার মণ পাতি উঠছে, এখন কি কারখানার কাজ এতটুকু বন্ধ হলে চলে!

বড় ডাক্তার খাতা থেকে চোখ তুলে প্রস্থানোদ্যত ম্যানেজার বাবুর দিকে চেয়ে ব'ললেন, আমাদেরও যে গণ্ডগোল হ'য়েছে এদিকে। ট্যাঙ্কের জল ফুরিয়ে গেছে। ওষুধের জন্যে জল যোগাড় করতে কি যে বেগ পেতে হ'চ্ছে।

ম্যানেজার ফিরে দাঁড়িয়ে ব'ললেন—আর বলো না। চল্লিশ শালে ডিরেক্টারদের বলেছি, আর একটা ব্যাটারী কিনুন্। তখন কিনলে তিন চার হাজার টাকাতেই হয়ে যেতো। এখন তার দাম পনেরো কুড়ি হাজার টাকা। তাও পাওয়া যায় না। এমন দূরদৃষ্টিহীন ডিরেক্টারদের নিয়ে কি বাগান চলে! খালি লাভ, খালি লাভ। বুড়ো মেসিন্‌টা আর কত টানতে পারে!—ব'লতে ব'লতে ম্যানেজার বাবু চ'লে গেলেন। দূর থেকে আর একবার তাঁর গলা শোনা

গেলো, 'আজ আর বেশী দরকার নাই নতুন ডাক্তার বাবু। কাল থেকেই কাজ সুরু করবেন ভালো করে।'

বড় ডাক্তার বাবু সিক রেজিষ্টার খাতা বন্ধ করতে করতে নতুন ডাক্তারের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ব'ললেন—বিয়ে টিয়ে করেছেন ?

সলজ্জ হেসে উত্তর দিলো নতুন ডাক্তার—না।

—তাহলে আপনি ঠিক বুঝবেন না। পাত্রী দেখার ব্যাপারে চমকা সুন্দরী বলে একটা কথা আছে। যে-মেয়েকে ওপরে ওপরে দেখতে খুব সুন্দর তাকে বলে চমকা সুন্দরী। চা-বাগানটাও হচ্ছে তাই। কেমন সুন্দর জায়গা—নীলপাহাড়, সবুজ বন, চক্‌চকে বাংলো, বিজলী বাতি, কলের জল আরও কত কি। কিন্তু বসে আছি আমরা সাবুর বাটি হাতে ক'রে, বুঝলেন। আর, পদে পদে এই সব বিভ্রাট নিয়ে।

কম্পাউণ্ডার বাবুর গলা শোনা গেলো—দ্যাখেন তো কাইলের তারিখে নিমুনিয়ার ঘরে ট্যাটনের বো'র নাম ভর্তি আছে কিনা ?

ডাক্তার খাতাটা আবার খুললেন। খুঁজে খুঁজে বের ক'রে বললেন, আছে।

কম্পাউণ্ডার বাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, দ্যাখেন হারামজাদীর কাণ্ড। দুই দুইবার অর নাম একই ঘরে রেজিষ্ট্রি হইছে। একবার আমার কাছে ওষুধ নিয়া গেছে—আবার আপনার কাছ থিক্যা নিছে। দ্যাখছেন নি কাণ্ডটা !

বড় ডাক্তার বিরক্তভাবে ট্যাটনের স্ত্রীর ভুল সংশোধন করলেন।

অল্প সল্প কাজ বুঝে ফিরে যাবার সময় নতুন ডাক্তার দেখলো বারান্দায় একটা অল্প বয়সী কুলি ছোকরাকে অমানুষিকভাবে কাৎ ক'রে ফেলে পৌঢ় কম্পাউণ্ডার পর্ পর্ ক'রে সুঁই চালাচ্ছেন তার

মাজায়। কুইনাইন ইঞ্জেকশান। সেই রকমভাবে কট্‌মট্‌ করে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে কম্পাউণ্ডার বাবু বলছিলেন—হঃ, আবার চিল্লায়!

অপরিচিত মুখ, অপরিচিত আবেষ্টনী। কিছুই ভালো লাগছিলো না নতুন ডাক্তারের। আপন একাকীত্বের মধ্যে থাকবার জন্যেই এখন উদ্‌গ্রীব সে। ঘরের নির্জনতা ও আপনত্বের মধ্যে বসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যেন।

আবার একজন কামিন্ (মেয়ে কুলি) ঝাঁট দিতে এলো। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও সে নির্বাক হ'য়ে ঝাঁট দিয়ে গেলো। মুখে তার নীরব রহস্যময়তা। দেহে তার বিচিত্র আভরণ। কানে তার রঙীন তালপাতার একরকম ঠোস্। তাকে ওরা বলে 'বিড়িয়োঁ'। কানের বিপুল গহ্বরের মধ্যে নিশ্চিন্তমনে চালিয়ে দিয়েছে সেই সুবিপুল অলঙ্কার—প্রকৃতির দেওয়া। চুলের খোপায় রূপার ঝালোর দেওয়া কাঁটা—ওরা বলে খস্সো। প্রবাল খচিত খোম্বিয়া গলায় দুলে একটা আরণ্যক সৌন্দর্যের সৃষ্টি ক'রেছে। ওরা বন্য মেয়ে। নতুন ডাক্তার অবাক হ'য়ে ওর বিচিত্র বেশ-বাস দেখে। এই নিয়ে দুই নম্বর ঝাঁট পড়লো ঘরে।

হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়লো। সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে প্রবেশ করলেন ম্যানেজার বাবু। তাঁর ডান কাঁধের ওপর ডান হাত, বাঁ কাঁধের ওপর থুত্‌নী রেখে একজন তরুণী। ম্যানেজার বাবু তাঁর চোখ-জুড়োনো হাসি হেসে বললেন, এই যে ডাক্তার বাবু, আপনার একজন বাঁধা রোগী নিয়ে এসেছি। আপনার আর বেকার হবার ভাবনা নেই কোনদিন। ইনি হচ্ছেন আমার কন্যা, অর্থাৎ মাতা। নাম শুনে চমকে যাবেন না। নাম বনানী।

ঘাড় থেকে হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বনানী বলে—কি যে বলো বাবা! না, না ডাক্তারবাবু, আমি বাঁধা রোগী মোটেই নই। বাবা খালি আমার সাথে—

ডাক্তার অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। ম্যানেজার মেয়ের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, ডাক্তারবাবু না—'কাকু' বলবে মা আজ থেকে ওঁকে। উনি তোমার কাকু।

ওঁদের ব্যবহারে ডাক্তারের সঙ্কোচ অনেকখানি কেটে গিয়েছিলো—সঙ্গে সঙ্গে সে সহাস্যে বলে ওঠে—তাহলে আপনারও আর আমাকে 'আপনি' বলা চলে না।

—বেশ বলো, তোমার নাম কি—তাই বলেই ডাকবো।

আড়ষ্টভাবে ডাক্তার বলে—কনক।

—কনক! বনানী খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। এরে, মেয়েলী নাম যে!

—পুরুষালী কি আর তোরা আমাদের রাখতে দিয়েছিস্ মা! পালা যে বদল্ হ'য়ে গেছে অনেকদিন।

সবাই একসাথে হেসে ওঠে। স্ফিংস-এর মত মুখওয়ালা কামিন্ তখনও তেমনিভাবেই ঝাঁট দিয়ে চলেছে। তার মুখের একটা রেখাও বদলায় নি সে হাসিতে।

কাকু, আপনি পেয়ারা ভালো বাসেন?—ব'লেই উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে বনানী ছুট দেয়। ঠিক যেন চঞ্চলা হরিণী। তার লাল রেশমী ফিতা বাঁধা লম্বা বেণী পিঠের ওপরে সুললিত ছন্দে দুলতে থাকে। সস্নেহে সেদিকে চেয়ে ম্যানেজার বাবু বললেন,—একেবারেই পাগল। এমন চমৎকার ওর স্বভাব। এতটুকু কুটিলতা ওর মধ্যে পাবেন না। কি নরম প্রাণ ওর! একদিন একটা কুলিকে বোঝা নিয়ে যেতে দেখে বলেছিলো, উঃ, বাবা অতবড় বোঝা ও নিয়ে যেতে পারছে না! দেখছো না কি কষ্ট হচ্ছে। ওকে তুমি নামাতে বলো।

মেয়ের প্রশংসায় একটা স্বর্গীয় দ্যুতি খেলে যায় তাঁর মুখে। ডাক্তার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। মেয়ে-বাপের সম্পর্ক তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

—বুঝলে কনক, একটু থেকে তিনি বলেন—ওরা হচ্ছে যমজ। ছোটবেলা মায়ের দুধের জন্যে ও গ্রাজ্ করে নি কোনদিন। ওর যমজ ভাইকে খেতে দেখলে নিঃশব্দে সরে গেছে—এমনি অদ্ভুত ও! তাই, ওর সম্বন্ধে বরাবরই একটা উদ্বেগ আছে—অমন মেয়ে বুঝি বাঁচবে না। ম্যানেজার বাবুর চোখের কোন্ দুটো চিক্‌চিক্ ক'রে ওঠে।

জানালা দিয়ে হিমালয় দেখা যাচ্ছিলো। বৃষ্টিস্নাত পাহাড় একে-বারে ঘন বেগুনী রং-এর হ'য়ে উঠেছে। সাদা সাদা হাল্কা মেঘ ওর গায়ে-মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন আদুরী নাতনীরা দাদুর পাকা চুল তুলে দিচ্ছে—গা রগড়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের ওই অপূর্ব সৌন্দর্যের সাথে ম্যানেজার বাবুর কথাগুলো মিলে ডাক্তারের মনে এক অদ্ভুত ভাবের আবেগ সৃষ্টি করে।

তেমনি ভাবে নাচতে নাচতে বনানী এসে ঢুকলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, মালী নিয়ে আসছে, দেখবেন কি মিষ্টি আমাদের বাগানের পেয়ারা।

একটু পরেই সাদা পাগড়ী-বাঁধা মালী এসে ঢুকলো। হাতে ছোট্ট একটা ডালি ভর্তি বড় বড় ডাঁসা পেয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে 'ছোড়দি, আমাকে দিবি নে'—ব'লে চীৎকার কর'তে কর'তে এসে ঢুকলো দু'টি টুক্‌টুকে মেয়ে। হঠাৎ অপরিচিত লোককে দেখে একটু চমকে দাঁড়িয়ে গেলো দু'জনে বাবার গা ঘেঁষে। বাবা দু'জনকে বুকে টেনে নিতে নিতে ব'ললেন, তোদের কি না দিয়ে খেতে পারে রে পাগলী!

ডাক্তারের দিকে চেয়ে ম্যানেজার বাবু ব'ললেন, এই হচ্ছে আমার আর দুটি মেয়ে। এরাও যমজ। এর নাম হ'চ্ছে অঞ্জু আর ওর নাম মঞ্জু। আচ্ছা, এখন বলুন তো ওঃ, বলো তো কনক কে অঞ্জু, কে মঞ্জু? বাবার কথা বদলানোর ধরণ দেখে বনানী পাশ থেকে মুখ টিপে হাসলো।

ডাক্তার অবাক হ'য়ে ওদের দেখছিলো আর ভাবছিলো, ওরা যে একে অন্যের হুবহু প্রতিচ্ছবি। একই রকম রং, একই রকম মুখ, একই রকম লম্বা, একই রকম বব্ছাঁট চুল, কানে একই রকম ইয়ারিং—এমন কি জামা দুটোও একই রংএর এবং একই ছাঁটের। এমন আশ্চর্য চেহারার মিল তো দেখা যায় না বড়! বিব্রতভাবে একজনকে বলে—তুমি মঞ্জু!

অনেকটা চিৎ হ'য়ে বাবার পেটে মাথা দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে একটুখানি হেসে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললো—বারে, আমি তো অঞ্জু।

সবাই হেসে ওঠে। ম্যানেজার বাবুও হেসে বলেন, হ্যাঁ, ওদের প্রথম প্রথম ঠিক করা বড় শক্ত। তবে, কিছুদিন দেখলেই ঠিক চিন্‌তে পারবেন। এই দেখুন, একটু পার্থক্য এদের আছে তবে প্রথমে সেটা চোখে পড়ে না—বলেই তিনি দুজনের মাথা একসাথে মিলালেন। বললেন, এর থুতনীটা একটু লম্বা লক্ষ্য করেছেন?

ডাক্তার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে বললো, হ্যাঁ সামান্য একটু পার্থক্য আছে বটে তবে, আমার পক্ষে সেটা ধরা কঠিন।

এদের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। একজনের অসুখ হ'লে আর একজনেরও দু'একদিন বাদে অসুখ হবেই। ওর যে অসুখ হবে ওরও সেই অসুখই হবে। এমন অদ্ভুত। ওদের নিয়ে কি যে মুস্কিল। একজন না একজন আছেই—

বনানী ব'লে উঠলো উচ্ছলিতভাবে—জানেন কাকু, ওদের আমি কি বলেছি সেদিন। ওদের তো বিয়ে হবে। বলেছি, বিয়ের পরে মঞ্জুর অসুখ হলে লিখবে—অঞ্জু, তোর অসুখ হয়েছে তো। কেমন আছিস্ এখন ?

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। বনানীর রসিকতা ডাক্তার প্রাণভরে উপভোগ করে।

বুড়ো মালি কথা বুঝুক্ বা না বুঝুক্ তার ভ্রূর নীচেকার কুৎকুতে চোখ দুটো হাসিতে আরও কুৎকুতে হ'য়ে উঠেছিলো। সুযোগ পেয়ে সে তার ডালা থেকে সবচেয়ে বড় পেয়ারাটা নিয়ে ডাক্তার বাবুর দিকে এগিয়ে গিয়ে সবিনয়ে বললো, ডাগডর বাবুকো লিয়ে। ভারী বাঁঢ়িয়া টমরস্ মেরে বগীচাকো !

ম্যানেজার বাবু ব'ললেন—সত্যিই খুব ভালো পেয়ারা। বাগান-টাকে ও একেবারে নিজের মনে করে। প্রাণ দিয়ে খাটে। আমাকে খুব ভালবাসে ও। বাগানের যা কিছু ভালো ফল-ফলারি ও চুপি চুপি নিয়ে আসবে আমার জন্যে। কেবল দোষের মধ্যে হ'চ্ছে একটু বিয়ে পাগলা। জাতে কিন্তু ও নেপালী, ঠিক বোঝা যায় না, না ?

সবাই পেয়ারা খাচ্ছিলো। অঞ্জু পেয়ারা খেতে খেতে বাবাকে এক ফাঁকে ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞেস করলো—বাবা, উনি কে ?

ম্যানেজার বাবু জোরে জোরে ব'ললেন, উনি হ'চ্ছেন তোমাদের কাকু। আর এক কাকু। আজ থেকে ওঁকে কিন্তু কাকু বলে ডেকো। কেমন ? মহা খুসীর সাথে ও ঘাড় নাড়ে। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে চীৎকার ক'রতে ক'রতে ছুটতে ছুটতে যায়। বলে, যাই মাকে বলিগে—

নিজে পেছনে প'ড়ে যায় দেখে মঞ্জু পড়ি মরি ক'রে ছোটে অঞ্জুর পেছন্ পেছন্। ডাক্তার হেসে ওঠে। ম্যানেজার বাবু হেসে বলেন, কাকু পেয়েছে ওরা। আর, ওদের পায় কে ? একটু থেমে বলেন, হ্যাঁ,

আপনার, দুত্তোরি খালি ভুলে যাই। তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো এ ঘরে থাকতে যতদিন না নতুন কোয়ার্টার তৈরী হয়?

ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বলে—না, অসুবিধে হবে কেন।

—আমার মা থাকতে এ বাড়ীতে কারও কোনদিন অসুবিধে হয় না। যা দরকার হয় অসঙ্কোচে ওকেই ব'লো। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কি বলিস্ মা?—বলে ওর গালে একটা ঠোনা দিলেন। ফোঁস্ ক'রে উঠে বনানী বলে যাও, তুমি ভারী হ'য়ে বাবা।

ডিভিসানের ম্যানেজার সুধীর বাবু এসে ঢুকলেন। ভদ্রলোকের চোখ-মুখ আর চুলের মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেখলেই এক মুহূর্তে ব'লে দেওয়া যায় নিরীহ সৎ লোক। লোকের অপকার করবার অক্ষমতার চিহ্ন তাঁর সমগ্র সত্তায়। লম্বা করে আঁচড়ানো অবশিষ্ট সাদা চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে মাটির দিকে চেয়ে বললেন, আলীপুরের এস্, ডি, ও খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর জন্যে কিছু ভালো চা পাঠাতে।

—পাঠিয়ে দিন। এর জন্যেও যদি আপনাকে আমার কাছে আসতে হয়! আপনাকে নিয়ে আর পারলাম না সুধীরদা।

একরকম নিরীহ-বিব্রত হাসিতে ভরে উঠলো সুধীর বাবুর মুখ। মাথা না চুলকালেও মাথা চুল্‌কানো তাঁর চলছেই। ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, আপনিই বুঝি নতুন ডাক্তারবাবু—নমস্কার! দু'হাত একেবারে পুরোপুরি জোর ক'রে তিনি ধীরে ধীরে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলেন। ডাক্তার প্রতি-নমস্কার ক'রে বললে, হ্যাঁ!

—তা বেশ, বেশ। ভালোই হ'লো। চা-বাগানে—তা ভালোই থাকবেন, এই একটু ম্যালেরিয়া যা। সেও অবিশ্যি প্রথম প্রথম। আমরাও তো আছি! তা আপনার নিবাস কোথায়?

এই রকম ধরণের দু'চারটে কথাবার্তার পর সুধীর'দা বেরিয়ে

গেলেন। যাবার সময় আবার মাথা চুলকালেন তিনি। মাথা চুলকাতে চুলকাতে আবার ফিরে এলেন—বললেন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—'প্রোজেক্ট'এর চোটে তো বাগানে কুলি পাওয়াই ভার হ'য়ে উঠেছে। রঁাচী থেকে কিছু কুলি রিক্রুট ক'রে না আনতে পারলে তো আর চলে না!

—হঁ্যা, সে কথা ভেবেছি। তবে রঁাচী থেকে আনলেও হয়তো প্রোজেক্টই ধাওয়া করবে ওরা। মধ্যের থেকে খরচটাই লোকসান। যে রকম টাকা ঢালছে ওরা! তার চেয়ে এখান থেকেই কুলি নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে বুঝলেন না। বীরেনকে আর সতীশকে লাগান্ এই কাজে।

একটু ভেবে 'আচ্ছা' ব'লে তেমনিভাবে বেরিয়ে গেলেন স্থধীর'দা। ম্যানেজার বাবু সেদিকে চেয়ে বললেন—চা-বাগানে এসে একটা লাভ হবে তোমার। কত বিচিত্র মানুষ দেখতে পাবে যে এখানে। এই ধরো স্থধীর'দা—কি সরল সৎ অন্তঃকরণ লোকটার। কিন্তু এমন ভীতু মানুষ! নিজের দায়িত্বে এতটুকু কিছু করতে ভয় পান। একটা কুলিকে গাল্ দিতে হলেও কি বলে গাল্ দিতে হবে তিনি একবার আমার কাছে এসে শুনে যাবেন। পাছে বেফাঁস গাল্ দিয়ে কোম্পানীর লোকসান্ করে বসেন, এমন সৎ লোক।

ঢং ঢং ক'রে বাড়ীর এক প্রান্ত থেকে কতকগুলো ঘণ্টা পড়লো। যেন ট্রেণ আসার ঘণ্টা। ম্যানেজারবাবু চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, মার্টিনের ঘণ্টা পড়লো। এইবার স্নান করতে উঠুন বেলা হয়ে গেছে। এতবড় বাড়ীতে সময় ঠিক রাখার জন্যে ওই ঘণ্টার ব্যবস্থা করেছি। এটা হলো স্নানের ঘণ্টা।

অন্দরের দিকে দরজা দিয়ে বনানী ঢুকলো—পেছনে একজন কামিন্। হাতে কতকগুলো চমৎকার রঙীন্ শিশি। তারও পেছনে

একজন চাকর—হাতে ছোট্ট একটা টেবিল। বনানী কোন্ ফাঁকে উঠে গিয়েছিল কেউ টেরও পায় নি।

বনানীর মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি হেসে ম্যানেজারবাবু বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। ধব্‌ধবে টেবিল-ক্লথের ভাঁজ ভাঙতে ভাঙতে বনানী বললো, দেখুন তো ওই শিশিটা আপনার পছন্দ কি না—ওই সবুজ শিশিটা?

কামিনের হাতে একটা সুগন্ধি তেলের শিশি ছিলো। সুন্দর দেখতে। অত জিনিষপত্র দেখে ডাক্তার কেমন একটু বিব্রত বোধ করছিলো, বললো—খুব।

টেবিলের উপরে শিশিগুলো ঠক্‌ঠক্ করে নামিয়ে সাজাতে সাজাতে বনানী বলতে লাগলো—এইটেতে রইলো আপনার মাথার তেল; এইটেতে মুখশুদ্ধি। আচ্ছা আপনি ধনের চালই ভালোবাসেন—না এলাচ-লবঙ্গ? এইটেতে রইলো টুথপাউডার। সোপ কেস্‌টা রইলো মাঝখানে।

অপরিচিতা তরুণীর সাথে এত সহজ সম্পর্ক হ'তে পারে ভাবতে ডাক্তারের তাজ্জব লাগছিলো। কিন্তু ভাবার অবকাশ দেবার পাত্রী বনানী নয়। সে অনর্গল ব'লে চলেছে। কে বলবে কাল পর্যন্ত সে অপরিচিতা ছিলো। সব গুছিয়ে রেখে সে স্নান করার তাগিদ দিয়ে ফিরে গেলো। ঘরে আর একবার ঝাঁট পড়লো তক্ষুণি। এবারও অপরিচিতা মুখ। ডাক্তার ভাবলো, উঃ, এদের কতগুলো চাকরাণী! বড়লোকের বাড়ীর কাণ্ডই আলাদা। চা-বাগানের ম্যানেজাররা যে লাটের মত থাকে এটা যেন তারই পরিচয়।

স্নান ক'রতে যেতে পা যেন আর ওঠে না। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ডাক্তারের বাড়ীর বিশালত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা হলো। লাল সিমেণ্টের মসৃন মেঝে। মাথার ওপরে সাদ রং করা কাঠের ছাদ।

আশে পাশে কত ঘর। ছোটখাট একটা ফ্যাক্টরীর মত রান্নাঘরটা দূরে। সঙ্কোচে ডাক্তারের পা যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। যেন শত চোখ মেলে কারা তার দিকে চেয়ে আছে।

কোনরকমে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। পাশেই স্যানিটারী প্রিভি। ছবির মত জীবন। সিনেমার মত অলীকতা যেন এ প্রাসাদের সর্বাঙ্গে।

নলের নীচে বালতি ভরা জলে জল পড়ছে টপ্ টং ছরাৎ ছরাৎ। টপ্ টং ছরাৎ ছরাৎ—ঠিক যেন জলতরঙ্গের আওয়াজ। ডাক্তারের মন চলে যায় কত দূরে, যেখানে উদাসী মাঠের বুকে একদিন তাদের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানা বটের ছায়ায় মদির হ'য়ে থাকতো। বাঁশগাছের দীর্ঘঃশ্বাস বেয়ে যত অপার্থিব জীবের আনাগোনা চলতো। সে জীবন থেকে কতদূরে আজ সে! টপ্ টং ছরাৎ ছরাৎ—জলতরঙ্গের বাজনার শব্দে যেন কোন্ সুদূরের বাণী।

খেতে বসলো সবাই মিলে। ম্যানেজার বাবুর স্ত্রীর সাথে এই প্রথম দেখা। কোনরকমে নমস্কার সেরেছে ডাক্তার। খেতে বসে চোখ তুলতে পারছে না আড়ষ্টতায়। এত ঝক্ঝকে আবেষ্টনী যেন সহ্য হচ্ছে না তার। পোষাকে, চেহারায়, কথায়-বার্তায় আর এক-জগতের উপস্থিতি বোধ করতে হচ্ছে পদে পদে—যে জগতের সাথে তার কোন পরিচয় ছিল না।

গল্প-গুজোবে হাসিতে আবহাওয়াটা অনেকটা হাল্কা হয়ে উঠলো। মার্টিনই হচ্ছে এই হাসি হল্লার প্রাণকেন্দ্র। মার্টিন জাতিতে ওরাওঁ এবং এ বাসার বাঁধা চাকর। কুলিগিরি করতে এসে বাসায় থেকে গেছে। তার স্বভাবের জন্যে এ বাসার সবাই তাকে ভালবাসে। সে না হলে খাওয়াই জমে না কারও। মার্টিন আবার খৃষ্টান। একটা নীল রং-এর কলারওয়ালা গেঞ্জী আর প্যাণ্ট পরে থাকে সে সর্বদা।

তার একপ্রস্থ স্যুট্ও আছে। খেতে বসলে জল দেওয়া তার প্রধান কাজ—তারই সাথে অঞ্জু-মঞ্জুর পেছনে লাগা।

পাশেই পশ্চিমা গরুর জন্যে মাসকলাই-এর সাথে খোড় আর মোচা সেদ্ধ হ'য়ে খিচুড়ির মত হয় কতকটা। অঞ্জু-মঞ্জু খেতে বসলে মার্টিন চুপি চুপি সেই অপূর্ব খিচুড়ী কাঁসিতে করে এনে ওদের সামনে ধরে দিয়ে অপ্রস্তুত করে দেয়। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। কখনও বা চীনামাটির প্লেটে ক'রে ঠিক সন্দেশের মত ক'রে কাটা থোড়, শশার মত ক'রে বানানো ঝিঙ্গা ধরে দেয়, কখনও বা ডিসে ক'রে ছানার মত ক'রে চূণ সাজিয়ে আনে। হাসির হল্লার মাঝে ওরা দুজন ক্রুদ্ধ অথচ অপদস্থের ভঙ্গিতে হা ক'রে চেয়ে থাকে—গালগালি দেয়।

আজ কিন্তু অঞ্জু-মঞ্জু নির্ভয়ে আছে। নতুন কাকুই তাদের ভরসা। আজ মার্টিন ছাইয়ের সাথে জল মিশিয়ে পায়সের মত ক'রে রেখেছে লুকিয়ে। ঠাকুর ভাত দেবার আগেই চট্ ক'রে কাঁসিটা ওদের সামনে দিতেই হাততালি দিয়ে ওঠে বনানী।

মঞ্জু কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলে—দেখো তো কাকু। তৎক্ষণাৎ আবার মার্টিন কাঁসি টেনে নিয়ে গিয়ে মজা করার উৎকট-উৎসাহে সেই অপূর্ব পায়েস নিজেই মুখে দিয়ে বাইরের দিকে ছোটে। হাসতে হাসতে সবার দম বন্ধ হ'য়ে আসে ওর ওই কাণ্ড দেখে। ম্যানেজার বাবু বলেন, একেবারে গাছপাগল! কিন্তু যাই বলো, মার্টিনের মত চাকর হয় না। ছেলেমেয়েদের ও আন্তরিক ভালবাসে। ওর জীবনটাও খুব ইন্টারেষ্টিং। বেঁটে বলে ওকে কেউ বিয়ে করতে চায় না। সেই ওর মস্ত দুঃখ। বাগানের কত কুলি-মেয়েকে যে ও মিছিমিছি গন্ধতেল আর সাবান দিয়েছে।

ভাঙা কাঁসির মত আওয়াজ ক'রে কথা বলতে বলতে ঢোকে মার্টিন —কেমন লাগছে অঞ্জু-মঞ্জু? হি হি হি হি! তার ছোট্ট-বামনাকৃতি

বিচিত্র দেহ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। সবাই হাসে। খাওয়াটা এখানে রোজই এমনি উৎসব। ডাক্তারের মনের শূন্যতা কিছুটা ভ'রে ওঠে এতে।

আজ হাটবার। এখানে হাটবারে উৎসব। কুলি স্ত্রী-পুরুষ যার যা-কিছু ভালো কাপড়-জামা আছে প'রে। কাজ থাক বা না থাক্ হাটে যায়। হাটে যে যেতে পারলো না সে অভাগা। বিকেলের দিকে বারান্দায় চেয়ার পেতে ব'সে ছিল ডাক্তার। ফ্যাক্টরী আজ নিস্তব্ধ। রাতের ডালহৌসী স্কোয়ারের মতই। দু'একজন ক'রে কুলি মেয়ে-পুরুষ ফর্সা পোষাক প'রে হাটে চলেছে কারখানার পথে। পেছনে তুমুল মচ্ মচ্ শব্দ শুনে ডাক্তার ফিরে চেয়ে দেখে মার্টিন। দুপুরের মার্টিনকে চেনা শক্ত। ধব্‌ধবে স্যুট্ পরনে। গলায় ঘন নীল রং-এর নেক্‌টাই। পায়ে চক্‌চকে·অক্সফোর্ড সু। মাথায় লম্বা লম্বা চুল ব্যাক্‌ব্রাস্ করা। ছোট্ট ফিট্‌ফাট্ একটি খোকার মত দেখাচ্ছে তাকে। বহু কষ্টে হাসি সামলিয়ে জিজ্ঞেস করে ডাক্তার—কোথায় চললে মার্টিন ?

—এই একটু হাটে ডাকডর বাবু! কেমুন হইছে দেখেন্ তো। ব'লে সে পোষাকের দিকে একবার নিজেই চাইলো।

—খুব চমৎকার মার্টিন! বেশ দেখাচ্ছে তোমাকে!

মার্টিন খুসী হ'য়ে রং-বেরংএর নুড়ি মাড়িয়ে মচ্ মচ্ ক'রে চলে যায়। দূর থেকে তাকে আরও ছোট্ট খোকা বলে মনে হয়।

ডাক্তারের মুখে কৌতূহলের হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সবই বিচিত্র মনে হয় এখানকার। ফেরার পথে দেখা গেলো মার্টিন মস্ত বড় এক ব্যাগে হাটের সওদা ঝুলিয়ে মচ্ মচ্ ক'রে ফিরছে। হাতে আবার একখানা ষ্টিক্।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডাক্তারের অসহ্য হ'য়ে উঠলো বাগান। বাচ্চা ডাক্তার ব'লে সবাই তাকে ঠাট্টা করে—উপহাস করে, বিদ্রূপ করে,—এমন কি কুলিরাও। লাইনে (কুলি বস্তী) গেলে রাস্তার ধারের কলে বেআব্রু অবস্থায় স্নানরতা মেয়ে-কুলিরা পর্যন্ত তাকে দেখিয়ে হাসাহাসি করে। দুর্বোধ্য ভাষায় মন্তব্য করে কি সব।

শ্রদ্ধাশূন্য জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার মত কষ্ট বুঝি পৃথিবীতে কিছু নেই। অনুশোচনায় পুড়ে যায় ডাক্তারের বিপর্যস্ত মন। কেন সে মরতে এখানে এসেছিলো। যুদ্ধের দিনে ডাক্তারীর তো অভাব ছিল না কোন। চলে যাবে সে এখান থেকে। কিন্তু বললেই যাওয়া হয় না। কি যেন এক মধুর আবেশ তাকে এরই মধ্যে অসহায় ক'রে তুলেছে। যেন আফিং-এর নেশা। নেশাটা কি? বাগানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য? প্রকৃতির অনির্বচনীয় আবেষ্টনী? না আর কিছু? বোঝে না ডাক্তার।

দাঁড়িয়েছিলো ডাক্তার বারান্দায়। অলস প্রভাতে শ্যামলী আকাশের নীচে ইন্সপেক্সান্ বাংলোর ফোয়ারা রিমিঝিমি নেচে চলেছে। দূর আকাশের একক সাদা নক্ষত্রের মত কাঠচাঁপার নিঃসঙ্গ ফুল নীল্‌চে-কালো পাতার আড়ালে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। হিমালয়ের মাথায় পাঁজা পাঁজা সাদা মেঘ। দেখে মনে হচ্ছে যেন নীল-অতিকায় এক বুড়োর মাথায় সাদা বাব্‌রী। শিরীষ গাছের ডালে ডালে অজানা পাখীর কিচির-মিচির্। দূর বস্তীর সীমান্ত থেকে মোরগের আর্তনাদ ভেসে আসে। হঠাৎ বনানী এক গোছা ফুল নিয়ে এসে বললো—আপনি ফুল ভালোবাসেন?

—হ্যাঁ, খুব!

—এই নিন্। আচ্ছা, বলুন তো এই ফুলগুলোর নাম কি?

এইবারই বিপদে ফেলেছেন। ফুল ভালোবাসি, কিন্তু চিনি নে।

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বনানী বলে—ওকি; আমাকে আপনি বলছেন যে বড়! কাকু বুঝি ছোটকে আপনি বলে। আর কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না ব'লে দিচ্ছি।—শাসানীর ভঙ্গিতে বলে সে। শেষে বলে, এই ফুল চেনেন না। এর নাম ফরগেট্ মি নট্। কেমন চমৎকার নীল—না? আমার দাদা বলেছে ওর নাম। দাদা বিলাতে থাকে জানেন?

—বিলাতে থাকেন? তাতো জানি নে! কি করেন?

—ইঞ্জিনীয়ারিং পড়েন। দাদা কত সুন্দর সুন্দর ছবি পাঠায় গ্ল্যাস্‌গো সহরের। এবার সুইজারল্যাণ্ডের কতকগুলি 'স্পা'র (spaa) কি চমৎকার চমৎকার ছবি যে পাঠিয়েছে—দেখবেন?

'স্পা' কাকে বলে ডাক্তার জানে না। নিজের অজ্ঞতা দূর করবার সুযোগ নেওয়া উচিত ভেবে বলে—হ্যাঁ, দেখবো। 'আপনি' 'তুমি' কথাগুলো সে এড়াবার চেষ্টা করে। এ কদিনের মধ্যে সম্পর্কের একটু নিবিড়তা এলেও অনাত্মীয়া তরুণীকে 'তুমি' বলা যে কত কঠিন ডাক্তার সেটা বোঝে। এ ধরণের কোন অভিজ্ঞতা তার ছিলো না।

ছবিগুলো মুগ্ধ হ'য়ে দেখে ডাক্তার। সুদৃশ্য করবার জন্যে যতরকম রং সম্ভব সুইজারল্যাণ্ডের এই সব রোগ-মুক্তিদাতা স্পাগুলোকে তেমনিভাবে অপূর্ব রং-বেরংএ চিত্রিত করা হ'য়েছে। কোন 'স্পা'তে লীভার-এর দোষ সারে, কোনটায় বাতের ব্যাথা সারে, কোনটায় বা চর্মরোগ। রোগ-নিরাময়ক ঝরণারূপী 'স্পা'র রহস্য এইবার ডাক্তার বোঝে। কিন্তু 'স্পা'র চেয়েও ডাক্তারকে বেশী মুগ্ধ ক'রছিলো খোপায় রক্তকরবী গোঁজা বনানী—যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বপ্নময়-সোনালী আভাস। চুল থেকে মাদকতাপূর্ণ একটা সুমিষ্ট গন্ধ বের হ'চ্ছিলো। বনানী মুখ তুলে প্রশ্ন করে—কেমন সুন্দর না?

হঠাৎ ডাক্তার ব'লে ওঠে ওর চেয়ে বেশী সুন্দর তোমার মাথার ফুলের ঝাড়!—ব'লেই কানের ডগা দুটো তার লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়। এ কি ব'লে ফেললো সে।

বনানী অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করে—কেন?

সংশোধন ক'রে ডাক্তার বলে—কেননা, ওটা মৃত আর এটা জীবিত। ওটা নকল আর এটা আসল। এটা রূপ আর ওটা রূপান্তর।

—বাঃ, আপনি তো বেশ কবির মত কথা বলেন। কলেজে আমার এক বন্ধুও ঠিক এমনিভাবে কথা বলতো।

—আপনি কি কলেজে পড়েন?

—পড়তাম। এখন বাড়ীতে পড়ি—বাবার কাছে। কিন্তু 'স্পা'র ওপর আপনার এ বিদ্বেষ কেন বলুন তো?

—বিদ্বেষ ঠিক নয়। 'স্পা'টা আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যা নয় তো! ওটা আজও বড়লোকের সৌখীন বিলাস।

—কেন? আমাদের সমস্যাটা কি?

—আমাদের সমস্যা বড় জোর দু'পয়সার কুইনাইন, অন্ততঃ, আজও।

—বারে, উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠে বনানী; বলে, কাকু কি যে বলেন! এমন সুন্দর 'স্পা'র চেয়ে কুইনাইনের সমস্যা বড়! আমাদের বাগানে তো কত কুইনাইন। সমস্যা কই?

ডাক্তার হেসে বলে—তোমাদের বাগানটাই তো ভারতবর্ষ নয়। আর তোমাদের বড় বাসাই তো বাগান নয়।

হঠাৎ ওপর তলায় কাঠের মেঝেতে কার জুতোর দুম্ দুম্ শব্দ ওঠে আর সঙ্গে চীৎকার—অঞ্জু-মঞ্জু।

বনানী সসব্যস্তে ব'লে উঠে—যাই, মাষ্টার মশাই এসে গেছেন। পড়তে বসতে হবে এক্ষুণি। পড়ার ঘরে এক্ষুনি না দেখলে বাবা

আবার রাগ করবে। পড়াশুনার বেলায় কিন্তু বাবা বড্ড কড়া।—রং-এর তরঙ্গ তুলে ময়ূরীর মত নাচতে নাচতে বনানী চলে যায়। মুগ্ধ চোখে ডাক্তার চেয়ে থাকে।

রোজ সকালে ডাক্তারকে একবার ওপরে যেতে হয়। ম্যানেজার বাবুর বাবার ডায়বেটিস্। বর্তমানে প্রস্রাবে চিনির মাত্রা বেড়েছে। ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে ওপর উঠে দাদুর ঘরে ঢোকে। সবার সঙ্গে সেও দাদু বলতে আরম্ভ করেছে ম্যানেজারের বাবাকে। এক সৌম্যমূর্তি গৌরবর্ণ বিরাটকায় পুরুষ চেয়ারে বসে আছেন। দাঁত না থাকায় তাঁর প্রকাণ্ড গৌরবর্ণের মুখখানা ওপরে নীচে অনেকখানি বসা। মৌন অবস্থায় তাঁকে বসে থাকতে দেখলে মনে হয় যেন ছবিতে দেখা ধ্যানী-পুরুষ। অন্ততঃ, সাধারণ পাঁচজন লোকের মত দেখে মনে হয় না। এ বাড়ীতে তিনিই একমাত্র সেকালের অকৃত্রিম প্রতিনিধি। এত ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের মধ্যে সাধাসিধে আটপৌরে জীবনযাত্রা। কাপড় গায় দিয়ে সেই একই চেয়ারে একইভাবে ব'সেছিলেন তিনি। প্রায় চলৎশক্তিহীন বলে ওই একই চেয়ারে মেঝেতে একখানা চটের উপর পা রেখে বসে থাকেন একই-ভাবে। ওইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া টেবিল চেয়ারেই। ওইটুকুই তাঁর একেলে। অবশ্য পরিবর্তিত আবেষ্টনীর অভ্যস্ততায় উগ্র গোঁড়ামি তাঁর কেটে গেছে। তাই, রান্না ঘর থেকে মুরগীর মাংসের গন্ধ উঠলেও তিনি কিছু বলেন না। ওরাওঁ জাতীয় লোকে তাঁর খাবার জল ছুলেও তিনি কিছু মনে করেন না। এমন কি খাবার পর্যন্ত তারা মাঝে মাঝে দিয়ে যায়।

ডাক্তার ঢুকতে ঢুকতে বললো—কেমন আছেন দাদু?—একই প্রশ্ন রোজ।

—আর, আমার আবার কেমন?

—ঘুম টুম হয়েছিলো রাত্রে ?

—যা ভাদুরে গুমোট পড়েছিলো কাল! ঘুম হয়নি ভালো। বোঝেনই তো, আট-দশ বার প্রস্রাব করতে হয় রাত্রে, ঘুম আর হয় কি করে!

হাত আর কপাল ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে বলে ডাক্তার—আপনার দাগগুলো যেন বেড়েছে আবার। দাদুর কপালে আর হাতে শ্বেতীরোগের মত সাদা সাদা দাগ। প্রস্রাবের রোগে নাকি হয়।

—হ্যাঁ। প্রস্রাবের চিনির মাত্রা বেড়েছে তো! এর আগে আল্ট্রা ভায়োলেট দিয়ে কমে গিয়েছিলো অনেকটা।

—আবার দিলে হয় না ?

তা দিতে পারেন। তবে বুঝতেই পারেন আর ক'দিনই বা বাঁচবো। যুবক বয়েস তো আর নেই—বলে দাদু শূন্য মাড়িগুলো বের ক'রে হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ ক'রে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসি দেখেই তাঁর অন্তরের বহুদূর পর্যন্ত চেনা যায়।

ডাক্তারও নীরবে হাসে।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার উঠে পড়ে। পাশের ঘরে অঞ্জু মঞ্জুরা পড়াশোনা করে মাষ্টার মশাইএর কাছে। ঘরটা একেবারে ষ্টীমারের কেবিনের মত, কিন্তু গোলাকৃতি। দোতলার মেঝের সাথে কিছুটা বাড়িয়ে আর একখানা ঘর তোলা হ'য়েছে। সবই কাঠের কেবল শেড্টা লাল টিনের। কাঠে উজ্জল সাদা রং। রাত্রে ইলেকট্রিক লাইট পড়লে একেবারে ঝলমল করে। সেই ঘরের দরজায় উঁকি মারলো ডাক্তার। অঞ্জু মঞ্জু তখন মাষ্টার মশাইএর কাছে ভূগোল প'ড়ছিলো। আজকের পড়ানোর বিষয় ছিলো হিমালয়। জানালার শিকের কাছে দাঁড় করিয়ে মাষ্টার মশাই তাদের হিমালয় দেখাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের

পনেরোশত মাইল জুড়ে যে পর্বতমালা রয়েছে তারই নাম হিমালয় পর্বত। তা থেকে কত ঝরণা, কত নদী হাসতে হাসতে, হাতে তালি দিতে দিতে বেরিয়েছে। রডোডেনড্রন ফুলের মত কত সুন্দর সুন্দর ফুল ·········।

ডাক্তার ওদের পড়া শুনতে শুনতে একেবারে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। এমন সজীব মানচিত্র দেখা বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের পক্ষে সম্ভব ব'লে সে জান্‌তো না। কি সৌভাগ্যবান এরা! জানালা দিয়ে হিমালয়ের নীল শৃঙ্গ-শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। শরতের সোণালী রোদে পাহাড় যেন ঝলকাচ্ছিলো। পাহাড় যেন আরও অনেকটা এগিয়ে এসেছে ব'লে মনে হয়। তার স্থানে স্থানে সাদা সাদা মেঘের স্তবক, যেন গুচ্ছ গুচ্ছ শুভ্র শিউলী কে ছড়িয়ে রেখেছে। ডাক্তার তন্ময় হ'য়ে দেখছিলো।

রডোড্রন কি মাষ্টার মশাই বলো না, বলেই অঞ্জু একবার দরজার দিকে চেয়ে ডাক্তারকে দেখতে পেয়ে কাকু'রে—ব'লে ধুপ্‌ ধুপ্‌ ক'রে ছুটতে ছুটতে আসে। সাথে সাথে মঞ্জু। ডাক্তারের কাপড়ের কোঁচা ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসায়। নিজেরা কোলে বসে—ঠিক যেন দুটো গোলাপ ফুল।

মাষ্টার মশাইকে নমস্কার ক'রে ডাক্তার বলে—আপনি বুঝি এদের পড়ান?

মাথা একটুখানি ঝুঁকিয়ে মাষ্টার বলেন, হ্যাঁ।

—আপনি বড় সৌভাগ্যবান্‌ যে হিমালয়কে সামনে রেখে হিমালয়ের বিষয় পড়াতে পারছেন। অনেক শিক্ষকই আপনার সৌভাগ্যে হিংসা করবেন।

মাষ্টার মশাই নীরবে একটু হাসেন। হঠাৎ ডাক্তার লক্ষ্য ক'রে বনানীও এক কোণে ব'সে পড়ছে। দৃষ্টি বিনিময় হ'লে সে মুখ টিপে

একটু হাসে; বলে, আজ কি এক্ষুণি বেরোবেন? দাঁড়ান, ঠাকুরকে খাবার দিতে বলি।

এখানে নিয়মিত জলখাবার লুচি সন্দেশ আর আলুর দম। প্রথম কয়েকদিন ডাক্তারের কাছে অস্বাভাবিক রকম আরাম লেগেছিলো। অস্বাভাবিকত্বটা ক্রমেই কমে আসছে।

জলখাবারের টেবিলে মাষ্টার মশাইএর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো। ভবিষ্যতে আরও নিবিড়তার আশ্বাস নিয়ে ডাক্তার উঠলো।

বাগানের সীমানার বাইরে যে গভীর বন আছে মাঝে মাঝে সেই বনের ধারে গিয়ে বসে ডাক্তার। প্রায়ই শেষ অপরাহ্নে—যখন কাজকর্ম বিশেষ কিছু থাকে না। গভীর বন, হিমালয় থেকে নেমে এসেছে এঁকে বেঁকে। সীমাহীন যেন এর বিস্তৃতি। আকাশ-ছোঁয়া এর শীর্ষ। রহস্যময় এর পটভূমিকা। স্তব্ধতার গহনরাজ্যে এর বাস। ডাক্তারের নিঃসঙ্গ জীবন সে স্তব্ধতার মাঝে আকুল হয়। ক্রমে ক্রমে সেই বনের আকর্ষণ তার দেহের শিরা থেকে স্নায়ুতে, স্নায়ু থেকে রক্তে, রক্ত থেকে হাড়ে, হাড় থেকে মজ্জায় পৌঁছতে আরম্ভ করেছে। তাই, শত কাজ সত্ত্বেও অপরাহ্নের ডাক সে অগ্রাহ্য ক'রতে পারে না।

একদিন বনের পথে যেতে ডাক্তার দেখে মাষ্টার মশাই অঞ্জু মঞ্জুকে ধানক্ষেতের কাছে বসিয়ে কি দেখাচ্ছেন। পাশেই রাস্তার ধারে মোটরখানা রয়েছে। কাছে গিয়ে ওঁদের হঠাৎ চমকিত ক'রে ডাক্তার বলে—কি ক'রছেন এখানে এদের নিয়ে?

অঞ্জু মঞ্জু ডাক্তারকে দেখতে পেয়েই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে এসে—কাকুরে, কাকু ব'লতে ব'লতে। বলে, কোথায় যাচ্ছো তুমি

কাকু? তুমি বুঝি এদিকে বেড়াতে আসো? তোমার ভয় করে না? বাঘে তোমাকে খেয়ে ফেলবে। না, তুমি একা আর এসো না। আসলে মাকে বলে দেবো কিন্তু।—এক নিঃশ্বাসে শত প্রশ্ন আর শত কথা। বহু কষ্টে ওদের বাহুর বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ ক'রে ডাক্তার আবার বলে—কি ক'রছেন ব'সে।

মাষ্টার মশাই বিনীতভাবে বলেন,—এই ওদের ধান গাছ দেখাচ্ছিলাম। কাল পড়েছে কিনা ধানগাছের কথা। এর আগে ওরা ধানগাছ দেখেনি, আবার। তাই ম্যানেজার বাবুকে ব'লে মোটের ক'রে ওদের নিয়ে এসেছি। আমি বইএ ছবি দেখিয়ে পড়ানোর চেয়ে বাস্তবের মুখোমুখি রেখে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী। কতবার ওদের বনে নিয়ে গিয়ে কত গাছপালার সাথে পরিচিত করেছি—যা ওরা বিজ্ঞানে পড়েছে। ওদের মন এখন কুতূহলী এবং নরম। প্রকৃতিই ওদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক—এই বয়সে। মাথার মধ্যে কতকগুলি শব্দ ঢুকিয়ে কাঁচা মাথাটাকে অকালে ঝুনো ক'রে লাভ কি!

ডাক্তার অবাক হ'য়ে কথাগুলো শোনে। বাঃ, এমন কথা তো শিক্ষকদের কাছ থেকে বড় শোনা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে এমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপনি বাগানের বন্ধ্যা জীবনে পড়ে আছেন কি করে? শিক্ষার শত্রু যদি কোথাও থাকে তবে এই চা-বাগানে। কি বলেন?

যা ব'লেছেন। এই দেখুন না একজন কুলি কষ্টেসৃষ্টে তার ছেলেকে হাইস্কুলে পড়াচ্ছে—কয়েক মাইল দূরে। তাকে নিয়ে কত ব্যঙ্গ, কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ! ছেলে পড়ানোটা তার কাছে মস্ত অপরাধ! বাগানের কথা আর ব'লবেন না, আপনি নতুন এসেছেন থাকুন কিছুদিন, বুঝবেন। স্বরটা একটু নামিয়ে মাষ্টার মশাই বলেন—ডিরেক্টারদের খোসামুদীই হচ্ছে এখানে চাকরীর উন্নতির একমাত্র

উপায়। কি যে জুয়োচুরি আর মিথ্যার খেলা চলছে এখানে, শুনলে অবাক হ'য়ে যাবেন। শুনবেন একদিন। কিন্তু আপনি এদিকে যাচ্ছিলেন কোথায়?

একটু ইতস্ততঃ ক'রে লজ্জিতভাবে ডাক্তার বলে, শুনলে হয়তো হাসবেন—শুধু বন দেখবার জন্তে আমি একবার ক'রে রোজ এই সময়ে আসি।

—সর্বনাশ, আপনিও বনের প্রেমে পড়েছেন! এই নিয়ে আমরা তিনজন প্রেমিক হ'লাম। বাগানের মধ্যে আমিই একমাত্র এদিকে আসি নিয়মিত—বনের টানে। আর কারও পায়ের ছাপ বড় এদিকে পড়ে না। আমাকে কত ঠাট্টা ক'রে সবাই এই নিয়ে। বলে, বাঘের পেটে যাবেন একদিন, তখন বেরিয়ে যাবে বনে যাওয়া! বনকে আমারই মত ভালোবাসেন আমার তেমন একজন বন্ধু আছেন—এখানকার এক খৃষ্টান মাষ্টার। বনে বেড়াতে গিয়েই তাঁর সাথে প্রথম আলাপ। দেখি, বনের মধ্যে একটা অত্যন্ত নির্জন জায়গায় একটা লোক চিৎ হ'য়ে শুয়ে গাছপালার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই প্রথম আলাপ। তারপরে বন্ধুত্ব। আলাপ ক'রবেন তাঁর সাথে। ভারী বিচিত্র লোক। কত যে পশু-পাখী পুষেছেন তিনি দেখবেন! যাবেন কাল? আজ তো সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে।

ডাক্তার সোৎসাহে বলে—নিশ্চয়ই।

মোটর দেখিয়ে মাষ্টার মশাই ব'ললেন, চলুন এবার ওঠা যাক্ আর কি।

চলুন, বলে ডাক্তার অঞ্জু মঞ্জুকে দু'হাতে টানতে টানতে মোটরে গিয়ে ওঠে। সীটে ব'সতে বসতে বলে, আচ্ছা, আপনি বনের গাছপালা চেনেন নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, ওই খৃষ্টান মাষ্টার বন্ধুটির দৌলতে কিছু কিছু চিনেছি বইকি।

—আমাকে চিনিয়ে দেবেন দয়া ক'রে ?

—বেশ ! যাক্, বাগানে যে একজন উপযুক্ত সাথী পাওয়া গেলো এই ভেবেই আমার আনন্দ হচ্ছে। বাগানে মাষ্টারকে মানুষ বলে কেউ ভাবে না। তাই, অবহেলা আর অবজ্ঞা যা কিছু কুলিদের সাথে সাথে আমাদের ভাগ্যেও জোটে। ভট্ ভট্ ভট্ ভট্ করে মোটরে ষ্টার্ট পড়লো। শুধু পেট্রোল গ্যাস খানিকটা প'ড়ে রইলো সেখানে...... ।

পরের দিন ঠিক সময়ে মাষ্টার মশাই এসে হাজির। বের হবার সময় ওপর থেকে বনানী বললো—চ'ললেন তো আবার বনে—কোন দিন বাঘে খাবে দেখবেন।

মুখ ঘুরিয়ে হেসে ডাক্তার ব'ললো—খেয়ে ফেললে আর দেখবো কি ক'রে ?

বনানী কৃত্রিম উষ্ণ স্বরে বলে—যান্, আপনি যে কি।—তার বেনীর লাল সোনালী লেস একবার দোলা খায়। ডাক্তারের মনে সে দোলা পৌঁছলো কি না কে বলবে।

দুধারে শ্যামল চা বাগান—মাঝখান দিয়ে কাঁকড় বিছানো পথ। কুলিরা পাতি তুলে ফিরে গেছে। এবার চায়ের পাতারা নিঃসাড়ে ঘুমচ্ছে। শিরীষ গাছেরা তাদের সজাগ প্রহরী হ'য়ে দাঁড়িয়ে। অতলস্পর্শী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোন্ অদৃশ্য ডালের ওপর থেকে পাখীর ডাক উঠছে চোক্ চোক্ গুর্র্র্র্। যেন চায়ের কচি কিশলয়দের ঘুম পাড়ানি গান।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাষ্টার মশাই বলেন—এই পথে এই সময়ে চলতে কতজন মানা করেছে। বাঘ চলে নাকি এই সময়।

কতজনের চোখে পড়েছে। আমার কিন্তু কোনদিন চোখে পড়লো না।

ডাক্তার নির্বিকারে শুধু বলে—তাই নাকি। আবার নিস্তব্ধতা। আবার চোক্ চোক্ ওর্র্র্র্। মিনিট কুড়ি চলার পর খৃষ্টান মাষ্টারের আস্তানায় পৌছানো গেলো। মাষ্টার ঘরের মধ্যে কি করছিলেন সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ঘাড়ের ওপরে একটা বাঁদর ঝুলছিলো, আর মাথার উপরে ছিলো একটা রুনিয়া পাখী।

পরিচয় হবার পর অভ্যর্থনা ক'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন মাষ্টার। নির্জন মাঠের মধ্যে এই ঘর। প্রতিবেশী কয়েকঘর মেচ্ শুধু আছে এখানে। দেওয়ালে যীশুখৃষ্টের অনেকগুলো এবং অনেক ধরণের ছবি টাঙ্গানো। মিসনারী সাহেব পাঠিয়েছে মিসনারী স্কুলের ছাত্রদের ধর্মভাব জাগাবার জন্যে।

শুধু স্বামী আর স্ত্রীর ছোট্ট পরিচ্ছন্ন সংসার। ঘরে ব'সেই হিমালয় দেখা যায়। আরও কাছে মনে হয় এখান থেকে। কি একটা বুনো ফুলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বের হ'চ্ছে। বেশ লাগে স্বামী-স্ত্রীর এই অনাবিল নির্জন জীবনধারা। কিন্তু বৃহত্তর জীবনের সাথে সংযোগহীন নীল আকাশে বেগুনী ফানুস্ যেন দু'টি।

ডাক্তার বললে,—ঘরের মধ্যে না ব'সে বাইরে ব'সলে হয় না। বাইরে চমৎকার লাগবে।

—বেশ, বেশ চলুন। মাষ্টার একটা বেঞ্চ ঘাড়ে ক'রে তক্ষুণি সিঁড়ি বেয়ে তর্ তর্ ক'রে নেমে গেলেন। বাঁদরটা তেমনিভাবে ঝুলে আছে। রুনিয়া পাখী তেমনিভাবে ব'সে আছে। বরং ফুর ফুর করে আরও দুটো এসে বসলো ঘাড়ে পিঠে বাঁদরের একেবারে কাছাকাছি।

ব'সতে ব'সতে ডাক্তার বলে—বেশ পোষ মানিয়েছেন দেখছি এদের। চমৎকার ট্রেনিং, একেবারে সত্যযুগ এনেছেন দেখছি।

আত্ম সন্তোষের হাসি হেসে মাষ্টার বলেন—এ আর কি দেখলেন—দেখবেন?—ব'লেই তিনি ঘরে ঢুকে একটা শঙ্খ নিয়ে এসে ফুঁ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মুরগী কোঁকড় কঁক্ কঁক্ কঁক্ ক'রতে ক'রতে ছুটে এলো। মাষ্টার হেসে বললেন, ওরা খেতে এসেছে। অর্থাৎ খাবার ঘণ্টা হচ্ছে শঙ্খ।

আচ্ছা, এইবার দেখুন, ব'লে হাফপ্যাণ্টের পকেট থেকে একটা হুইসল্ নিয়েই জোরে ফুঁ দিলেন। অমনি কোত্থেকে দুটো বাঁদর দৌড়তে দৌড়তে এলো এবং কাঁধেরটাও লাফিয়ে পড়লো। তারপর হাত জোড় ক'রে নমস্কার ক'রে আবার চলে গেলো। ডাক্তার অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—আশ্চর্য! বেশ আছেন তো মশাই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

একেবারে কুচ্‌কুচে কালো ছিপ্‌ছিপে একটা লোক এসে দাঁড়ালো হঠাৎ মাষ্টারের সামনে। মাষ্টার তাকে বললেন—ইন্‌না বারোয়ঃ? সে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললো—এন্ বারোন্। মাষ্টার আবার ব'ললেন—আর বারোর্? তেমনিভাবেই উত্তর করলো সে—বারোর্। মাষ্টার আরার ব'ললেন—একাজগু কালাগদায়? উত্তরে অস্পষ্টভাবে ও কি যেন ব'লে চলে গেলো।

ডাক্তার হা ক'রে চেয়ে রইলো। জিজ্ঞেস করলো—কোন ভাষায় কথা ব'ললেন?

--মেচ্ ভাষায়।

—বাবাঃ! কি দুর্বোধ্য!

—দুর্বোধ্য কিন্তু খুব বেশী কিছু নয়। অল্পদিনেই শিখে ফেলতে পারেন। আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন এক অক্ষরও বুঝতে পারতাম না ওদের কথা। ওরাই এখানে আমার একমাত্র সাথী, তাই অবশ্য তাড়াতাড়ি শিখেছি। ওদের ভাষায় বিসর্গ আর হসন্ত ব্যবহার হয় বেশী।

—আচ্ছা কি বললেন ওকে ?

—ব'ললাম, তুমি কি আজ আসবে ? অর্থাৎ, স্কুলে পড়তে। রাতে স্কুল হয় কিনা। আবার ব'ললাম, ওরা কি আসবে ? ব'ললো, আসবে। শেষে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছো এখন ? ব'ললো বাড়ী।

—আচ্ছা, স্কুলে মায়না লাগে নাকি ওদের ?

—তা লাগে বৈকি !

—এটা কিন্তু ভালো না।

—বারে, আমাদের মিশান টাকা পাবে কোথায় এত বলুন ? এই দেখুন এক আমার জন্যেই কি রকম খরচ করে ওরা। মাসে আমার মায়না পঁচাত্তর টাকা। বারো-শ' টাকা খরচ করে ওই ঘরখানা তৈরী ক'রে দিয়েছে। তাছাড়া, একটা টিউবওয়েলের জন্যে আরও পাঁচ-শ' টাকা মঞ্জুর ক'রেছে ! মায়না না নিয়ে কি ক'রবে বলুন।

—কিন্তু শুনেছি, ওদের দেশের সরকার প্রচুর টাকা ব্যয় করে ওদের জন্যে। তাছাড়া, বড়লোকরাও অনেক টাকা দিয়ে থাকে। আচ্ছা, আপনাদের মধ্যেও তো বিভিন্ন মিশান আছে—না ?

—হ্যাঁ, আমাদের মিশানের নাম 6th Day Adventist Mission। এটা আমেরিক্যান্ মিশান—প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী। অন্য মিশানের সাথে এর কয়েকটা পার্থক্য আছে। যেমন ধরুন, আমরা আঁশশূন্য মাছ খাবো না। শনিবারে আমাদের প্রার্থনার দিন। রোজ সকালে এবং বিকালে প্রার্থনা। মদ, গাঁজা, ভাঙ্ আমরা খাই না—কেন না, আমরা বিশ্বাস করি যে শরীর হ'চ্ছে দেবতার আবাসস্থল—তাই।

আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলুন তো কেউই কি খায় না ? কুলিদের মধ্যে কি আপনাদের লোক নেই ?

—খাবে না কেন আর, বোঝেনই তো। লুকিয়ে-চুরিয়ে খেলে আর কি করা যাবে? তবে, আমাদের খাওয়া নিষেধ। তারপরে শুনুন—বড়দিন আমরা করি না—আমরা করি, New Years Day।

—আচ্ছা, বিয়ে সম্বন্ধে আপনাদের রীতিনীতি কি?

—বিয়ে? চিন্তাকুল দৃষ্টিতে নীল পাহাড়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, একজন বৌ থাকলে বা স্বামী থাকলে বিয়ে করা নিষেধ। লভ ম্যারেজ চলে। আমাদেরই তো লভ ম্যারেজ হয়েছে,—বলে মাষ্টার একটু হাসলেন। ডাক্তার একটু অবাক হ'লেন। ঠিক সেই মূহুর্তে তিন কাপ চা একটা কাঁসিতে ক'রে সাজিয়ে এনে রাখলেন মাষ্টারের স্ত্রী। এতক্ষণ তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। এবারেও পাওয়া গেলো না। আধ ঘোমটা দেওয়া মাথাটা মাটির দিকে নুইয়ে স্যাণ্ডাল পায়ে নীরবে তিনি চ'লে গেলেন।

মাষ্টার সেদিকে চেয়ে বললেন—ওকে নিয়ে ভারী মুস্কিলে পড়েছি। এখানে এসে খালি ম্যালেরিয়ায় ভোগে। ভাবছি, শিলং-এ বদ্‌লী হ'য়ে যাবো। সেখানেও আমাদের মিশন্ স্কুল আছে কি না! কই হে— ও মাষ্টার মশাই গেলে কোথায়। বুঝেছি ও জঙ্গলে ঢুকেছে। জঙ্গলেই ওকে খাবে। কই হে মাষ্টার মশাই এসো—চা যে জুড়িয়ে গেলো। চীৎকার ক'রে ডাকলেন খৃষ্টান মাষ্টার।

হঠাৎ সামনের আনারস বনের তল থেকে মাষ্টার মশাইয়ের মাথা বের হ'লো। একটু পরেই তিনি কতকগুলো লতাপাতা নিয়ে এসে হাজির। খৃষ্টান মাষ্টার বললেন, কি হে ল্যাট্‌লেটিয়া ফুল আর গাছ দিয়ে কি করবে?

—ডাক্তার বাবুকে দেখাবার জন্যে নিয়ে এলাম। গাছগুলো বেঞ্চের ওপর রেখে ডান্ হাতে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে তিনি এ দেশী

লতাপাতার গুণাগুণ ব্যাখ্যা ক'রতে লাগলেন। রুনিয়া পাখীগুলো একবার এর মাথায়, একবার ওর ঘাড়ে ব'সে ব্যতিব্যস্ত ক'রছে সবাইকে। গোধূলির ম্লান ছায়া নেমে আসে ধীরে ধীরে। এখনও ফরেষ্ট অফিসের ইন্‌স্‌পেক্‌সান্‌ বাংলোর সাদা হোয়াইট্‌ ওয়াস্‌ আর ত্রিকোণাকৃতি বেগুনাভ টিনের সেড্‌ মিলিয়ে যায় নি অন্ধকারে। মহানিমগাছটার পাতায় পাতায় অন্ধকারের পান্থশালা হ'য়ে উঠছে কেবল। নীল পাহাড় আর সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলা এখনও অদৃশ্য হয় নি। হিমালয় যেন প্রৌঢ় দাদামশাই আর মেঘ যেন চিরশিশু—রংএ প্রাণে উচ্ছল।

ডাক্তাররা বিদায় নিয়ে উঠে পড়ে। খৃষ্টান মাষ্টার বলেন—আসবেন মাঝে মাঝে।

মাষ্টার মশাই কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই। আমাদের বুনো বন্ধু বাড়লো আর একজন! উনিও বনের প্রেমে পড়েছেন।

দাঁড়াতে দাঁড়াতে খৃষ্টান্‌ মাষ্টার বলেন, আচ্ছা ব'লতে পারো হে, চকোয়াখোতি যাবে কে?

মাষ্টার মশাই বলেন—কেন?

খৃষ্টান মাষ্টার বলেন—দুটো রুনিয়ার বাচ্চা আনাতাম। চকোয়াখোতির পথে একটা গাছে ডিম দেখে এসেছি কয়েকদিন আগে—এতদিনে ফুটে গেছে!

ডাক্তার আশ্চর্য হ'য়ে বলে—বাবা, আপনি কোন্‌ গাছে ডিম আছে তার পর্যন্ত হিসেব রেখেছেন!

হেসে বলে ওঠেন খৃষ্টান্‌ মাষ্টার—তা, চকোয়াখোতি পর্যন্ত দশ মাইল পথের প্রতিটি গাছ হিসেব ক'রে ব'লতে পারি, কোন্‌ গাছে রুনিয়ার বাচ্চা বা ডিম পাওয়া যেতে পারে।

ডাক্তার এগোতে এগোতে অবাক হ'য়ে ভাবে, অদ্ভুত লোকটা! পারস্পরিক হাসি-বিনিময়ের মধ্যে বিদায় নেওয়া শেষ হয়। রুনিয়া পাখী কিন্তু বিদায় নেয় না। দু'জনের মাথায় দু'টো চেপে ব'সে থাকে। সামান্য দূর যাবার পর মাষ্টার মশাই ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন—তোমার পাখী কিন্তু চললো। উঃ, কান গেলো যে—বলেই মাষ্টার মশাই লাফিয়ে ওঠেন। আর, তক্ষুণি দুটো পাখীই ফুরুৎ ক'রে উড়ে চলে যায় খৃষ্টান্ মাষ্টারের দিকে। আবছা আঁধারের মধ্যে খৃষ্টান মাষ্টারের হাসির হর্‌রা ছোটে। কেমন! মাষ্টারের পাখী বাপু কান্‌টাকেই সবচেয়ে বেশী ক'রে চেনে। কেমন খেলে তো কান মলা। আবার হাসি।

আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ। শব্দহীন পৃথিবী। শুধু পথের নুড়ির খর্ খর্ আওয়াজ। হঠাৎ মনে হ'লো দূরে যেন কে ছুটে আসছে। শুধু একটা অস্পষ্ট মূর্তির গতির কিছুটা স্পষ্টতা। যেন একটা সচল রেখা। কাছে এলে দেখা গেলো—বনানী।

—বনানী, তুমি?

—সাইকেল থেকে মেমে পড়ে বনানী হাঁপাতে লাগলো। মুখে তার ভয় ও উদ্বেগের ছায়া। হাসবার চেষ্টা ক'রে সে বললো, সাইকেল পেয়েছিলাম একটু আগে—ভাবলাম, এই সুযোগে একবার ঘুরে আসি। নতুন সাইকেল্ শিখেছি কিনা।

—বাবাঃ, তুমি সাইকেল মোটর সবই চালানো শিখে ফেলেছো! সোজা মেয়ে তো তুমি নও। যাও, যাও, শীগগির বাড়ীর দিকে সাইকেল্ ছোটাও। তোমার বাবা জানলে কিন্তু এক্ষুনি মোটর ছোটাবে।

বলা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখা গেলো রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা মস্ত বড় প্রদীপ্ত চোখ শত রেখায় ঝল্‌কে উঠেছে। ডাক্তার ব'ললো—

নাও, এবার হ'লো তো। বাধালে এবার এক কাণ্ড! সাইকেলই শেখো, আর মোটরই শেখো—তোমরা যা, তোমরা তাই।

অন্ধকারের মধ্যে বনানীর চোখে একবার ভ্রূকুটি ফুটলো, বললো, বেশ ঠাট্টা ক'রতে পারেন তো দেখি! ব'লেই সে সাইকেলে উঠে বন্ বন্ ক'রে সাইকেল্ চালিয়ে দিলো। অপ্রস্তুত ডাক্তার বলে—রাগলো নাকি ও?

মাষ্টার মশাই বললেন—একটু আস্তে হাঁটুন—বনানীর সাথে আমাদের দেখলে দুর্ভাবনাটা আর একটু বাড়বে বই কমবে না। অতএব দূর থেকেই ওঁরা ম্যানেজার বাবুর চড়া গলা শুনলেন। মোটর ব্যাক্ ক'রলো। এরা নিশ্চিন্ত হ'লো—বনানী বোধহয় ওদের কথা বলে নি।

বাসায় পৌঁছে ডাক্তার দেখলো—থমথমে আবহাওয়া। রোজকার মত পড়ার ঘরে আলো জ্বলে নি।

ডাক্তারের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে অঞ্জু-মঞ্জু চুপি চুপি ছুটে এলো। ফিস্ ফিস্ ক'রে বললো—জানো কাকু, বাবা ছোড়দিকে বকেছে কিনা—অন্ধকারের মধ্যে সাইকেলে চ'ড়ে গিয়েছিলো ব'লে, তাই ছোড়দি খুব কাঁদছে, আজ আর পড়বে না।

—ছোড়দি কোথায় রে?

মঞ্জু এগিয়ে এসে বলে, ছোড়দি তার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খুব কাঁদছে।

সে রাত্রে ডাক্তারকে নিঃসঙ্গ খেতে হ'লো। মনে কেমন একটা ছম্‌ছমে ভাব। ভাবলো, নাঃ, অন্যের আবেষ্টনী থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার।

পরের দিন সকালে ম্যানেজার বাবু আর বনানী গলাগলি হ'য়ে ডাক্তারের ঘরে এসে ঢুকলেন। প্রসন্ন হেসে বলেন—কি, কি করছো? ম্যানেজার বাবুর চেহারা একটু উস্কোখুস্কো।

ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ম্যানেজারবাবু বললেন—বসো, বসো। দেখো তো—ওকে ব'কে সারারাত আমি ঘুমাতে পারলাম না। ব্লাড্প্রেসার রাত্রে ছ'শো ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

আশঙ্কার সুরে ডাক্তার ব'ললো—তাই নাকি? তা'হলে তো কমপ্লিট রেষ্ট নেওয়া দরকার—কথাবার্তাও.........।

—হ্যাঁ! তোর চেয়ে আমিই শাস্তি পেলাম রে বেশী পাগলি—ব'লে মেয়ের গালে একটা টোকা দিলেন। বনানী নীরবে হাসলো।

—ঠিক এক বছর পরে ছেলে-মেয়েদের আমি বক্লাম্। বকি না কক্ষণও এদের। বেশী বকলে বাপ-সন্তানের সম্পর্ক নষ্ট হয়, শ্রদ্ধার আসন হারাতে হয়—প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেটা আমি ভালো ক'রে বুঝেছি কি না।

আচ্ছা, বল্তো, কেন গিয়েছিলি ওই রকম অন্ধকারের মধ্যে সাইকেলে? জানিস্ তো ওপথে বিকেলেই বাঘ বেরোয়—ব'লেই তিনি মেয়ের কপাল থেকে চূর্ণ অলকগুচ্ছ সরিয়ে দিলেন।

প্রতিবাদ ক'রে বনানী বলে—ইস্, সাইকেলে থাকলে বাঘে ধরতে পারে কিনা!

হো হো ক'রে হেসে উঠে ম্যানেজারবাবু বলেন—সাইকেল! মোটর থেকে পর্যন্ত নিয়ে যায়। সেবার তো আমাদের চলন্ত মোটরের হুডের ওপর দিয়ে একটা রয়্যাল্ বেঙ্গল লাফিয়ে গেলো। ভাগ্যিস্ হুড্ ফেলা ছিল না। যাক্, গিয়েছিস্ গিয়েছিস্—আর যাস্ নে। বাপ্ হ'লে বুঝতি ছেলে-মেয়েদের জন্যে দুর্ভাবনা কি জিনিষ। একটা জ্যোতি ম্যানেজারবাবুর প্রসন্ন মুখের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলেন—আচ্ছা, বলো তো—ওর নামটা কেমন হ'য়েছে? চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মিলিয়ে আমি ওই নাম রেখেছিলাম।

ডাক্তার বলে—চমৎকার মিল হ'য়েছে নামের। গর্বে ম্যানেজারের বুক ভ'রে ওঠে।

—নামটা তো ভালোই দিয়েছি—কিন্তু শিক্ষা যে ওর ভালো দিতে পারছি নে। চা-বাগানের বাবুদের কি যে বিপদ—ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না ঠিক মত। এদিক দিয়ে অবশ্য আমার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে এই আমার মায়ের কাছেই অপরাধী বেশী। কি বলিস্ রে মাতা ?

—যাও। তোমার বড় বাড়াবাড়ি। ব'লে বনানী হাত ছাড়িয়ে নেয় এক ঝঁাটকায়।

—সত্যি ওর কাছে আমি অপরাধী। যেটুকু স্থবিধে আমার ছিলো তা' ওদের কলেজের এক মেয়ে প্রিন্সিপ্যালই শেষ করলো।

—থাক্—আর একদিন বললেই চলবে সেটা। ডাক্তারবাবু বেশী কথা ব'লতে মানা ক'রে দিয়েছেন না তোমায় বাবা ?

—দেখো, বাপের ওপর কেমন সতর্ক দৃষ্টি দেখো! কেবল আমি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই কেঁদেকেটে বালিস্ ভাসাতে হয়—না ? কটাক্ষ করলেন তিনি মেয়ের দিকে।

—যাও। বালিস্ আমি ভিজাই নি,—বাবা খালি লাগায় আমার নামে।

—লাগাবোই তো। তুই যে আমার মা। আচ্ছা, নিয়ে আসি বালিস্টা ? একটু আগে অঞ্জু-মঞ্জু দুয়োরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তারা ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করছিলো বাবা এখনও রেগে আছে কি না। বাবার মুখে হাসি দেখেই আর একটা মজার কাজ জুটে গিয়েছে ভেবে তারা—এরে, বালিশ নিয়ে আসি গে ব'লতে ব'লতে ছুট।

চীৎকার ক'রে বনানী ওদের পেছন্ পেছন্ ছোটে—অঞ্জু-মঞ্জু মেরে হাড় ভেঙে দেবো কিন্তু,—ফাজিল হ'য়েছো, না! ছোড়দির সাথে

ইয়ার্কি। একটু পরেই দেখা গেলো তারা শুকনো-মুখে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ম্যানেজার বাবু ওদের সুগন্ধি চুলের ওপর আদর ক'রে একটা চুমো খেয়ে বললেন—ছোড়দি ব'কেছে তোদের, আয় বলে বুকে তুলে নিলেন।

বনানী বাপের দিকে চেয়ে বললো—তোমার ব্লাডপ্রেসারটা একবার দেখাওনা কাকুকে!

—থাক্।

—না থাক্ না। কাকু একটু দেখবেন বাবার ব্লাডপ্রেসারটা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—এক্ষুণি নিয়ে আসছি আমি যন্ত্রটা। ব'লেই ডাক্তারখানার চাবি নিয়ে ছুটলো।

যন্ত্র এনে হাতের কনুই-এর ওপরে বাঁধন দিয়ে টিউবের সাথে যুক্ত একটা গোলমত কালো রবারের পাম্পারে পাম্প দিতে লাগলো ডাক্তার। পাম্প দিয়ে ছেড়ে দেয়—আবার একটু বাদে পাম্প দেয়। এমনিভাবে কয়েকবার কররার পর বাঁধন খুলতে খুলতে বনানীকে বললো—না, কমে গেছে অনেকটা। তোমার সাইকেল চড়ার ক্ষমতা আছে। বাবার ব্লাডপ্রেসার উঠিয়ে ছেড়েছো। এমন সাইকেল্ বোধহয় আর কেউ চড়ে নি। একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করলে কিন্তু!

ছোট্ট মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বনানী বলে,—সবাই আমার সাথে ঠাট্টা করে—আমি যাই—ব'লেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে।

অঞ্জু-মঞ্জুর কিন্তু সেদিকে নজর নেই। তারা অদ্ভুত যন্ত্রটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মঞ্জু হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে বলে—ব্লাডপ্রেসারটা আমার হাতে বেঁধে দাও না কাকু! ডাক্তার আর ম্যানেজার হো হো ক'রে হেসে ওঠেন। এমন সময় বাগানের সেই মালী চেঁচাতে চেঁচাতে এসে ঢুকলো—মুরুক্ তোড় দেতা হ্যায়! বদমাস্ সব লেড়কা!

ম্যানেজারবাবু হেসে বলেন—কি মুরুক্ তোড়তা হ্যায় বুড়ো?

বুড়ো জোরে জোরে বলে—নেম্‌মু, নেম্‌মু।

—ও, বাতাবী লেবু, ছিঁড়ে নিয়ে গেছে সব ছেলেপেলে? আচ্ছা, যাও আমি ব'কে দেবো খুব!

বুড়ো প্রসন্নমুখে ফিরে গেলো। ব'লতে ব'লতে গেলো, খানেকোভি দেতা হ্যায়—তভ্‌ভি তোড়নে রহা।

—আচ্ছা, তুমি তোমার কাজ করো কনক—আমি একটু শুয়ে থাকি গে, একটু বিশ্রাম দরকার আজ। ব'লেই ম্যানেজারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

শরৎ এসেছে—কিন্তু বর্ষা যায় নি। বনের মাথার ওপরে একখানা কালো মেঘ প্রায় সব সময়েই মোতায়েন্ থাকে। ছোটবেলার বই-এর পৃষ্ঠায় পড়া ভূগোল যেন রূপ পরিগ্রহ্ করে। বনের সাথে মেঘের আকর্ষণ। বনের শরীর বড় গরম—তাই, মেঘের জল ছাড়া তার স্নান হয় না। স্নানও কি সে এত করে!

আজ ভোর থেকেই বৃষ্টি সুরু হ'য়েছে। জানালার সার্সী দিয়ে চেয়ে মনে হয় যেন কেশর ফুলিয়ে হিমালয় তেড়ে আসছে। একটু পরেই হিমালয় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। পাম্ গাছের পাতা কাঁপছে। উদাসী ইউক্যালিপটাস্ আলুথালু বেশে বৃষ্টিতে ভেজে। বাতাস তার লেবুগন্ধীভিজে চুলে নাড়া দিয়ে যায়। এক ঝাঁক পাখী উড়ে গিয়ে ফ্যাক্টরীর লাল টিনের উপর বসে। দু'একটা ইলেকট্রিক্ বাল্‌ব বাইরে চিক্ চিক্ ক'রে জ্বলছে—লাল্‌চে আভা অস্পষ্ট। ফ্যাক্টরীর ভেতরের অন্ধকার দূর থেকেই দেখা যায়। ছাতি মাথায় ডোকো ঘাড়ে দু'চারটে ক'রে কুলি পাতি তুলতে চলেছে। কারও পায়ে খড়ম্। কেউ চট্ মাজার সাথে পেঁচিয়ে নিয়েছে—পাছে, গাছের জল লেগে জামা ভিজে যায়। বেশী কুলি হবে না আজ। ফ্যাক্টরীর ক্লান্ত শব্দ শোনা

যায়। চারিদিকে যেন ফাঁকা নির্জনতা। বর্ষার বিষণ্ণতা ঘিরে রেখেছে সমস্ত ফ্যাক্টরী অঞ্চলকে। কুয়াসার মত সাদা বৃষ্টির কণা অবিরাম ঝরছে। কামারশালাই আজ জমেছে শুধু। হাপরের টানে ফুঁসেওঠা লালচে আগুনের চারপাশে ঘিরে ব'সেছে ফ্যাক্টরীর কুলিরা—কেউ কাজ পালিয়ে,—কেউ বেকার। লরীগুলো গরুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে।

ওপরের কাঠের মেঝেতে দুম্ দুম্ আওয়াজ হচ্ছে। ছেলেমেয়েদের সাথে লুকোচুরি খেলছেন ম্যানেজারবাবু। ডাক্তার ব'সে আছে বিষণ্ণভাবে চেয়ারে বাহিরের দিকে চেয়ে। কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হয়।

এই বৃষ্টির মধ্যেও একটা শীর্ণ কুলির ছেলে ভিজতে ভিজতে এসে বারান্দায় ডাক্তারের সামনেই ব'সেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চাইছে। দেখেই বোঝা যায় ক্ষুধার্ত সে। বুকের ভেতরটা ব্যাথায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠে ডাক্তারের। ডাইরীর পৃষ্ঠায় আজ ওরই দুঃখ ফুটাবার আবেগ জাগে। তর তর ক'রে লিখে চলে সে—'এক অমানব ক্ষুধার্ত কুলি-শিশু বাইরে ব'সে আছে। চুলগুলো রুক্ষ, বিবর্ণ—তেলের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক কোনদিন ছিলো ব'লে বোঝা যায় না। বিদেশী শাসন আর দেশী শোষণ যেন তার চোখ থেকে সমস্তটুকু রক্ত শুষে নিয়ে গেছে। মায়া হয় ওকে দেখে। ওর সাথে কোথায় যেন একটা বন্ধন অনুভব করি। সে বন্ধন ব্যথার। ও যেন আমাদের সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি। ও যেন আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যভরা জীবনের বিরুদ্ধে মস্ত একটা শ্লেষ। ও যেন মানবতার আত্মবিকাশের পথের মস্ত একটা ইঙ্গিত। ওর অসহায়-বেদনাকাতর চোখের তারায় যেন আমি ভারতীয় রাজনীতি আর অর্থনীতির সমগ্রত্ব উপলব্ধি করি। ও আমার মানবতার দৃষ্টিপ্রদীপ। মনুষ্যত্বের সংগ্রামের রক্তাক্ত প্রান্তরে ওর ওই

ফ্যাকাসে চোখের তারা যেন আমার প্রেরণার অগ্নিবীণা। ওই চোখের নিষ্প্রভ কালো মণিকে স্মরণ ক'রে হাতিয়ার আপনিই হাতে উঠে আসে। মৃত্যুর ভয় দূর হয়ে যায়। ও যেন আমাকে মনুষ্যত্ব-হীনতার অতলস্পর্শী খাদের ভেতর থেকে উদ্ধার ক'রলো। ওকে নমস্কার করি।'

ডাইরী লিখে উৎসাহে প্রদীপ্ত হ'য়ে ডাক্তার সুটকেশ থেকে অঞ্জু-মঞ্জুর জন্যে সদ্য-কেনা বিস্কুটের বাক্সটা পড়্‌পড়্ ক'রে টেনে ছিঁড়লো। রাজার ডিনার টেবিলে পুঁটি মাছের চচ্চড়ি না হ'লেও চলবে। হতভাগ্য ছেলেটি তো একটু বাঁচুক্। কতকগুলো বিস্কুট নিয়ে সে ছেলেটির হাতে দিয়ে এলো। ছেলেটি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলো। বিস্কুটরূপী ভগবান্ যেন তার সামনে হাজির এমনি উল্লাসের সাথে সে সেগুলো তার ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্তে বেঁধে নিলো এবং ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই নেমে পড়লো।

মনের বেশ কিছুটা তৃপ্তি নিয়ে গান ধ'রে দিলো ডাক্তার—

"কে আমারে দিলো দোলা
নিখিল রূপের রং মহালে।
কে আমার হৃদয় মাঝে
রূপ-মাধুরীর বান্ বহালো ?

সে যে আমার দেশের আলো, দেশের আলো, দেশের আলো।"

দরজায় চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একজন মিটিমিটি হাসছে। তার পটোলচেরা রক্তাভ আঁখিতে যে দুষ্টুমির হাসির সাথে সপ্রশংস ভঙ্গী ফুটেছে তন্ময়তার ঘোরে ডাক্তার বুঝতে পারলো না তা। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে বনানী সশব্দে হেসে বলে—কেমন, ধরা পড়ে গেলেন তো কাকু।

ডাক্তার চমকে পেছনে তাকিয়ে অপ্রতিভের হাসি হেসে ব'লে উঠলো—নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলো না দেখছি। নিজে গান গেয়ে নিজে শোনার অধিকারও তুমি দিতে রাজী নও—মুস্কিল।

—আপনি কিন্তু চমৎকার গান করছিলেন কাকু।

—তাই নাকি? যাক্, সার্টিফিকেটটা মুলতুবী রইলো—বড়লোকের মেয়ের সার্টিফিকেট—ভবিষ্যতে কাজে লাগতেও পারে।

—দেখুন কাকু—রুখে উঠে বনানী বলে—আপনি বড়লোকের মেয়ে বলে অনেক সময় ঠাট্টা করেন—কিন্তু আমাদের চালচলনে কি বড়-লোকীভাব খুব কিছু দেখতে পেয়েছেন? বাবা আমাদের তেমন করে গড়ে তোলেন নি। আমার ভারী খারাপ লাগে ওকথা শুনে—বলেই ডাক্তারকে আর কোন কথা বলবার স্থযোগ না দিয়ে বনানী চকিতে মিলিয়ে গেলো ঘর থেকে। ডাক্তার হতভম্বের মত ব'সে রইলো। মনে হলো, এমন কথা বলা ভালো হয় নি। সত্যি মেয়েটি তেমন নয়। কলকাতায় বড়লোকের মেয়েদের কিছু কিছু দেখেছে তো সে।

হঠাৎ একটু পরেই বনানী হৈ হৈ করতে করতে এসে ঢুকলো—কাকু, আপনার কল এসেছে কামসিং গ্রাম থেকে। আমি ড্রাইভ করে নিয়ে যাবো, বাবা বলেছে—বলেই সে ছেলেমান্থষের মত লাফাতে লাগলো। তার মনে আর এতটুকু দাগ নেই আশ্চর্য। ডাক্তারের মনে হলো ও যেন এক টুকরো পাহাড়ী নির্ঝর।

ম্যানেজার বলতে বলতে ঢুকলেন—কনক কামসিং গ্রাম থেকে একবার ঘুরে এসো। একটা কঠিন কেস। লোকটা এক সময় এ বাগানের সামান্য কুলি ছিলো, আজ সে লক্ষপতি। তুমি সেদিন আমার কথা মানলে না—এই দেখো; সমাজ রাষ্ট্র যাই হোক্ মান্থষের

নিজের চেষ্টায়, নিজের প্রতিভায় ওপরে ওঠা কেউ রোধ করতে পারে না।—এটাকেই বলে Elen Vital

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বলবন্ত সিংকে পাশে সরিয়ে দিয়ে ওদিকে বনানী বাম হাতে অধীরভাবে ষ্টিয়ারিং ধ'রে বসে আছে আর ব্যাকুলভাবে বাবার মুখের দিকে চাইছে ঘন ঘন। ম্যানেজার বাবু ওর দিকে চেয়ে স্নেহের হাসি হেসে বললেন, বনা রে মা, তুই সত্যি ছাড়বি নে। কবে যে কি করে বসবি আমার তাই ভয় হয়। সেবার বলবন্ত সিং না থাকলে ওকে কি আর ফিরে পাওয়া যেতো—গাড়ী একেবারে রাস্তার নীচে নামিয়ে দিয়েছিলো। সাবধানে চালাস্ মা। বলবন্ত সিং হুঁসিয়ার থেকো।

ওদিকে self starter এ চাপ দিয়ে মোটর ষ্টার্ট দেওয়া হয়ে গেছে বনানীর। তার মুখে চোখে গতির প্রখর-উন্মুখতা। পেশাদার মোটর ড্রাইভারের কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে সে clutch দিয়েই gear টেনে দিলো। ভট্ ভট্ ভট্ ভট্ ক'রে silencer pipe দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। বোঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক'রে মোটর ছুটলো। বাইরে দুর্যোগ সমানে চলেছে। হাওয়ার দোলায় বনানীর চূর্ণ অলক উড়ছে বিশৃঙ্খলভাবে। সেই যেন তার এক সৌন্দর্য। রোগীর ভাইএর সাথে ডাক্তার পেছনে বসে আছে। মোটর একটু এগোতেই সামনে মাষ্টার মশাই পড়লেন। ডাক্তার বললে যাবেন নাকি ?

—কোথায় ?

—রোগী দেখতে যাচ্ছি কামসিং গ্রামে, যাবেন ?

মাষ্টার উঠলেন। মোটর আবার চললো। বনানী কিন্তু মোটর চালাবার সময় একেবারে গম্ভীর। তার সে চঞ্চলতার বিন্দুমাত্র চিহ্নও নাই। শুধু ঘড়ীর কালো মলমলের ব্যাণ্ড বাঁধা তুষারশুভ্র কব্জাটা ষ্টিয়ারিং ঘুরাবার জন্যে এদিকে ওদিকে নড়ছে, আর

অপারদর্শিতার জন্যে গাড়ী মাঝে মাঝে ঝাঁকি খাচ্ছে। চমৎকার কতকগুলো বাঁশের ঝোপ পড়লো বাগানের প্রান্তে, ঠিক যেন ফুলের এক একটা আলাদা তোড়া।

কি চমৎকার এদিকের বাঁশের ঝোপ!

—হ্যাঁ, সুন্দরী রোগিণীর মতই চমৎকার।

—কেন? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে ডাক্তার।

—ওরাই যে এদিকের ম্যালেরিয়া আর মশার উৎপত্তিস্থান।

—তাই নাকি?

আবার চুপচাপ। এইবার কামসিং গ্রাম। গ্রামটা অদ্ভুত। বাংলা দেশে হয়েও গ্রামে এক ঘরও বাঙালী নেই। প্রধানতঃ ওরাওঁদের বাস। চা-বাগানের কুলি হিসেবেই এরা প্রথম এসেছিলো। কালে কালে খাস মহালের কাছে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে তাদের চাষী জীবনের মূল আকিঞ্চন্‌কে সন্তুষ্ট করেছে। কুলি তারা হতে পারে নি। হতে চায়ও নি। এরকম গ্রাম এদিকে একখানা নয়, অসংখ্য। চা-বাগানকে কেন্দ্র করে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

ডাক্তারের রোগী বালী মণ্ডল এই গ্রামেরই মাতব্বর। সামান্য কুলি থেকে বিরাট অবস্থা করে ফেলেছে সে। কিন্তু তার হালচাল তাই বলে বদলায় নি একটুও। সেই হাটুর উপরেই কাপড়। কাদা মাখা পা। বিরাট টিকি। কথা একটুও মার্জিত হয় নি। কেবল সে ব্যবহারে একটু ভদ্র হয়েছে আর কুলির পোড়া চামড়াটা তার একটু মসৃণ হ'য়েছে।

ছোটনাগপুরের পিথ্‌রা গ্রামে তার আদি বাস। বাপের মৃত্যুর পর কাকা সম্পত্তির লোভে পিতৃহীন কিশোরকে একদিন এক রিক্রুটারের হাতে তুলে দেয়। পুরনো পারিবারিক জীবন তার মুছে যায়। বাগান থেকে বাগানে সে কাজ করে বেড়ায়।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে করে অবশেষে সে কিছু টাকা জমাতে সমর্থ হয়। জমির স্বপ্ন সে ভুলতে পারে নি কোনদিন। কুলির জীবনকে সে ঘৃণা করতে শিখেছিলো। সেই সময় খাস মহল থেকে বিরাট বিরাট জমির প্লট্ খুব সস্তায় বন্দোবস্ত দিতো এ জেলায়। বালি একদিন ছোটখাট একটা প্লটের মালিক হয়। যে কোন সময়ে বাড়ী ঘর তুলে দেবার খাস মহলী বিচিত্র আইনের আশঙ্কা বালির মাথায় ঝুলেছে বহুকাল। যারা নিজেদের হাতে চাষ করে তাদের অবশ্য বাড়ী ঘর তোলা প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলো স্থবিধে পায়। জমি সম্বন্ধে বুদ্ধি পরিপক্ক হতে থাকায় বালি সেই সমস্ত স্থবিধা নানা ফন্দী ফিকির করে আদায় ক'রে নেয়। আজ সে নব্বই হাল অর্থাৎ তেরোশো পঞ্চাশ বিঘা জমির মালিক।

নতুন সংসার রচনা করলো বালি নতুন জমির ওপর। কুলির জীবন থেকে মুক্তি পেলো সে অবশেষে। তার স্বপ্ন হ'লো সার্থক। এদেশী গ্রাম্য দাওয়ানীদের (গ্রামের প্রধান) মত সে বিয়ে করেছে একটা। বিধবা রেখেছে চারটে। বাড়ীতে লোকজন রাখার দাওয়ানী ফন্দীরও অনুকরণ করেছে। মাইনে দিয়ে চাকর সে রাখেনি। একজন লোককে বাড়ীতে নিয়ে এসে রেখেছিলো—খাবে দাবে থাকবে। বিয়ের সময় বিয়ে দেবে। এইভাবে কয়েকটি পরিবার তার পরিবারকে বৃহত্তর করেছে। লোকজন, দাসদাসী, হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া'র মত জমজমাট অবস্থা ক'রে ফেলেছে বালি মণ্ডল। দশ পনেরো মাইলের মধ্যেকার লোকে এখন একবাক্যে চেনে তাকে।

সেই বালি মণ্ডলের আজ অস্থখ। মোটর থামিয়েই দরজা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করে বললো বনানী —আস্থন।

দূর থেকেই তারা ঢাকের শব্দ শুনতে পেয়েছিলো। উঠোনে পা দিয়েই দেখলো এলাহি ব্যাপার। ঢাক ঢোল বাজছে। কলার ভেলায় নৈবিদ্যি সাজানো হ'চ্ছে। ডাক্তার আশ্চর্য হ'য়ে সঙ্গের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো—ব্যাপার কি হে ?

লোকটি ফিসি ফিসি বললো—খুব ভারী দেও (ভূত) ধ'রেছে দাওয়ানীকে। তাই, ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা দিয়েছেন বৈদ্য।

বিরক্ত মুখে ডাক্তার ওর পাছ পাছ ঘরে ঢুকলো, আর সবার নিষেধ সত্ত্বেও বনানী। সে বললো, এদের জীবনযাত্রা আমার দেখতে বড্ড ইচ্ছে অনেকদিন থেকে। আমি শুনছিনে।—বলে লঘুপদে এ বাড়ীর সবার অবাক করা চাহনীর ব্যূহ ভেদ করে আগে আগে বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো।

রোগীর পাশে বৃদ্ধ বৈদ্য ব'সে আছেন বালির নাড়ী ধরে। ডাক্তার এসেছে শুনেই তার মুখে কেমন কুটিল রেখা ফুটে ওঠে। ডাক্তার ওঁর নাড়ী ধরার কায়দা দেখে বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখে। কব্জীর যেদিকটায় উঁচু মত গোল হাড়, সেই দিকটায় তিনি চেপে ধরে আছেন। ডাক্তারকে দেখে তিনি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ব'ললেন, উহুঁ, গতিকটা ভালো নয় বটেক্।

গতিক যে ভালো নয় তা রোগীর অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। শ্বাস উঠে গেছে। এখন নামানোই শুধু বাকী। সামান্য কিছু না করলে নয় বলে ডাক্তার একটা ইনজেকসান্ ক'রে দিলেন নাড়ীটাকে একটু চাঙা করবার জন্যে। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। বাইরে আসতে না আসতেই কান্নার রোল্ উঠলো।

মোটরে ওঠার সময় বালির ছেলে ডাক্তারকে দশ টাকার দু'খানা নোট পকেটে দিতে গেলো বাঁ হাতে চোখ মুছতে মুছতে। অদম্য

লোভ প্রাণপণে সংযত করলো ডাক্তার। ছেলেটি অবাক হয়ে একবার ডাক্তারের দিকে চাইলো।

সাধারণ ভদ্রতার জন্যে ডাক্তার ভাইকে ও ছেলেকে একটু আধটু সান্ত্বনা দেয়। একটু খবরাখবর নেয়। ছেলেটি যা বলে তাতে বিস্ময়ে তার চোখের মণি ঠেলে বেরোবার মত হয়। বৈদ্য নাকি রোগীকে কাল দারুণ জ্বরের ওপরই মাংস ভাত খাইয়েছে—আজও দই ভাত খাইয়েছে। অথচ, রোগটা তার নিউমোনিয়া। দেউকে তাড়াবার জন্যেই নাকি এই ব্যবস্থা।

মোটর আবার ছাড়লো। ষ্টিয়ারিং বাঁ হাতে ধরে বনানী বললো কি আশ্চর্য এ্যা—নিমুনিয়ায় ওপর দই ভাত খাইয়েছে! বস্তিগুলো কি!

মাষ্টার হেসে বললো—ওই রকমই আর কি। ওরাই তো সাধারণ লোকদের মনে ডাক্তারের সম্বন্ধে একটা ভয় আর অবিশ্বাস সৃষ্টি করে থাকে—পাছে তাদের পসার মারা যায়। আজ পর্যন্ত কত ঘটনা দেখলাম।

মোটর পূর্ণ গতিতে আবার আঁকা বাঁকা পাথুরে পথে ছুটেছে। মোটরের শব্দের মধ্যে কথা ডুবিয়ে মাষ্টার বলেন—আপনি নোট দু'খানা নিলেন না, বাগানের অন্য ডাক্তার হ'লে কি করতো জানেন?

—কি করতো?

—অন্যমনস্কভাবে পকেটটা একটু ফাঁক ক'রে দাঁড়াতো।

—যা-ন্। ডাক্তার হেসে উঠলো।

—হাসবেন না মশাই—এই-ই এখানে রীতি। সব বাগানেই এই। ওতেই হাসছেন, এরা কি করে শুনলে আপনার তাক লেগে যাবে!

—কি করে? কুতূহলী দৃষ্টি ডাক্তারের চোখে।

—শুনুন এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কারও হয়তো নিমুনিয়া হলো, এরা চেষ্টা ক'রে সেটাকে বাড়িয়ে নেবে। নিমুনিয়া ট্রিটমেণ্ট তো আজকাল অত্যন্ত সোজা। রোগ বেড়ে গেলে কন্‌ট্র্যাক্ট করবে —তিনশো টাকা দাও তো সারিয়ে দিতে পারি। ওরা তো একেবারেই বোকা, তার ওপর ভীতু। রোগে আরও বেশী ভীতু হয়ে পড়ে। সহজেই রাজী হ্য়ে যায়।

—বলেন কি ?

—আর বলেন কি! আরও আছে দাঁড়ান, ওতেই অধৈর্য হবেন না। ও ছাড়াও রোগী যেদিন স্নান করবে সেদিন টাকা নেবে, যেদিন ভাত খাবে সেদিনও। মায়া দয়া এদের নেই—এমনিই এরা। মাষ্টারের চোখে একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুঠে ওঠে। এই অঞ্চলের কুলি আর বোকা বাহেদের ঠকাবার এক একটি যন্ত্র হ'চ্ছে এই সব সাদা চামড়া আর ফর্সা জামা কাপড়ওয়ালা বাবুরা। যে যা পারে, যেভাবে পারে, যার কাছ থেকে পারে আদায় করে। তাই, এ অঞ্চলে এদের নাম ভাটিয়া ঠগ্। আমরা হচ্ছি ভাটিয়া ঠগ্ বুঝলেন।

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার বলে—বাবা, বেঁচে থাকুক্ আমার আশীটি টাকা।

রহস্যের স্বর ফোটে মাষ্টারের ঠোঁটে—বেঁচে কি আর থাক্‌বে। থাকুন কিছুদিন, দেখবেন ও আশী টাকা মরে ভূত হ'য়ে গেছে কবে। ঠিকও পাবেন না আপনি। ওর মৃত্যুর শ্রাদ্ধের খরচই মাসে আশী-টাকাকে ছাড়িয়ে যাবে। দেখছি তো এতকাল ধ'রে। এই আমার দশ বছর হলো। বাগানের স্কুলে কাজ করি বটে কিন্তু, কারবার আমার বাগান নিয়েই। থাকুন, ধীরে ধীরে অনেক খবরই জানতে পারবেন। খবরের জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। সবাই আপনাকে খবর যোগাবে।

মরালের মত গ্রীবা বেঁকিয়ে বনানী ব'ললো—কাকু, এরোড্রোমের রান্‌-এ্যাওয়ে (Runaway) হ'য়ে ঘুরে যাই।

উৎসাহের সাথে ডাক্তার ব'ললো, চলো।

রান্‌এ্যাওয়ে। ভোটানের স্বদুর্গম্‌ সীমান্তে শত্রুর আয়ত্তের বাইরে এই এরোড্রোম তৈরী হয়েছে। কে বলবে, কিছুদিন আগেও এখানে এক গহন অরণ্যের অস্তিত্ব ছিলো। আজ মাইল চার-পাঁচেক বৃত্তাকার একশো হাত চওড়া ঝক্‌ঝকে সিমেণ্ট-বাঁধাই রাস্তা এই অরণ্য রাজ্যটিকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে। যেন নীল অরণ্যের গলায় বেল ফুলের মালা। রান্‌এ্যাওয়ের আসে পাশে স্থপারির বন। তাতে লক্ষ লক্ষ না হোক্‌, হাজার হাজার স্থপারী গাছ যে আছে তা'তে কোনই সন্দেহ নেই। এই স্থপারীর বনের মালিকও ভূতপূর্ব এক কুলির সর্দার। স্থপারি বনের মধ্যে কিছু কিছু বাঁশের ঝাড়েরও অস্তিত্ব আছে। বন এতই নিবিড় যে দিনের বেলাও তা'তে রাতের অন্ধকারের আভাস র'য়েছে। সেই বনের ফাঁকে ফাঁকে, ছায়ায় ছায়ায় অসংখ্য camouflage। শত্রু প্লেন্‌কে ফাঁকি দিবার জন্যে ছোট ছোট সিমেণ্ট-প্লাষ্টারিং খড়ো ঘর লুকিয়ে র'য়েছে। কিন্তু আর তাদের লুকোবার প্রয়োজন নেই। কেননা, যুদ্ধের মোড় ফেরবার সাথে সাথে এই এরোড্রোম অব্যবহার্য বোধে পরিত্যক্ত। এতবড় বিরাট রাজ্য আজ শূন্য—নিস্তব্ধ। যেন কোন্‌ উপকথা বর্ণিত স্বপ্নের দেশ। ঘোড়াশালে ঘোড়া নেই, হাতীশালে হাতী নেই, মানুষের আবাস গুলো শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে শুধু। যেন কোন্‌ ভয়ঙ্কর রাক্ষস সব উজাড় করেছে খেয়ে।

সেই ঘুমন্ত দেশের রাজপথে যেতে যেতে ডাক্তার মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে বললো—বাঃ, এমন চমৎকার জায়গা এখানে আছে তাতো জানিনে।

মাষ্টার বাঁকা হেসে ব'ললো—হ্যাঁ, চমৎকার বটে—কিন্তু, চমৎকার দেশ গড়তে কিরকম টাকার ছিনিমিনি খেলা চলেছে জানেন? ষাটটি লাখ টাকা খরচ হ'য়েছে—আর, তার চল্লিশ লাখই চুরি।

—চুরি?

—হ্যাঁ, চুরি। সি, পি, ডবলুর' ছোকরারা আমাদের বাগানে থাকতো তো সব। তাদের কাছেই শুন্‌তে পেতাম। যে যেভাবে পেরেছে মেরেছে।

—চল্লিশ লাখ টাকা চুরি!

—হ্যাঁ। আর সেই ষাট লাখ টাকার দুরবস্থা দেখেন এখন। পাই পয়সাও কাজে লাগলো না। এ যেন ঠিক বড়লোকের মেয়ের পুতুলের বিয়ের উৎসব।

—উঃ! ষাট লাখ টাকার এমন অপব্যয়! আর, আমাদের দেশের লোক দুর্ভিক্ষে না খেয়ে লাখে লাখে ম'রলো!

—এতো শুধু একটা। তাও চোখের সামনে রয়েছে ব'লে বুঝতে পারছি। এমনি কত নিষ্ফল অপব্যয়ের গুপ্ত ইতিহাস আছে তা' কে বলবে। আমাদের দেশের মত গরীবের অর্থ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে চলে জানিনে।

হঠাৎ বনানী Axeleratorএ চাপ্ আল্‌গা ক'রে মোটরের গতি কমাতে কমাতে সুপারীর বনের একাংশে দৃষ্টি প্রখর করে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললো—কাকু, ওই দেখুন হরিণ। দেখুন, দেখুন শীগ্‌গির। পালালো।

একটা পাটকেলি রংএর ছোট্ট বাছুরের মত হরিণ এক ঝলক মাত্র অবাক চাহনি মোটরের দিকে নিক্ষেপ ক'রেই বনের মধ্যে লাফাতে লাফাতে ঢুকে গেলো চকিতে। মোটর থামিয়ে নেমে পড়লো সবাই। কিন্তু, আর দেখা গেলো না।

খুসীতে উছ্‌লে প'ড়ে বনানী ব'ললো—দেখেছেন তো?

ডাক্তার পরম খুসী হ'য়ে বললো, হ্যাঁ! যাক্ শেষ পর্যন্ত বন্য হরিণ দেখলাম।

—কেমন হ'লো তো। এই দিকে এসেছিলাম বলেই তো। গাড়ী আবার এতই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো যে প্রৌঢ় দক্ষ ড্রাইভার বলবন্ত সিংহ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে মোটরের ষ্টিয়ারিংএ হাত দিতে দিতে বললো—তুমি আজ আবার একটা কিছু ক'রবে বনা। বহুৎ তো চালালে—এবার আমার কাছে দাও।

—না—বলে প্রবলভাবে ঘাড় ঝাঁকি দিলো বনানী। গতিবেগ তাকে স্পর্শ করেছে।

বাসায় পৌঁছবার সাথে সাথে ম্যানেজার বাবু ওপরের রেলিংএর ওখান্ থেকে ব'ললেন—কি রে এসেছিস্—যাক্। এতক্ষণ তিনি উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেলিংএ ভর দিয়ে। অঞ্জু-মঞ্জু—ছোড়দি রে ছোড়দি, বলতে বলতে পড়ি মরি ক'রে ছুটলো।

ডাক্তার নেমেই দুটো অপরিচিত মুখের সাক্ষাৎ পেলেন বাসায়। ম্যানেজার বাবুর দু' ছেলে এসেছে। তারা কুচ্‌বিহারে পড়ে। বাগানের মোটর গিয়েছিলো তাদের আন্‌তে। তাদের সাথে আলাপ হলো ডাক্তারের।

খাবার সময় আজ আরও জ'মেছে। মার্টিনের দ্বিগুণ উৎসাহ। তার সেই মন উদাস্ করা শিস্ থেকে থেকেই বেজে উঠছে। উৎসাহের আতিশয্যে সে মেঝেতে জলের ওপরই ডিগবাজী খেতে খেতে ঘরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত যাচ্ছে। সবার হাসির সাথে সাথে তার উৎসাহ আরও বাড়তে থাকে। রান্নু খুকুর জন্যে সে অদ্ভুত সব খাবার আগে থেকেই তৈরী রেখেছিলো।

চমৎকার একখানা ময়ূরকণ্ঠী রংএর সাড়ীতে সেজে বনানী কি একটা জিনিষ পরিবেশন ক'রছে আজ। ডাক্তারের পাতের কাছে একটা বাটি রাখতে রাখতে ব'ললো—বলুন্ তো কাকু, এটা কি? বা, জানেন না—এটা ডিমের ডেভিল্! কে রেঁধেছে বলুন্ তো?

ডাক্তার ব্যাপারটা ধ'রতে পেরে ব'ললো—তুমি।

—বারে, জানলেন কি ক'রে? কেমন হ'য়েছে বলুন তো?

ডেভিলে কামড় দিতে দিতে ডাক্তারের বহুদিন আগেকার একটা স্মৃতি হঠাৎ মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে বেরিয়ে এলো। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে চলেছে দরিদ্র গ্রাম্য বালক। কুড়ি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে—ঊর্ধ্বশ্বাসে। কাল পরীক্ষা। কিন্তু তখনও খাওয়া থাকার জায়গা ঠিক নেই। ঠিক অবশ্য হয়েছিলো—কিন্তু সে লোকটি শেষ মুহূর্তে অস্বীকার ক'রেছে। গরীব মায়ের ছেলে। বহুকষ্টে এর ওর কাছে চেয়ে চিন্তে পড়াশুনা চালিয়েছে। কিন্তু সব বুঝি ব্যর্থ হয়। তার স্বেদসিক্ত ললাটে দারুণ উদ্বেগের ছাপ। ক্লাশের ফার্ষ্ট বয় সে!

সহরে গিয়ে জায়গা আর পায় না। শেষে, ক্লাশের সেকেণ্ড বয়এর কাছে গিয়ে সে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো। ছেলেটি ভালো। একটা ভাঙ্গা বেঞ্চ জোড়া দিয়ে ওর থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলো। অবশ্য, খাবার খরচ তার বেশী লাগে নি। কেননা, জ্বর নিয়েই সে পরীক্ষা দিয়েছে।

আর একটা ঘটনা সিনেমার ছবির মত তার চোখের ওপর দিয়ে উড়ে গেলো। একদিন টুন্‌টুনি বাজিয়ে গ্রামে বারো মজাওয়ালা এসেছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে মায়ের কাছে একটি পয়সা চাইলো। মা তাকে দিলো কেবল কতগুলো চোখের জলের ফোঁটা। সে ফোঁটার মর্ম সেই বালকটি সেদিন বুঝতে পারে নি। আজ ডেভিলে কামড় দিতে দিতে তার মর্ম বুঝতে পারছে!

ডাক্তারের দিকে চেয়ে বনানী হাসিতে কুটপাট হ'য়ে বললো—আচ্ছা লোকত' আপনি কাকু। ডেভিলে কামড় দিতে দিতে চুপটি ক'রে বসে আছেন? এমন অন্যমনস্ক লোক!

ম্যানেজার বাবু ওর দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, ভারী অন্যমনস্ক তুমি কনক।

কনকের কানটা একটু লাল হলো। খাওয়া সে নীরবেই শেষ করলো।

বাচ্চা ডাক্তার ক্রমেই সাচ্চা ডাক্তার হ'য়ে উঠছে। এরই মধ্যে কুলিদের এবং কিছু কিছু বাবুরও শ্রদ্ধা অর্জন করতে সে সমর্থ হয়। নিজে গরীব ছিলো। তাই গরীবের জ্বালা সে বোঝে। তার চিকিৎসায় শুধু শরীর নয়, মনেরও খুব বড় একটা স্থান আছে। কান দিয়ে সে কুলিদের রোগের বিবরণ শোনে, চোখ দিয়ে দেখে, প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করে—শুধু ওষুধ দিয়ে নয়। সেই জন্যই কুলিদের দৃষ্টিতে জেগেছে সম্ভ্রম, মনে শ্রদ্ধা, হৃদয়ে প্রীতি। এতদিনে বাগানে একটা লোকের মত লোক এসেছে, যাকে তারা কিছুটা আপনার মনে করে, পুরোপুরি না হলেও। পথের পাশের কলে স্নানরতা—বেআবরু মেয়ারাও আর তেমন চপল্ ভঙ্গী করে না ওকে দেখে। বরং সংযত হয় বেশভূষায়, কথায় বার্তায়।

কুলিদের অপরিসীম দারিদ্র্য ও নিরাভরণ জীবন ওর মনকে স্পর্শ করে। কী বীভৎস জীবনযাত্রা ওদের। বারো হাত লম্বা, ছয় হাত চওড়া জানালাহীন অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে ওদের সংসার। চির উন্মুক্ত একটা খোলা দরজা দিয়েই জ্যামিতিক কোণএর মত হয়ে ঢুকতে হয়। ওইখানেই ওদের জন্ম, মৃত্যু—জীবনের আদ্যোপান্ত;—স্বপ্নময় বাল্য কৈশোর অতিবাহিত হয়, স্ফুরিত হয় যৌবন, যৌবনের

আলো আলেয়া-রূপ ধ'রে ওদের মৃত্যুরূপী জলাভূমির দিকে নিয়ে চলে—অন্ধ ক'রে, বিভ্রান্ত করে, বস্তীর কারাগার থেকে মুক্তির মরীচিকা জাগিয়ে।

প্রায়ই বস্তীতে যেতে হয় ডাক্তারকে। সেখানে গিয়ে শুধু ওদের রোগই দেখে না সে। ওদের সামাজিক রীতি, নীতি, অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্টের বিবরণও সে মন দিয়ে শোনে। গভীরভাবে ভেবে জটিল রোগের চিকিৎসা করে। এদের ব্যয়রাম প্রধানতঃ,—ম্যালেরিয়া, হুক্‌ওয়ার্ম, টেপ্‌ওয়ার্ম—শীতকালে নিমুনিয়া প্রায় স্যাঁৎসেঁতে মেজে আর শীতবস্ত্রের অভাবের জন্যে। পুষ্টির অভাব হচ্ছে রোগের ভিত্তি।

ওরা কি খায়, পেট ভরে খায় কিনা? এর কোন সদুত্তর ডাক্তার আজ পর্যন্ত পায় নি। ডাক্তারের ঘরের আসে পাশে, অকারণে কারণে, কত কুলি-বালক আনাগোনা করে। খেলাধূলা করে। মাঝে মাঝে ডাক্তারের দিকে চায়। ওরা জানে যে ডাক্তার মাঝে মাঝে খাবার দেয়। চোখগুলো ওদের প্রায় অনেকেরই হলুদ।

ওদেরকে কতদিন জিজ্ঞেস করেছে ডাক্তার—তোরা সারাদিনে কবার খাস্‌রে?

উদাসীন ভাবে কেউ বলেছে, এক দফে—কেউ ব'লেছে, দু' দফে। কেউ বা বলে—সকালে একবার চাসেদ্ধ, দুপুরে ভুঙ্গা (মুড়ি জাতীয়) চা—বিকেলে চা, রাত্রে শুধু ভাত আর শাক্। মুর্গী যেদিন আনলো সেদিন উৎসব। এমন ভাবে উত্তর দেয় ওরা যেন খাওয়াটা ওদের জীবনের বিশেষ সমস্যা কিছু নয়। ক্রীড়ারত বালকদের হল্‌দে চোখের দিকে চেয়ে ডাক্তার ভাবে, কতদিন ওরা ক্ষুধার্ত কে জানে! খাবার কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না আর।

বস্তী থেকে কোনদিন রাত দুপুরে ফেরে। নীরব, কালো শিরীষ গাছগুলোর ঘুমন্ত নিঃশ্বাস শোনা যায়। দিগন্তের গায় হিমালয়ের

অস্পষ্ট ছায়া। থেকে থেকে ঘুমভাঙ্গা পাখীর ডাক ওঠে চোক্ চোক্ ওর্র্র্র্র্। কেমন এক রোমাঞ্চক অনুভূতি পেয়ে বসে ডাক্তারকে। তার রক্তে যে দুঃসাহসী জীবনের জীবাণু সুপ্ত ছিলো আজ এই নিশুতি রাতের শীতল স্পর্শে ব্যাঘ্রভীত সম্বরের কু-উ শব্দে, ভীত হরিণের বিকট চীৎকারে, নিদ্‌হরা পাখীর অট্টহাসিতে, রাতের কালো দীর্ঘঃশ্বাসে তারা যেন জেগে উঠে ধীরে ধীরে।

এরই মধ্যে সে বার কয়েক হিমালয়ে ঘুরে এসেছে—ঘুরে এসেছে বনে-জঙ্গলে, প্রস্তরচুম্বিত রঙীন্ ঝরনার ধারে। আসবেই বা না কেন। মাত্র আট পয়সার রেলটিকিট তো।

অতরাত্রেও বাগানের বাতাসে চায়ের নিবিড় গন্ধ মেশে। বস্তীর নৃশংস জীবন, রাত্রির রহস্যাবৃত রূপ। ফ্যাক্টরীর একঘেয়ে জীবন তার মনের মধ্যে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করে যে সে ঘরে ফিরে এসেই তার কল্পিত বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে বসে যায়——প্রিয়—, এখানে চায়ের সমুদ্রের মধ্যে আছি। বাতাসে অফুরান্ চায়ের গন্ধ। তোমরা হলে রসগোল্লার রসে পড়া বোল্‌তার মত সেই সমুদ্রে অহর্নিশি ডুবে থাকতে হয়তো। কিন্তু আমার পক্ষে গন্ধটাই শুধু লাভ। পানীয়টা মনে হয় মায়াময় মরীচিকা। কাছে থেকেও যেন কতদূরে—কায়া হয়েও যেন ছায়া। এই ছায়ার মায়ায় কত লোক এখানে এসেছে, কত জাতির তারা—আর্য-অনার্য, মোঙ্গোল অষ্ট্রিক্। বিভিন্ন জাতির, রক্তের, বর্ণের, রুচির, বৈশিষ্ট্যের মহামিলন হ'য়েছে। এখানকার রহস্যময়ী রাত্রির অন্ধকারেও তাদের যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি, কাতারে কাতারে।

কিন্তু বিশুদ্ধ অনার্যদের ভাগ্যে আজও সেই ক্ষুধিত প্রাগৈতিহাসিক জীবনের অভিশপ্ত তিলক অঙ্কিত। দু'হাত চওড়া একখানা জীর্ণ খোয়াড়ে তাদের দুঃস্বপ্নময় বাল্য-কৈশোর কাটে। যৌবনের স্বপ্নাহিত

দিনগুলি লোহার শেকলের ঘায়ে ঘায়ে চূর্ণ হয়ে যায়। বার্ধক্যের মৃত শ্বেত অস্থি-পঞ্জর মাত্র সাড়ে তিন হাত মাটির দাবী নিয়ে চির আঁধারের দেশে স্তব্ধ হয়ে থাকে। যীশুর পবিত্র শিশু হ'লে হয়তো তার মৃত শিয়রে বড় জোর দুখানা সস্তা কাঠের ক্রস্ তার ক্ষুধিত আভিজাত্য রক্ষা করে। ক্রস্ বন্দী হ'য়ে সে হয়তো তখনও স্বপ্ন দেখে—সে মন্ত্রী হ'য়েছে, রাজা হ'য়েছে।······এইতো এরা।

যাক্ এখানে চায়ের বাগানে ঘুরে বেড়াই। চারিদিকে ঘন সবুজের মেলা। দূরে সীমান্তের গায়ে, এই নিঝুম রাত্রির ছায়ায় বসেও হিমালয়ের অতি অস্পষ্ট ধূসর রেখা দেখতে পাচ্ছি। সেদিন ওই রহস্যময়ী হিমালয়ের বনে জঙ্গলে ঘুরে এলাম। জীবন সংগ্রামে যখন হাঁপিয়ে উঠি মাঝে মাঝে তখন ওই রহস্যময়ী নায়িকার ঘোমটা দেওয়া নীলিম রহস্য উদঘাটিত করে মনে অসীম প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসি। ওই তারাভরা আকাশের রহস্যের মত তুমিও রহস্যময়। আমার নিবিড় অনুভূতির অংশ তুমি নাও।

দরজায় কার ছায়া পড়ে। চমকে উঠে ডাক্তার চেয়ে দেখে বনানী। বলে, তুমি! বনানী! ঘুমোও নি?

—না ঘুম আসছে না—ব'লেই সে যেমন এসেছিলো তেমনি চলে যায়। যেন রহস্যাবৃত রাত্রি। ডাক্তার অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। একটু ই উপর থেকে সেতারের মৃদু ওয়াল্ ক্লকে ঢং ঢং ক'রে আটটা বাজে। অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে চায়। ঠোঁটে মৃদু হাসি। বারোটার সময় বেজেছে আটটা। ঘরিটা যেন চা বাগানের প্রতিচ্ছবি। পিছিয়ে চলে। বর্তমানের সাথে তাল রাখতে পারে না।

বাইরে পীচের মত কাল রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করে। দরজাটা হঠাৎ ঘট্ ঘট্ করে ন'ড়ে ওঠে। ডাক্তারের চোখে আবার বিস্মিত চাহনি।

বনানী কি ? ক্রমেই জোরে জোরে নড়ে দরজা। ডাক দিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। রাত্রির নীরব রহস্য যেন।

চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ে ডাক্তার। একবার এ বাগানের বিচিত্র সব গল্পের কথা মনে হয়—বাঘ, গণ্ডার, হাতী। ঝট্ করে ছিট্‌কানাটা খুলে দরজা ধাক্কা দেয়। সাঁ ক'রে একটা ছায়া সরে যায়। ডাক্তার চমকে ওঠে। কে ? ভূতের ভয় ছিলো ডাক্তারের—ঠাকুরমার আশীর্বাদে, যুক্তিতে নয়।

একটু সরে গিয়ে টর্চ ফোকাস করতেই দেখে পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে শীর্ণ কালো উলঙ্গ একটি ছোট্ট মেয়ে। মাথায় তার ঝাঁকড়া কোঁকড়া পিঙ্গল চুল। উঁচু পেটটায় ডান হাত রেখে আর বা হাত দিয়ে তার কটা চুলের একটা স্তবক ধরে দাঁড়িয়ে আছে সঙ্কুচিত ভাবে। চোখে ভীত ত্রস্ত দৃষ্টি। যেন প্রেতিনী-শিশু।

একটুখানি থমকে থেকে মেয়েটি তর্‌তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেলো। ডাক্তার হতভম্ব হ'য়ে থাকে। এলিজাবেথের সাথে এই প্রথম পরিচয়। বস্তীর দিক থেকে মাদলের শব্দ আস্‌ছে ধুতুম্ তুম্ ধিতাং তাং।

পরদিন বনানীকে জিজ্ঞেস করলো। বনানী হেসে বললো—ও এলিজাবেথ বুঝি আবির্ভূতা হয়েছিলেন আপনার ওখানে! ভয় পান্ নি তো ? রাত্রিবেলায় ভয় পাবার মতই চেহারা কিন্তু। মেয়েটার ভারি কষ্ট।—বনানীর চোখের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। বলে, মেয়েটির বাপ মা কেউই নেই। দু'ভাই আছে। বড়টা নয় বছরের, সেই ওর গার্জেন। রাঁধতে পারে না তো ওরা। তাই যার তার কাছে চেয়ে খেয়ে বেড়ায়। কাঁচা চাল পর্যন্ত দিব্বি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে। মা ওকে খুব ভালবাসেন কিনা। খেতে দেন। জামা টামাও দেন। কিন্তু এমন বদ কুলি

ছোঁড়াগুলো যে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। আজ দিলেন, কালই হয়তো দেখবেন ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাত দুপুরেও ওই এতটুকু মেয়ে বাগানের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ায়! ওরা আবার খৃষ্টান। তাই নাম রেখেছে এলিজাবেথ। এলিজাবেথ নাম রাখা ওর ঠিক হয় নি। মেরী নাম রাখাই উচিত ছিলো। মেরী মানে কি জানেন? মেরী মানে চিরদুঃখী। আর এলিজাবেথ মানে হ'চ্ছে দেবরাণী। দেবরাণীর মতই চেহারা!—বনানী হেসে কুটিপাটি হয়। ডাক্তার হেসে বলে, সম্রাট জর্জ কিন্তু তার স্বধর্মীয়া মেয়েটিকে দেখলে মানহানির মামলা করতেন।

দেবরাণী পরদিন সকালেই আবার হাজির। আজ আর তেমন রহস্যময়তা নেই ওকে ঘিরে। সামান্য একটা ক্ষুধিতা কুলির মেয়ে। কেমন মায়া হ'লো ডাক্তারের। কষ্ট করে আর ভিক্ষে করে না পড়লে তারও তো আজ ওই অবস্থা হতে পারতো। সুটকেস থেকে দুখানা বিস্কুট নিয়ে ওকে দেয়।

ডাক্তার এরপর থেকে এলিজাবেথের একজন বাঁধা মক্কেল হ'য়ে উঠলো। কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেলো, ওই ছায়াময় যাযাবরটির জীবনেও রুটিন্ আছে। খাবার দেবার কয়েকজন নিয়মিত মক্কেল আছে ওর। সকালে উঠেই ও প্রথমে ডাক্তারের দরজায় হানা দেয়। এমন হ'য়ে গেছে যে ডাক্তার চেয়ারে বসে অন্যদিকে তাকিয়েও বুঝতে পারে যে রাণী এলিজাবেথ এসেছেন। প্রথমে দরজায় ওর ছায়া পড়ে। ক্রমে কায়াটা দরজার ওপারে এসে দাঁড়ায়। তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে। সকরুণ দৃষ্টি। খাবার টাবার যেদিন থাকে দেরী না ক'রে দিয়ে দেয়। কিছুই না থাকলে ডাক্তারের দৃষ্টি কপট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সেটা বোঝে না ও। খস্ করে একটু শব্দ হয়। ডাক্তার বাঁকা চোখে চেয়ে দেখে এক

ধাপ এগিয়েছে ও। ক্রমে পর পর খস্ খস্ শব্দ ওঠে। ডাক্তার যেন কিছুই জানে না। হঠাৎ দেখা যায় কোন্ সময়ে নিঃশব্দে সে চেয়ারের বাঁ ধারের হাতলের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে এসে। শেষে একেবারে হাতলের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে তাকে না বুঝবার আর কোন উপায়ই রাখে না। এমন করুণ দৃষ্টি মেয়েটার যেন সৃষ্টির ভাণ্ডার থেকে সবটুকু করুণতা উজাড় করে এনেছে ওর ফ্যাকাসে চোখ দুটো। হতভাগা! কেমন মায়া হয় তার। ভাবে, ওর নিজের যদি বোন থাকতো আর সে এমনিভাবে যদি পথে পথে ভিখ্ মেগে খেয়ে বেড়াতো! এত ভেবেও নিরাশ কর'তে হ'তো মাঝে মাঝে। প্রথম প্রথম সে কিছুতেই যেতে চাইতো না। ক্রমে একটু বুদ্ধি খুলেছে ওর। হাত নাড়লেই ও বোঝে, আর তক্ষণি টুক্ টুক্ করে বেরিয়ে যায়—পাছে দ্বিতীয় মক্কেলও হাতছাড়া হ'য়ে যায়। ওর পরিচয় পাবার পর থেকে পরিচয় নেবার কেমন নেশা হয়ে গেছে ডাক্তারের। ও যেন চা-বাগানের ক্ষুধিত আত্মা। সারা কারখানা অঞ্চল ও ঘুর ঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়। অবসর পেলেই ওকে পর্যবেক্ষণ করা দাঁড়িয়ে গেলো তার কাজ। শেষে এমন দাঁড়িয়ে গেলো যে কারখানা অঞ্চলে থাকলে ও কোথায়, কখন কেমন ভাবে আছে এক নিমেষেই তা বলে দিতে পারতো। দূর দিয়ে ও যখন হেঁটে যেতো বিমান বিধ্বংসী কামানের মত পেটটা উচিয়ে, মনে হতো যেন একটা Semicircle কে বুকে নিয়ে একটা Straight line চলেছে।

চীনা বাদামওয়ালার বড় ডালাটার ধারে একজন বিনা পয়সার খরিদ্দার সব সময়েই মোতায়েন্ আছে। সে এলিজাবেথ। সেটা অবশ্য বিকেলের দিকে। ওর শীর্ণ চেহারা আর অপরিসীম ধৈর্যই হচ্ছে ওর জিনিষের দাম। অনিমেষ চোখে ডালার চীনা বাদামগুলোর দিকে চেয়ে ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যার দিকে যখন

পাতি তোলা-মজুরদের শেষ জনও চলে যায় যার যার বস্তীতে, সেই সময়ে বাদামওয়ালা ওকে কয়েকটা বাদাম দেয়। ওই বাদাম কয়েকটার লোভেই ও পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গোধূলির মুহূর্তটি সেজন্যে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ লগ্ন। তখন ওকে আটকাবার সাধ্য কারও নেই। যেখানেই থাক্ ছুটবে টুক্ টুক্ ক'রে।

ভিখারীরও আবার আভিজাত্য আছে। পোষাকে ওর আভিজাত্য হচ্ছে একখানা অতি-মলিন্ কাল্‌চেমারা ন্যাকড়া—কাঁধের ওপর ফেলা থাকে প্রফেসারের ষ্টাইলে। খাবারের আভিজাত্য তার বাদবিচারে। ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে প্রবাদবাক্যকে ও অস্বীকার করেছে। মাংস ও কিছুতেই খাবে না। একদিন ওর দ্বিতীয় মক্কেল্ ফিটারবাবুর বাসায় মাংস হ'য়েছিলো। কলার পাতায় ক'রে ভাত-তরকারীর সাথে মাংস বেড়ে দিয়েছিলো ঠাকুর। ডাক্তার তার গোপন-মানমন্দিরে ব'সে মর্ত্ত্যের বিস্ময়কর ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। হঠাৎ দেখা গেলো, ও বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে মাংসগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলো নিমেষে। ডাল ভাতেই ও মহা খুসী। পাতভরা আসেদ্ধ মোটা চালের ভাত—আর ভাতভরা খ্যাসারীর ডাল, তা হ'লেই ও স্বর্গসুখ পায়—ওটাই হ'লো ওর ভোরের সর্বপ্রিয় সুখস্বপ্ন। লাখ টাকার স্বপ্ন সে দেখে না। বিছানায় থাকতেই ও বোধহয় ভগবানকে ডেকে বলে—ভগবান্ আজ যেন দুটো ডাল-ভাত পাই।

আর একটি বিচিত্র চরিত্র আবিষ্কার ক'রেছে ডাক্তার। সে হচ্ছে লোক্‌নাথন্। ইন্‌স্‌পেক্‌সান্ বাংলোয় বাইরের কোন ভদ্রলোক এলে বিনা খরচায় কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা আছে। লোক্‌নাথনের কাজ হচ্ছে তাদের জন্যে রান্নাবাড়া করা। সাহেব-টায়েব এলে লোক্‌নাথনের কদর বেড়ে যায়। বহুদিন সে কোন্ সাহেবের বাবুর্চি ছিলো। সাহেবী খানা চমৎকার বানাতে শিখেছে সেইখানে। পাই, রোষ্ট,

পুডিং সবই সে বানাতে পারে। ইন্‌স্‌পেক্‌সান্‌ বাংলোর অন্যান্য চাকর-বাকরেরা তাই লোকনাথন্‌কে বেশ সমীহ ক'রে চলে। ওদের মধ্যে কার্লুস নামে একটি ছেলেকে শুধু সে চমৎকার রান্নার গূঢ় রহস্য শিখিয়ে যাবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে। ছেলেটি লোকনাথন্‌-এর কথাবার্তা খুব শোনে এবং অতবড় আশ্বাস্‌ পাবার পর আরও বেশী শোনে। প্রায় সময়ই লোকনাথন্‌-এর পাছ পাছ ঘোরে। কিন্তু লোকনাথন্‌-এর আশ্বাস শুধুই আশ্বাস রয়ে গেছে। তার সবচেয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে, তাকে এ বাগানের কেউ চিনলো না। কেতাদুরস্ত ফর্সা প'রে, মাথায় ব্যাজ আঁটা পাগড়ী বেঁধে মাজায় বেল্ট এঁটে সে যখন নবাগত সাহেবের দিকে চেয়ে তৎপরতার সাথে সেলাম দিয়ে দাঁড়ায়, তখন আসে-পাশে চেয়েও উৎসাহের কিছুই দেখতে পায় না।

লোকনাথনের বাড়ী মাদ্রাজ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সে যুদ্ধে গিয়েছিলো। ফরাসী দেশ, তুরুক্‌ দেশ-এর রোমাঞ্চকর গল্প সব আজও সে চাকর-বাকরদের আখড়ায় বলে তার পসার জমিয়ে রাখে।

দশ বছর বয়সে খৃষ্টান্‌ হ'য়েছিলো লোকনাথন্‌। মা-বাপের কথা জিজ্ঞেস ক'রলে বলে, বাপ তো এতটুকুতেই মারা গেছে! মা ভক্তি করতে মারা গিয়েছে। সে বুঝিয়ে বলে, মা পুজো-আর্চা প্রভৃতি ক'রতে ক'রতেই মারা যায়। শরীরের যত্ন নিলো না।

মা-বাপকে হারিয়েই ও খৃষ্টান্‌ হ'য়েছে। কুড়ি বছর বয়সে ও বিয়ে ক'রেছে। সেই খৃষ্টান্‌ বৌ এখনও আছে। কিন্তু ওর হাতে লোকনাথন্‌ আর খায় না। ও নাকি ছোট জাত—খিরিষ্টন্‌। লোক-নাথনের আর একবার বিয়ে করার উগ্র সখ হওয়ায় খৃষ্টান ধর্ম বদলিয়ে হিন্দু হ'য়েছে। ওর একটা মেয়ে আছে এবং সে ওর সাথেই থাকে। ওর রান্নাবাড়ি সে-ই করে, যদিও বয়েস তার মাত্র আট। কিন্তু ওকে

বিয়ে করার মত মেয়ে পাওয়া যায় না। এই সুযোগ নিয়ে বাগানের দু'একজন ফাজিল ছোকরাবাবু বেশ কাজ গুছিয়ে নেয়, ওকে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে।

হাটে বিভিন্ন বস্তী এবং গ্রামের মেয়েরা মেলে। সেই বাবুরা ওকে সাথে ক'রে নিয়ে যান্—বলেন, দেখো তো লোকনাথন্ কোন্ মেয়েটাকে তোমার পছন্দ ?

লোকনাথনের পছন্দ ওই যে আবলুসের মত কালো মেয়েটা মুড়ি বেচে ব'সে তাকে। কানে তার টক্‌টকে লাল পিপার পাতা, গলায় টোস্, হাতে রুপোর মোটা বেড়্যা, বাহুতে বাহিকল,—হাসে চটুল, কথা বলে সুরেলা ছন্দে। গয়নার জন্যে পছন্দ—না রূপের জন্যে—বলা কঠিন।

স্যুট্-হ্যাট প'রে লোকনাথন্ যেতো হাটে। দরকার না থাকলেও ওরই কাছ থেকে মুড়ি কিন্‌তো। হেসে কথা বলতে চেষ্টা ক'রতো। কিন্তু ওইটুকুই। ওর বেশী আর এগোতে পারে নি।

লোকনাথন্ রাতকানা হ'য়েছে ব'লে কিছুদিন থেকে ডাক্তারের কাছে সময়ে অসময়ে আসে। অনুনয় ক'রে বলে—রাত হ'লেই যে দেখতে পাইনে ডাক্তারবাবু। কি যে করি। রাত্তিরের রান্না খারাপ হ'য়ে যায়—বাবুরা বকাবকি করে। দেন ডাক্তারবাবু দু'ফোঁটা ভালো ওষুধ।

রাত্রের দিকেই সে প্রায় আসে কালু্সকে সাথে ক'রে—আর, হাতে একটা লাঠি নিয়ে। এই সময় কাজ থাকে না প্রায়ই ডাক্তারের। প্রাণ খুলে গল্প করার কোন বাধা থাকে না। ডাক্তারের ওপর লোক-নাথন্-এর বিশেষ একটা আনুগত্য আছে। তার মূল রহস্য হচ্ছে—লোকনাথনের অস্বীকৃত প্রতিভা প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছে ডাক্তারের কাছে।

এক একদিন আক্ষেপ ক'রে বলে লোকনাথন্—হিন্দু হ'য়ে কি হ'লো আমার? বিয়ে তো হ'লো না। লোকনাথন্-এর কথা বলার বিশেষ এক ভঙ্গী আছে। একটা কথা ব'লেই সে হঠাৎ থেমে গিয়ে তার ঠোঁট দুটোকে ফাঁক ক'রে, চোখ দুটোকে হাসিমাখানো কুৎকুতে ক'রে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শ্রোতার দিকে। শ্রোতার দম বন্ধ না হ'য়ে আসা পর্যন্ত আর তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তার কথা বলার সময় কিশোর কার্ল্‌স সপ্রশংস দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। লোকনাথনের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তার ভয়ানক আস্থা। লোকনাথন্ যুদ্ধে গিয়েছিলো। সে খাসিয়া পাহাড়ে সাহেবের বাবুর্চি ছিলো। ইংরেজী, ফরাসী, তামিল, বাংলা ভাষায় দুর্বোধ্য সব কথা বলে। সে গভীর জঙ্গলে শীকার ক'রে বেড়িয়েছে সাহেবের সাথে—এ কি যে সে কথা! তার কাছে যেন তাদের ছোটনাগপুরে শোনা রূপকথার মত।

সেদিন লোকনাথন্ এসে বললো—এ বাগান তো ছেড়ে চ'ললাম ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে—কেন?

আর কতদিন এখানে থাকবো! ষোলোটা বছর এখানে কাটিয়ে দিলাম—ভালো লাগছে না আর। এইবার খাসিয়া পাহাড়ে চললাম আবার। সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে। লিখেছে সৈন্যদের বাবুর্চিগিরি ক'রতে হবে। মায়না পঁয়ষট্টি টাকা। এখানে কি জন্যে থাকবো বলুন্? লোকনাথন্‌কে কি কেউ চিন্‌তে পেরেছে? এক, আপনিই ডাক্তারবাবু আমাকে যা একটু আধটু—

—কেন, এখানে কি কেউ তোমার ওপর অন্যায় ক'রেছে?

—না বাবু, তা ব'লতে যাবো কেন আমি। যা হ'য়েছে তা হ'য়েছে, তাই ব'লে আমি ব'লতে যাবো কেন। আমি এমনিই

যাচ্ছি। ফিস্ ফিস্ ক'রে সে বলে, এই দেখুন, এখানে ষোলো বচ্ছর কাজ ক'রেছি—মাইনা মাত্র কুড়ি টাকা। আর, তিনটে টাকা দেয় এ্যালান্স্ ব'লে। এই টাকায় কী প্রাণ বাঁচে—বলুন?

সহানুভূতি জানিয়ে ডাক্তার বলে—দেশ স্বাধীন হ'লে তোমার কদর বুঝবে লোকে—বুঝেছো লোক্‌নাথন্?

—সেই আশীর্বাদই করুন ডাক্তার বাবু। তাই যেন হয় একদিন।

ইন্‌স্‌পেক্‌সান্ বাংলোর নীচের কুঠরীতে ক্লাবঘর। সেখানে বাবুরা ব'সে তাস খেলেন রাত্রে। একটা ছোট-খাট লাইব্রেরীও আছে। সেই লাইব্রেরী থেকে চীৎকার ক'রে কে ডাকলো—কালুর্স্, এই হারামজাদা কালুর্স!

লোকনাথন্ পাশ থেকে কালুর্স্‌কে ঠেলে দিয়ে ব'ললো, যা—তুই যা। চা চাচ্ছে বোধহয় বাবুরা। (ক্লাবের সভ্যদের জন্যে বিনা পয়সায় চায়ের ব্যবস্থা আছে।) দেখেন তো ডাকের ছিরি! এই জন্যেই তো থাকতে চাই না আর বাগানে। এখানে গরীবদের কথা কেউ বুঝে না—এক আপনিই শুধু ডাক্তারবাবু—বস্তীতে আপনার কি নাম—হ্যাঁ ভারী নাম—

ডাক্তার বাধা দিতে গেলে লোকনাথন্ হাত উঁচু ক'রে বলে—আহাহা হাহা—বাধা দেন কেন ডাক্তারবাবু। কট্‌মটে চোখ দুটো রহস্যে ভ'রে বলে—বুঝেছি ডাক্তারবাবু, নিজের প্রশংসা আপনি শুনতে চান্ না। লোকনাথনের মুখ দিয়ে হাঁড়িয়ার গন্ধ বের হয়।

ডাক্তার নাকটাকে কুঞ্চিত ক'রে সুট্‌কেস্ থেকে একটা কলা বের ক'রে নিয়ে এসে লোকনাথন্-এর হাতে দেয়। বলে—খেয়ে ফেলো। অন্যান্য ওষুধ ব্যর্থ হ'লে ডাক্তার তার মায়ের শেখানো একটা টোট্‌কা

ওষুধ প্রয়োগ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে ওর ওপর। ওষুধটা হচ্ছে—কলার মধ্যে জোনাকী। লোকনাথন্ তা জানে না।

সে হেসে বলে—আমি চোখের ওষুধ চাচ্ছি আর ডাক্তারবাবু কলা খেতে দিচ্ছেন—বারে বা! লোকনাথন্-এর মুখ দিয়ে এবার ভক্ ভক্ ক'রে গন্ধ বের হচ্ছে। কিন্তু সে ততটা অপ্রকৃতিস্থ হয়নি। খাওয়ার ফার্ষ্ট ওয়ার্নিং পড়লো। বাগানের বৈদ্যুতিক আলো যেন চোখ টিপে জানিয়ে দিলো খাওয়ার সময় হয়েছে।

লোকনাথন্ সসব্যস্তে ব'লে উঠলো—যাই, বাবুদের খাবার সময় হয়েছে। দেরী করলে আবার বাতি নিভে যাবে!

চমৎকার সোনা-মাখানো রোদ উঠেছে সকালেই। শরতের আজ পুর্ণ অভিব্যক্তি। তার হাসিতে যেন সোনা ঝরছে—চাহনীতে ঝ'রেছে মুক্তো। বাগানের সবুজ পটভূমিকায় কারখানার লাল রং খুলেছে আজ অপুর্ব। ডাক্তারের বিছনায় এক থোকা রাঙা গোলাপ পড়ে আছে। এমনিভাবে প্রায়ই পড়ে থাকে। কোনদিন বালিসের নীচে, কোনদিন টেবিলের ফুলদানিতে—কোনদিন বা বিছানায়। কে রেখে যায় জানা যায় না।

বাপের সঙ্গে গলাগলি হ'য়ে বনানী ঢুকলো। খুসীভরে ব'ললো—কি চমৎকার আজকের সকাল—না কাকু?

কাকু মাথা ঝুঁকায়। ম্যানেজার বাবু হেসে বলেন—ওইসব চমৎকার দেখাতেই শুধু তোর মন। পড়াশুনায় যদি এতটুকু মন থাকতো!

—না, বাবা, please—আজকের সকালটা আর পড়বো না। কতদিন পরে এমন সকাল হ'য়েছে। বিষ্টি, বিষ্টি, খালি বিষ্টিতে একেবারে পচে গেছি যেন। এতও বিষ্টি হ'তে পারে এখানে!

ম্যানেজার বাবু গম্ভীরভাবে বলেন—তোরা ওই ভাবিস্, আর আমি ভাবি কি জানিস্? শোনো কনক, আমার জীবনের ব্রত কি জানো?

—কি?—ম্যানেজার ঢোকার সাথে সাথেই ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে।

মেয়ের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ম্যানেজার বাবু পায়চারী ক'রতে ক'রতে বললেন, ভগবানের কাছে আমি জীবনের এই ব্রত উদ্‌যাপনেরই বল্ প্রার্থনা করেছি শুধু—ভগবান্, আমি যেন আমার ছেলে মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যেতে পারি। মূর্খ ছেলেমেয়ের হাতে রাজ-ঐশ্বর্য দিয়ে আমি সুখী হ'তে চাইনে।

—চমৎকার কথা! ডাক্তারের ঠোঁটে প্রশংসার উজ্জ্বল দীপ্তি খেলে যায়।

উৎসাহিতভাবে ম্যানেজার বাবু বলেন—দেখো, নিজের ব্রত উদ্‌যাপনের কি মূল্য দিতে হচ্ছে আমাকে। ছোট ছেলেটা দার্জিলিংএ সেণ্ট পল্স্ স্কুলে পড়ে জানো বোধ হয়। বয়েস তার সবে সাত। তার পেছনে কত খরচ হয় জানো?

—কত?

—দেড়শো টাকা। ভাবো একবার। কিন্তু ওই ছেলেটির জন্যে আমার বড় ভাবনা। অত খরচ ক'রে পড়াচ্ছি শেষে কি যে হবে। ওখানে তো ইংরেজীতেই সব শেখানো হয়। এখানে যখন আসে তখন দিব্বি ইংরেজীতেই সব কথাবার্তা। বাংলা একরকম ভুলেই যায়। আবার চার মাসে—ওদের আবার শীতের বন্ধ চার মাস—ইংরেজী একদম ভুলে যায় তখন। কি যে করি ওকে নিয়ে। ঝোঁকে প'ড়ে ওকে দিলাম—শেষে ও না হবে বাঙালী—না হবে সাহেব। এই নভেম্বরে ও আসবে দেখো।

আশঙ্কার স্বরে হঠাৎ বনানী ব'লে ওঠে—জানেন কাকু, কয়েক মাস আগে ওর সাহেব বন্ধুদের সাথে পাহাড়ে চড়তে প'ড়ে গিয়ে সে

কি কাণ্ড! পড়ে গিয়েই ফিট্ হ'য়ে যায়। কয়েকদিন ধ'রে ফিট্ হ'য়েই থাকে। জানেন? টেলিগ্রাফ পেয়ে মা'র ফিট্, বাবার তো ব্লাড্প্রেসার বেড়েই গেলো।

—আর, তুই? তোর কি হয়েছিলো বলবো?—ওর পিঠে হাত দিয়ে সস্নেহ-হাসিতে ম্যানেজার বাবু বললেন বনানীর মুখের দিকে ঝুঁকে।

—ইস্, বলো না—ভারী তো!

—থাক্, আর নাই বললাম তোর সামনে। ডাক্তারের দিকে ফিরে ম্যানেজার আবার বলেন—তবে এই ছাখো, দেড়শোটি টাকা ফাঁকা শূন্যের পেছনে ব্যয় ক'রছি। তাছাড়া গ্লাস্‌গোতে এক ছেলেকে পাঠিয়েছি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে এক সাহেব বন্ধুর পরামর্শে। সেখানে তিনশোটি টাকা পাঠাতে হয়। যুদ্ধের মোড় বদলেছে বটে। কিন্তু তার জন্যেও কি কম চিন্তা। সেই গাওয়ার ষ্ট্রীটে ভারতীয় ছাত্রাবাসে যেদিন জার্মান্ বম্বারের বোমা ফেলে আসার খবর বেরলো—উঃ, সেদিনটা আমার কাছে কি! কত দুর্ভাবনা—যদি সে ওই ছাত্রাবাসে গিয়ে থাকে! সেদিন আমার ব্লাডপ্রেসার সবচেয়ে উঁচুতে। আর এক বছর আছে তার আসার। এ ছাড়াও দু'ছেলে কুচবিহারে পড়ে, এই মা-ও এতদিন প'ড়েছে। এই মা-কে নিয়েই আমার সবচেয়ে দুর্ভাবনা। ওর ওপরই আমি বোধহয় সবচেয়ে অবিচার ক'রছি। কি যে দুষ্টগ্রহ ওর পেছনে লাগলো! শিক্ষকদের ওপর আমার আগে শ্রদ্ধা ছিলো—কিন্তু ওদের কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যাল্ আমার সব ধারণা চুরমার ক'রে দিয়েছে।

কুতূহলী দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চায় ডাক্তার।

—শুনবে? শোন কি রকম ঘৃণ্য মন হ'তে পারে একজন শিক্ষিতা মেয়ের। ওকে স্নেহ ক'রতেন ওদেরই কলেজের একজন প্রফেসার।

আমি ওর জন্মদাতা বটে—কিন্তু, তিনি ওর নবজন্মদাতা। নানা রকম বই পড়িয়ে, উপদেশ দিয়ে ওর জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়ে চমৎকার ক'রে ওর মন ও বুদ্ধিবৃত্তি গ'ড়ে তুলেছিলেন। তিনি আবার একজন নামজাদা zoologist (প্রাণীতত্ত্ববিদ্)—আসতে চেয়েছেন একবার এইদিকে হিমালয়ের বনে পাখীর রীতি-নীতি, হাব-ভাব study করবার জন্যে। এখনও চিঠি লেখেন ওকে। কলেজ-লাইব্রেরী থেকে বেছে বেছে ভালো বই ওকে পড়িয়েছেন। মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আন্তরিক চেষ্টা ছিলো তাঁর ওকে মানুষ করায়। ওঁকে শ্রদ্ধাও ক'রতো ও সেই পরিমাণে। লেডী প্রিন্সিপ্যালের তা সহ্য হলো না। দেখো কি নির্লজ্জ জেলাসী! ওঁর কাছ থেকে ওকে দূরে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। একই হোষ্টেলে থাকতেন এরা দু'জন। প্রফেসার ভদ্রলোকের অবশ্য বাসা ছিলো। সেখানে সপরিবারে থাকতেন তিনি। প্রিন্সিপ্যালের চেষ্টাই ছিলো কি ক'রে ওর বাইরের বই পড়া বন্ধ করা যায়। নানা ফন্দীফিকির ক'রতে লাগলেন। শেষে স্পষ্টই বললেন, পড়াশুনার ক্ষতি করে বাইরের আজেবাজে বই পড়া তোমার চলবে না। তোমার বাবা এখানে তোমাকে পড়তে পাঠিয়েছেন—মনে রেখো।

শনিবারে-শনিবারে ওঁর বাসায় গিয়ে ও নানা পড়া বুঝে আসে, লেডী তা জানতেন। হঠাৎ, এক শনিবারে তিনি বললেন, সিনেমা দেখতে যাবো আমরা—তুমিও চলো। মজা এই—তিনি ছাত্রদের সিনেমা দেখার বিরোধী ছিলেন, তাই প্রফেসারের সাথে কয়েকবার সিনেমায় যাওয়ায় ওকে ধমকেছেনও।

ওর আবার সেদিন ভয়ানক মাথা ধরেছে। মাঝে মাঝেই ধরে। ব'ললো—মাথা ধ'রেছে ভয়ানক।

উনি বললেন, মাথা ধ'রেছে তো—সিনেমা দেখলেই সেরে যাবে।

ও বললো—বদ্ধঘরে আরও বাড়বে স্যার। আমি যাবো না—আপনারা যান্।

উনি ভাবছিলেন, প্রফেসারের ওখানে যাবার মতলবেই মাথা ধরার ওজর তুলেছে। মুখ লাল ক'রে ব'ললেন, শুয়ে থাকো তবে ঘরের মধ্যে—বাইরে বেরিও না।

ও ব'ললো—এতো শুয়ে থাকার ব্যারাম নয়—বাইরে বাগানে হাওয়া খেলে বরং কমবে।

—না চলবে না ওসব—ব'লে তিনি রাগে গট্‌গট্ ক'রে বেরিয়ে গিয়ে তক্ষুণি ফিরে এসে ওর ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে রেখে চলে গেলেন।

এততেও তাঁর মন তৃপ্ত হয় নি। পরের দিন আবার এসে বললেন—অবাধ্যতার জন্যে তোমাকে সবার সামনে ক্ষমা চাইতে হবে।

ও অস্বীকার ক'রে ব'লেছিলো—না। ক্ষমা চাইতে পারবো না। আর, ক্ষমা চাইতে ব'লবেনও না। তাতে আপনারই অমর্যাদা হবে। কেননা, ক্ষমা কিছুতেই আমি চাইতে পারবো না। আমি তো অন্যায় করি নি কিছু!

শাসিয়ে তিনি বললেন ওকে—তোমার বাবাকে টেলিগ্রাফ ক'রে আনবো আমি। ও দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ ক'রে বলেছিলো—সেটা কিছুতেই করবেন না—আমার বাবার ব্লাড্-প্রেসার আছে। ক্ষতি হ'লে দায়ী হবেন।

আর একদিন কলেজের কোন্ বিশিষ্ট অতিথির সম্মানার্থ ওকে নাচতে ব'লেছিলেন। ও অস্বীকার করে।

ওর ওখানে একদিন গেলে প্রিন্সিপ্যালের সাথে আমার দেখা হ'য়ে যায়। আমার কাছে ওর বিরুদ্ধে কত নালিশ! আমি বলেছিলাম

—আমার মেয়ে কোন অন্যায় ক'রতে পারে না—আর, আপনি না ওদের প্রিন্সিপ্যাল্‌—শিক্ষক ?

বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত ওকে নাম কাটিয়ে আনতে হয়েছে। ঠাট্টা ক'রে বনানীর পিঠে দু'একটা চাপড় দিয়ে বললেন (বনানী তখন ডাক্তারের টেবিলের ওপরে ঝুঁকে লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে চমৎকার একখানি ছবি প্রায় সমাপ্ত ক'রেছে)—মেয়েমানুষের মানুষ হ'তে এখনও অনেক দেরী।

ডাক্তার হো হো শব্দে হেসে উঠলো। বনানী ভ্রূকুটি ক'রে তাকালো বাপের দিকে। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরিয়ে ম্যানেজার বাবু বললেন—তবে, হ্যাঁ, একজন মেয়েছেলেকে একবার ট্রেনে দেখেছিলাম—প্রকৃতই তিনি মানুষ, এমনকি অতি মানুষ !

ট্রেনে যাচ্ছিলাম ক'লকাতায়। মেয়েদের কম্পার্টমেণ্টে হঠাৎ এক ভদ্রলোক উঠে পড়েন অন্য কম্পার্টমেণ্টগুলোয় ভীড় দেখে। মেয়েরা সব হাঁ হাঁ ক'রে তেড়ে আসে। লোকটি কাতরভাবে বলেন, তাঁর কলেরা হ'য়েছে—একটু জায়গা না দিলে তিনি আর বাঁচবেন না। ঝর ঝর ক'রে তিনি কেঁদে ফেলেন।

একটি ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে বলেন—থাকুন, থাকুন। সারারাত ধ'রে তিনি লোকটির সেবা-শুশ্রূষা করেন। ভোরের দিকে অন্য কম্পার্টমেণ্ট থেকে মেয়েদের অভিভাবকরা খবরাখবর ক'রতে এসে ওই অবস্থা দেখে রুক্ষস্বরে ভদ্রলোকটিকে বলেন—আপনি ? মেয়েদের গাড়ীতে ?

মেয়েটি স্পষ্ট গলায় বলেন—হ্যাঁ, আমিই উঠতে দিয়েছি ওঁকে। ওঁর ওই বিপদে না উঠতে দিয়ে পারি নি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সারারাত ফার্ষ্ট ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাসে আরামে কাটিয়ে ভোরে উঠে ইণ্টার ক্লাসে স্ত্রী অথবা বোনদের খবর নিতে আসতে লজ্জা ক'রলো

না আপনাদের ? তাঁরা এতক্ষণ যদি কাটাতে পেরে থাকেন আর একঘণ্টাও কাটাতে পারবেন—আপনারা যান্।

ভদ্রলোকেরা মুখ কালো ক'রে গজর গজর ক'রতে ক'রতে ফিরে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমিও বিশেষ কোন কারণে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নামবার আগে অমন উচ্চমনা ভদ্রমহিলাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না।

ছবি আঁকা বন্ধ রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে বনানী গল্প শুনছিলো। এইবার সোৎসাহে ব'লে উঠলো—তবে যে মেয়েদের নিন্দে করছিলে ?

হেসে দু'তিন বার মাথা ঝাঁকি দিয়ে তার বাবা বললেন —মা আমার খুব খুসী। কিন্তু খুসী হ'লেই তো হবে না মা—মানুষ হবার চেষ্টাও তো ক'রতে হবে। বই-এর সাথে তোর যে দাও-কুমড়ো সম্পর্ক—

কৃত্রিম কোপের সাথে সে ব'ললো—হ্যাঁ, তা না তো কি, বাবা চায় যে রাতদিনই আমি বই নিয়ে ব'সে থাকি। একটু বই ছেড়েছি কি—

—ওকে একটু বই ছাড়া বলে ! আমি তো দেখি, ফাঁক পেয়েছিস্ কি তুই হয় পেয়ারা গাছে উঠে ব'সে আছিস্—নয়তো কাঁঠালি-চাঁপার গাছতলায় দাঁড়িয়ে ফুল খুঁজছিস্। আর না হ'লে পিয়ানো নয়তো মোটর। থাক্ গে। হঠাৎ তিনি ডাক্তারের দিকে চেয়ে ব'লে ওঠেন—আচ্ছা কনক, ডাক্তারী প'ড়তে তো তোমাকে কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি পড়তে হয়েছে নিশ্চয়ই। ওকে কেমিষ্ট্রি আর অঙ্কটা মাঝে মাঝে একটু আধটু দেখিয়ে দিতে পারো ?

—তা আমাকে দিয়ে যদি সেরকম কিছু সাহায্য হয় তো ক'রতে পারি। অবশ্য, আই, এস্, সি'তে আমি কিছুটা প'ড়েছিলাম। তবে, মনে কিছু আছে কি না সন্দেহ।

—দেখো চেষ্টা ক'রে যদি কিছু পারো। আমি তো সময় পাইনে মোটেই।

—হ্যাঁ, আমি সাহায্য ক'রতে চেষ্টা ক'রতে পারি, যদি ও আমাকে একটা বিষয়ে সাহায্য করতে পারে ?—বনানীর দিকে চেয়ে মৃদুহেসে ডাক্তার বলে।

সচকিতভাবে বনানী বলে—কি ? ম্যানেজারের স্বরও সেই সাথে মেশে।

ডাক্তার মৃদু হেসে বলে—বন্দুক চালানোটা শিখেছি অনেক কষ্টে —কিন্তু, মোটর চালানোটা ইচ্ছে থাকলেও শিখতে পারি নি। 'কল্'-এ যাবার সময় ও যদি একটু আধটু আমাকে শেখায়।

—বেশ, বেশ, এতো ভালো কথা—দু'জনেই দু'জনের মাষ্টার এবং ছাত্র একই সাথে। আচ্ছা, এইবার আমি উঠি। ঠিক সেই সময় বড় ডাক্তার এলেন। আগে তিনি নিয়মিত আসতেন এ বাসায়। ছোট ডাক্তার আসার পর থেকে এ বাসায় আসা তাঁর অনেক কমে গেছে। মাষ্টারমশাই সেদিন ব'লছিলেন, 'কুলিদের মধ্যে আপনি জনপ্রিয় হয়েছেন দেখে এবং বে-আইনীভাবে ওদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেন্ না ব'লে বড় ডাক্তার কিন্তু তলে তলে খুব চ'টেছেন। ম্যানেজার বাবুর গুপ্ত বিরোধী দলের দিকে ক্রমে ক্রমে ভীড়ছেন। আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু বেশ একটা চক্রান্ত ঘনিয়ে উঠছে। ম্যানেজার বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আপনার উপর দিয়ে প্রকাশিত না হয় শেষে।' কথাটা শোনার পর থেকে বড় ডাক্তারকে দেখে ছোট ডাক্তারের কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য লাগে।

বড় ডাক্তার ঢুকতেই ম্যানেজার বাবু বললেন—চলো হে, তোমার কথাই ভাবছিলাম। কথা আছে কয়েকটা। বাবার আবার···অশ্রুত হ'য়ে গেলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বনানী বললো—দেখুন তো, আপনার মত হ'য়েছে কি না অনেকটা। বনানীর এতক্ষণকার নিস্তব্ধতা প্রকাশ হ'য়েছে একখানা সাদা কাগজের পৃষ্ঠায়। ডাক্তারও হেসে উঠলো ছবিটা দেখে। শেষে সপ্রশংসভাবে ব'ললো, বাঃ বহু গুণ সমন্বিতা যে তুমি দেখছি!

—আচ্ছা, আপনার হাতে যে ব্যাগটা দিয়েছি, সেটা আপনার পছন্দ হ'য়েছে তো? একেবারে আধুনিক design-এর ডাক্তারী ব্যাগ।

হঠাৎ বাড়ীর মধ্য থেকে মিহি একটানা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—বনা, ওষুধ খেয়ে যাও।

বনানী চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো—Mother, please—one minute! হঠাৎ সে তার স্বর পাল্‌টে ছবিটার দিকে চেয়ে বললো—আপনি তো কাকু কই আপনার কথা বলেন না কোনদিন—শুধু আমাদের কথাই শোনেন। আমার কিন্তু শুনতে ভারী ইচ্ছে আপনার আগেকার জীবনী।

—কিন্তু যে বাড়ীর দুধের বাটিতে সর ভেদ ক'রে দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না, সে-বাড়ীতে আমার জীবনকথার মানে নেই কিছু। ডাক্তারের মুখে হাসি—কিন্তু স্বরে যেন অশ্রু, যেন কিসের এক নিদারুণ তিক্ততা—যেন Behind laughter unseen tears-এর পূর্ণ প্রকাশ।

অর্থহীন শূন্য দৃষ্টিতে বনানী চেয়ে রইলো ডাক্তারের মুখের দিকে। বাড়ীর মধ্য থেকে এবার একটু উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বনানী হঠাৎ উঠে ছুট্ দিলো—স্যাণ্ডেলের ছর ছর ছর ছর শব্দ তুলে। বলতে বলতে গেল—কি সব হেঁয়ালিভরা কথা বলেন যে আপনি—ভারী রাগ ধরে।

ডাক্তারের চোখের সামনে তখন বহু দূর অতীতের কতক গুলো অস্পষ্ট—অনেকটা ফিকে হ'য়ে আসা ছবি ভাসছে। জামা-জুতো হীন, পিতৃহীন একটা অসহায় বালক শীতের গ্রাম্যপথে ঘুরে বেড়ায়। মৃত বাপের একখানা আধছেঁড়া আলোয়ান দুঃখিনী মা তার গলায় বেঁধে দিয়েছেন। তারপরে—সেই বালক একদিন কাপড়ের খুঁটে মায়ের বেঁধে দেওয়া পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে চার মাইল দূরের হাইস্কুলে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে ভর্তি হ'লো। মাকে ছেড়ে যেতে মন হু হু করে। ক্লাসে বসে থাকার সময় অচেনা-অজানা মুখগুলো দেখে তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। মাষ্টার মশাইদের কঠোর দৃষ্টি তার সব রক্ত শুকিয়ে দিয়ে যায়। বালকের বই নেই, খাতা নেই। মায়না দিতে পারে না নিয়মিত। পরীক্ষা দিতে ব'সে ঘাড় ধাক্কা খায়। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছেলে। পড়াশুনা বুঝতোও না—করতোও না—বই নেই। গ্রামের এক জমিদার স্কুল দেখতে এলেন। হেডমাষ্টার ক্লাশের সবচেয়ে ভালো ছেলেকে দেখিয়ে পরে তাকে নির্দেশ ক'রে বললেন—এই হচ্ছে ক্লাসের worst boy। সে কথা শুনে মা মারলেন। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়ে বললেন—সংসারে আমার আর কেউ আপনার নেই—আমি সবচেয়ে দুঃখী! তোর মুখের দিকে চেয়েই বেঁচেছিলাম। তা' আমার মরাই ভালো। দূর হ'য়ে যা তুই।

একদিন-ভ'রে কাঁদলো বালক। শেষে, সঙ্কল্পের রেখা ফুটলো মুখে। ......চাকা গেলো ঘুরে। সেই জমিদার আর একদিন স্কুল দেখতে এসেছিলেন—হেডমাষ্টার ওকে দেখিয়ে বললেন—এই হলো এখন ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়। তারপর ম্যাট্রিক পরীক্ষার নির্মম দিনগুলো এলো দুঃস্বপ্নের মত।......ম্যাট্রিক পাশের পরের জীবনী তার কাছে আজও বাস্তব-জীবনের ঘটনা ব'লে মনে হয় না। মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের নরক বর্ণনার সাথেই শুধু তার তুলনা চলে।

সেই নরক-যন্ত্রণা থেকে এক অলৌকিক উপায়ে সে মুক্তি পেলো একদিন এক ভদ্রলোকের হাতে। তিনি দারোগা। তাঁরই বাসায় থেকে দীর্ঘ চার বছর ধরে সে ডাক্তারী প'ড়েছে। সেখানেও প্রায় একই চিত্র। ভদ্রলোক লোক ভালো। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তার উল্টো। কেরোসিনের অভাবে বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে পড়াশুনা ক'রতে হ'তো। সকালে সকালে খেলে প'ড়তে অসুবিধা হ'তো বলে একটু বেশী রাত্রে খেতো। তারই শাস্তিস্বরূপ প্রায় রাত্রেই তাকে অনাহারে থাকতে হ'তো। সকাল আটটায় হাসপাতাল ডিউটি। অত সকালে কে আর রেঁধে দিচ্ছে। পয়সাও নেই যে কিনে খায়। ফলে—

এক অদৃশ্য চলচ্চিত্রের পর্দায় যেন ডাক্তার নিজ জীবনের ছবি দেখছিলো। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো মনে মনে—সেই আমি।

সমগ্র কারখানা অঞ্চল উদাস এবং স্তব্ধ—আজ হাটবার। কাজকর্ম কম। বাবুদের ছুটি। হাটের পয়সা সংগ্রহ করার জন্যে দূর দূর বস্তী থেকে শুধু সামান্য কিছু কুলি এসেছে। ড্রাইভাররা তাই ছুটি ভোগ ক'রতে পারে না।

বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো ডাক্তার। লরীতে ষ্টার্ট দিতে দিতে পশ্চিমা ড্রাইভার গীরজু ডাক্তারের দিকে হেসে ব'ললো—আমাদের আর ছুটি নাই ডাগ্‌দার বাবু। গীরজু ড্রাইভারের ডান্ পায়ের পাতাটা ছোটবেলায় আগুনে পুড়ে একেবারে উল্টে এসে গিঁটের সাথে জোড়া লেগে গেছে। দেখতে একেবারে বীভৎস। কিন্তু সেই পঙ্গু পা' দিয়ে সে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে ব্রেক ক'সে যে কত দুর্ঘটনা এড়িয়েছে তা' অনেক লাইসেন্সওয়ালা ড্রাইভারেরও

সাধ্য নেই। গীরজুর আবার লাইসেন্স নেই। বাগানের কর্তৃপক্ষের জন্যে তাতে বিশেষ কিছু অসুবিধে হয় না তার। ভোঁ-ও-ও ক'রে গীরজুর লরী চলে গেলো।

কাজ কর্ম নেই বিশেষ। মেসের দিকে পা' বাড়ালো ডাক্তার। ওপরের জানালা দিয়ে বনানী চেয়ে ছিলো সেই দিকে।

গোটা দু'য়েক মেস আছে বাগানে। অবিবাহিত বাবুরা সেখানে থাকেন ইচ্ছেমত বাসা পাওয়া যায় না ব'লে।

ডাক্তার এক নম্বর মেসে ঢুকলো। মাষ্টার মশাইও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সেই মেসে বাস করেন—চারজন বাবু—সৌরীন, পীযুষ, জগদীশ, বিধু। একই সাথে বাস করার জন্যে এদের সবার মধ্যেই, বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও বেশ একটা নিকট সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছে। তাই এখানকার সম্বোধন হ'চ্ছে 'তুই' আর 'তুমি'।

বাসার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো সেখানে—উত্তেজিতভাবে।

ডাক্তার ঢুকতেই সবাই সমস্বরে ব'লে উঠলো—আসুন আসুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার বিব্রতভাবে হেসে বললেন—অত উত্তেজিতভাবে কি আলোচনা হ'চ্ছিলো আপনাদের?

সব চাইতে ফাজিল ছোকরা সৌরীন। বয়সে সবার চাইতে ছোট সে, ব'লে উঠলো—আমাদের একই কথা—বাসা। হতভাগ্য কুমার আমরা কয়েকজন মেসে প'ড়ে আছি। বাসার লোকদের মত প্লেটে ক'রে সন্দেশ আর আনারস তো আমাদের কেউ সাজিয়ে দেবার নেই, তাই আমাদের আপসোস।

ডাক্তার রহস্য ক'রে বললো—কেন, আপনাদের এত সস্তা চাকর বাকর থাকতে সন্দেশ আর আনারস সাজিয়ে দেবার কেউ নেই? যেখানে দিনের মধ্যে তিন চারবার ঘর ঝাঁট পড়ে—

জগদীশ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলো—মশাই, বড় বাসায় আছেন কিনা। থাকতেন আমাদের মত অবস্থায় তো দেখতেন।

মুখ খানাকে অদ্ভুত রকম বিকৃত ক'রে পীযূষ তার বাক্যকে আরও কিছুদূর টেনে নিয়ে গেলো—বললো আমরা দুটো মজুর খাটালেই উপরওয়ালাদের মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়। অথচ ওঁরা কিন্তু দিব্যি ডজন ডজন মজুর খাটাচ্ছেন কোম্পানীর পয়সায়। আবার মজা দেখুন বড় বাসায় যারা খাটে তারা আমাদের এখানে যারা খাটে তাদের চেয়ে কম হাজরি পায়।

পীযূষ গত এক বছরের বেশী ফ্যাক্টরীতে খাটছে। তার এ্যাপ্রেন্‌টিস্‌-এর মেয়াদ এতদিনেও উত্তীর্ণ হ'লো না। সে পোষাকে চেহারায় বাবু হ'লেও আজও বাবুর স্তরে উঠতে পারি নি। পাওনার দিক থেকে মজুরের ষ্টেটাসেই রয়ে গেছে। বোনাস্‌ পায় এক মাসের। —বাবুরা সেখানে পায় ছয় মাসের বোনাস্‌। তাই ওর কথায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের মাত্রা বেশী। ম্যানেজার বাবুর গুপ্ত বিরোধী দলের বেসরকারী সভ্য সেও একজন।

সৌরীন বললো—আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, আমরা না হয় কুলি—অবশ্য, কুলিরাও বাসা পায়—যে রকমই হোক—কিন্তু আপনার খবর কি? আপনার তো বাসা পাবার কথা।

পীযূষ মুখে একরকম ইঙ্গিত ফুটিয়ে ব'লে উঠলো—ম্যানেজার বাবু সাপ ভোলাবার মন্ত্র জানেন। ডাক্তার বাবুকে—

ডাক্তার জিভে একটা কামড় দিয়ে ব'লে উঠলো—না, না—ম্যানেজার বাবু বলেছেন, শীগ্‌গিরই আমার বাসা হবে। তাছাড়া আমার বাসার তাগিদ বিশেষ কিছু নেই তো। আমার সমস্যা কম। বেশ আছি। কিন্তু আপনাদের তো পাওয়া উচিত ছিলো, এতদিনে সত্যিই।

পীযুষ ঝাঁজ দিয়ে ব'লে উঠলো—এখনই। কবে ডিরেক্টার বাবুদের ভাগ্নে, ভাস্তে, নাতি, নাতির নাতিদের বাসা পাওয়া শেষ হবে—তবে তো আমাদের মত হতভাগ্যদের ডাক পড়বে। ঠোঁটে তার তীব্র ব্যঙ্গের ছটা।

মাষ্টার এতক্ষণ চুপচাপ ক'রে বিধুর সাথে বসে কি সব লিখে চলেছিলেন। এইবার মুখ তুলে হেসে বললেন—আমরা লটারীর টাকার মত প্রত্যাশায় আছি আর কি।

সৌরীন চীৎকার ক'রে উঠলো—তোমাদের প্রত্যাশা বাপু বৃথা।

মাষ্টারের ঠোঁটে যেন বিদ্রূপের ঝলকিত তলোয়ার খেলে গেলো—হ্যাঁ, তা জানি আমরা। জানি যে আমরা জারজ সন্তান—না মা না বাপ দাবী করে আমাদের। আমরা যে শিক্ষক!

সবাই চমকে তাকালো মাষ্টারের মুখের দিকে। মাষ্টারের ঠোঁটের প্রদীপ্ত তলোয়ার চোখে বিচ্ছুরিত হ'য়েছে। আবার বললেন একটু থেমেই—জারজ নই তো কি? আমাদের না স্বীকার করো তোমরা, না স্বীকার করে কর্তৃপক্ষ। বাগানে আমাদের স্থান যে কোথায় আমরা তা বুঝি নে। বাগানের বোনাস্ দেবার সময় আমাদের কথা যদি ওঠে কর্তৃপক্ষ বলেন—কি হবে শুধু শুধু ওদের অত দিয়ে—Reserve Fund এ বরং কিছু কিছু জমুক। অর্থাৎ বাগানের খরচ কম দেখিয়ে, ওপরওয়ালার কৃপা অর্জন ক'রে নিজেরা মায়না বাড়াতে পারেন—এই তো! চরম নির্লজ্জতা।

বিধু হিসেব থেকে একবার মুখ তুলে মুচকি হেসে বলে—এইবার মাষ্টার ক্ষেপে গেছে রে।

—ক্ষেপবো না—আলবৎ ক্ষেপবো। বাগানের মধ্যে থেকেও আমরা তো নেই। তোমরা বাড়ী থেকে আসার সময় খবর দিলেই মোটর ছোটে। আর আমরা আস্‌লে মোটর ছোটা তো দূরের

কথা—একখানা সাইকেলও ছোটে না। যাবার সময়ও তাই—বোঝাই কোন গাড়ীর ওপরে নেহাৎ একটা বোঝার মত উঠে পড়তে পারি তো যথেষ্ট—না হ'লে গোছান স্যুটকেস খুলতে হয়। তোমরা বাসার কথা তবু ভাবো—আর আমাদের বাসাটা একটা সমস্যাই নয়—কেন না, কোনদিনই পাবার নয়। অথচ আমরা ভিক্ষা কুড়োতে এখানে আসি নি। তোমাদেরই বড় কর্তারা আইনকে ফাঁকি দেবার জন্যে একটা লোক দেখানো ব্যবস্থার সাক্ষীগোপাল হিসেবে আমাদের নিয়ে এসেছেন। অথচ—

জগদীশ উঠে গিয়ে তার পিঠ চাপড়িয়ে বললো, থামো, থামো ভাই। খুব হয়েছে।

পীযুষ ব'লে উঠলো—থামবে কেন ঠিক ব'লেছে মাষ্টার। পাশের ঘরের দিকে চীৎকার ক'রে সে আবার বললো—অস্বাভাবিক চীৎকার ক'রে—পড় ভালো ক'রে, চুপ ক'রে আছিস্ কেন?

কি একটা চোখাচোখি ক'রে সবাই হেসে উঠলো—এক ডাক্তার ছাড়া।

ডাক্তারের দিকে চেয়ে পীযূষ বললো—আর ব'লবেন না মশাই—এমন উপগ্রহের পাল্লায়ই পড়া গেছে! ছুটির দিনেও রেহাই নেই।

ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললো—কি রকম?

সেকথার উত্তর দিলো সৌরীন। বললো—বুঝলেন না, পীযুষ কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করছে যাতে তার এপ্রেন্টিস্‌সিপ শেষ হতে পারে। বিনে পয়সায় মাষ্টার ঠিক করেছেন পীযুষকে ওর ওপরওয়ালা কর্মচারী। কিন্তু শিক্ষা যা হ'চ্ছে তার নমুনা তো দেখছেন। তবে তোমার উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছে পীযুষ—পাশের বাসা থেকে তোমার গলা শোনা গেছে এবং তোমার কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত হ'চ্ছেন ভেবে—ইস্, ছেলে আমার কি পণ্ডিতই না হচ্ছে।

হাসতে হাসতে মাষ্টার বললেন—এ আবার উল্টো। মাষ্টারকে লেগে থাকতে হয় ছাত্রের পেছনে—এক্ষেত্রে ছাত্রই লেগে থাকে মাষ্টারের পেছনে। বিনে পয়সায় মাষ্টারী পেলে কে আর ছাড়ে। বাগানের লোকে একবার যদি জানে যে আপনি মাষ্টারী করেন—তাহ'লে উঁচু থেকে আরম্ভ করে নীচু পর্যন্ত সবাই একবার দাবী জানিয়ে যাবে। একটু থেমে আবার বললেন—কি যে বিপদেই পড়েছিলাম আমি। এক বাসায় মাষ্টারী করবার সময় অন্য বাসার লোকে দাবী করলো একবেলা ক'রে তাদের বাড়ীতে পড়াতে হবে। তখন প্রথম বাসার কর্তা চুপি চুপি জানিয়ে গেলেন, ছেলেমেয়েকে দুবেলা পড়ানোই তো ভালো, তাই না? কি উত্তর দেবেন বলুন।

পাশের ঘর থেকে গুন্ গুন্ আওয়াজ উঠতে লাগলো। পীযূষ বালিসটা জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরে শুলো। সবাই ওর ভাবসাব দেখে হেসে কুটপাট। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি এসে বললো—এবার বাড়ী যাই মাষ্টার মশাই?

বালিসের মধ্যে মুখ ডুবিয়েই পীযূষ বললো—যাও। সকলের আর এক দমক্ হাসি।

এবার সবার দৃষ্টি পড়লো বিধুর দিকে। দু'তিনজন একসাথে ব'লে উঠলো কি রে, তোর হিসেব আর শেষ হবে না আজ? ছুটির দিনেও—

মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিধু ব'ললো—আর ছুটির দিন! Monthly Return আজ সারা দিনরাত খেটে তৈরী করতে হবে। মরবারও সময় নেই।

সৌরীন্ ঠাট্টা করে বললো—দেখুন, কবির অপমৃত্যু দেখুন চোখের সামনেই।

ডাক্তার কৌতূহলী হ'য়ে বললো—উনি কবিতা লেখেন নাকি?

জগদীশ বললো—লেখেন না, লিখতেন আগে। ওঁর কবিতা এখন হচ্ছে বাগানের আয়-ব্যয়, কুলি, মজুরী, চায়ের Production, Stock-এই সবের হিসেব—বুঝছেন।

আরও হাঁড়িয়া চাই—ব'লে হাসতে হাসতে, টলতে টলতে, একজন মজুর রাস্তা দিয়ে চ'লে গেলো। সবাই হেসে সেদিকে চাইলো। লোকটা বুঝিয়ে দিয়ে গেলো যে আজ হাটবার। আজকের কথা কেউ ধরে না। ডাক্তার তখনকার মত উঠে পড়ে। বাইরে এসে তার একটা কথা মনে হলো—চা-বাগান উপরে উপরেই শুধু শান্ত—ছবির মত।

বনের আকর্ষণ ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে। বিকেল হলেই যেন রক্তে অরণ্য জাগে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় কয়েকদিন যেতে পারে নি। ডাইরী লিখেই উঠবে ঠিক ক'রেছে ডাক্তার।

ওদিকে মার্টিন যে তার ইস্ত্রী করা স্যুট প'ড়ে, মাথায় নীল রুমাল কোণাকুণি ভাজ করে বেঁধে, বেগুনী রং-এর নেকটাই ঝুলিয়ে, পালিশ করা অক্সফোর্ড পায়ে দিয়ে, ছোট্ট খোকার মত বাইরে চঞ্চলভাবে মচ্ মচ্ শব্দ তুলে জানালা দিয়ে ডাক্তারের দিকে চাইছে, ডাক্তার তা বুঝতে পারছে না। অসহ্য হ'য়ে মার্টিন একেবারে মচ্ মচ্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো গিয়ে। হাতে একটা ষ্টিক্ ছিলো সেটা আর ভেতরে নিতে সাহস পায় নি।

ডাক্তার চমকে তাকালে ও হেঁ হেঁ ক'রে হেসে বললো—ভালো আছেন তো ডাক্তারবাবু?—ব'লেই নিজের পোষাকের দিকে একবার তাকালো। ওর মতলব ধ'রতে পারে নি ডাক্তার। অন্যমনস্কভাবে হেসে ব'ললো—হ্যাঁ।

—দেখেন্ তো—ঠিক হইছে তো?

ডাক্তার এতক্ষণে তার মতলব বুঝতে পেরে সশব্দে হেসে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ হ'য়েছে—তোমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে মার্টিন। হেঁ হেঁ ক'রে আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে শিস্ দিতে দিতে মার্টিন দেওয়ালে ঠেস্ দেওয়া ষ্টিক্‌টা হাতে নিয়ে হাটের পথ ধ'রে।

এই মার্টিনকে একদিন দেখা গিয়েছিলো রাঁচী জেলায় বাকরা-কোট্ গ্রামের প্রান্তে। সে দশ বছর আগের কথা। তার নাম ছিলো তিগ্‌গা।

অন্ধকার রাত। তিগ্‌গা আর তার সঙ্গী দুখা রাতের অন্ধকারে গাছে পালিয়ে আছে। দাদাদের ফাঁকি দিয়ে তারা পালাচ্ছে গ্রাম থেকে। চা-বাগানে কুলির কাজে যাবে। সেখান থেকে দশ মাইল দূরে পিথ্‌রা গ্রামে রাত্রেই চা-বাগানে চালানি অন্যান্য ভাবী কুলিদের সাথে গিয়ে মিলতে হবে ওদের।

সর্দার লোভ দেখিয়ে বলেছে, আসামে চা-বাগানে কাজ ক'রতে যাবি। রোজ দেড় টাকা দু'টাকা ক'রে মিলবে। কাজ কিছু নাইরে। শুধু ব'সে ব'সে টাকা নিবি। থাকবি পাকা দালানে। চল্, চল্ বোকা। এখানে দাদার মার খাবি কেন শুধু শুধু প'ড়ে। আধ পেটা খেতে দেবে তায় আবার মার।—সর্দারের ঠোঁটে সহানুভূতি খেলে যায়।

সত্যি তিগ্‌গার বড় কষ্ট। মাতৃপিতৃহীন বালকটিকে ওর দাদা খেতে দেয় না ভালো করে। হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটায়। এতটুকু ছেলেকে পাহাড় ভেঙ্গে ও'ঠে লালি, শাখুয়া, করমা, পুতরী প্রভৃতি গাছ কেটে ফেঁড়ে রেখে আসতে হয় কার্তিক অঘ্রান মাসে। আবার জ্যাষ্ঠি মাসের দিকে সেই কাঠ শুকালে পাহাড় ভেঙ্গে পাঁজা ক'রে বয়ে নিয়ে আসতে হয়। দুরন্ত পাহাড়ী নদীতে কতদিন সে

আছাড় খেয়ে পড়ে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠেছে দূরে নাকানি চুবানি খেয়ে। সঙ্গীরা না বাঁচালে কবে সে মরে যেতো! একেই, সে দুর্বল। তার ওপর ওই অমানুষিক পরিশ্রম। ওই পরিশ্রমই শেষ নয়। কাটা কাঠ বয়ে আনার কাজ যখন না থাকতো তখন ওকে ওদের যে খানিকটা লোহার মত শক্ত অনুর্বর জমি ছিলো তাতে চাষ করতে হতো, না পারার জন্যে কতদিন সে দাদার কাছে নির্মম ভাবে মার খেয়েছে। পাহাড় আর বন, ঝরণা আর ফোয়ারার সঙ্গে এমনি করেই তার শৈশব কেটেছে। কেটেছে স্বপ্নাতুর কৈশোর দুঃস্বপ্নের সমুদ্রে হাবু ডবু খেয়ে। পাহাড়ী টিয়া ময়নার সঙ্গে কথা ব'লে ওর দিন কেটেছে—ভাইএর সঙ্গে কথা ব'লতে সাহস হয়নি কোনদিন।

তবু পালিয়ে যেতে কষ্ট হয়েছিল। হাজার হলেও নিজের গ্রাম। হাজার নিষ্ঠুর হলেও নিজের ভাই। ওর ভাই আলো নিয়ে বার কয়েক গাছতলা দিয়ে যাতায়াত করলো তা সে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিল। নিশ্চয়ই ওকেই খুঁজতে বেরিয়েছিল। ওর মনের মধ্যে কেমন একরকম নিষ্ঠুর আনন্দ খেলে যায়। কিন্তু ওর ফেরার আর উপায় ছিলনা, ফিরে গেলে যে দাদার কাছে দারুণ মার খেতে হবে সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। আবার এক অব্যক্ত অভিমান ওকে আচ্ছন্ন করে। তাছাড়া, সর্দারের দেখানো লোভ মদের মত ওর মনে ক্রিয়া করে। নতুন দেশ দেখার আনন্দে তার বালক মন ভরপুর হ'য়ে ওঠে। তারপর আছে স্বাধীনভাবে বসবাসের আনন্দ। সেখানে সে যা খুসী খাবে, যা ইচ্ছে করতে পারবে। সর্দার বলেছে, ফুলকেরিয়ার সাথে তার যাতে সেখানে বিয়ে হয় তার ব্যবস্থাও সে ক'রে দেবে। ফুলকেরিয়ার সাথে বিয়ে হতে তার এবা'র (বাপের বন্ধু) খুব আপত্তি। তার দাদারও।

ওর সাথে ফুলকেরিয়ার মেশার জন্যে তার এবা কতদিন নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে তাকে। তবু ফুলকেরিয়া লুকিয়ে পাহাড়ে গিয়ে করম গাছের ছায়ায় ওর সাথে মিলেছে। করমের ছায়ায় ব'সে চিধ্‌রী ফুলের রক্তাভ মালা গেঁথেছে। কখনও তারা কেন্‌, পীয়ার ফল পেড়ে খেয়েছে—ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা দূর করেছে।

কিন্তু ফুলকেরিয়া আসে না কেন? এই গাছের তলেই তো তার আসার কথা ছিলো। আবার সে তরল অন্ধকারের মধ্যেই গাছতলার দিকে চায়। কিন্তু ফুলকেরিয়া আসে না।

সেই দশমাইল পথ বন্ধুর সাথে পাড়ি দিতে দিতে ফুলকেরিয়ার শোকে কত কেঁদেছে সে—তমসা নদীর তীরে একদিন যেমন ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চের দুঃখে আকুল হ'য়ে কেঁদেছিলো। তবু ফুলকেরিয়া আসে নি—ক্রৌঞ্চ যেমন ফেরেনি। বনের পথকে ও কত প্রশ্ন করেছে, প্রশ্ন ক'রেছে ছোটনাগপুরের হাহাকার করা উদাসী বাতাসকে। কেউ ফুলকেরিয়ার সংবাদ দিতে পারে নি।

বাধ্য হ'য়ে শেষ পর্যন্ত সেই দশ মাইল দূরের গ্রামের নির্দিষ্ট আস্তানায় গিয়ে সবার সাথে মিলে। সবাই গাছতলায় গোল হ'য়ে শুয়েছিলো। ওরাও নিঃশব্দে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভোরে উঠে সবার সাথে ওরাও অজানার উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়—শৃঙ্খলিত ক্রীতদাসরা যেমন একদিন তাদের প্রিয় জন্মভূমি আফ্রিকা থেকে তাদের অজানা রক্তাক্ত ভবিষ্যতের দিকে দলে দলে পা বাড়িয়েছিলো।

এরপরে লোহারদাগায় নিয়ে গিয়ে ওদের এক ঘরে বন্দী ক'রে রাখে—পাছে আত্মীয়-স্বজন টের পেয়ে এসে নিয়ে যায়। চিড়ে আর গুড় খেয়ে সারাটা দিন ওদের নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে কাটে। তখন ফুলকেরিয়ার কথা মনে হ'য়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কত কেঁদেছে।

এক সাহেব ভালো ক'রে পরীক্ষা করার পর ওদের বসন্তের টিকা দিয়ে ট্রেনে তুলে দেয়। একজন চাপরাসী সঙ্গে যায়। চাপরাসীটার নাম আবার অদ্ভুত—মিতানবাবু ঠারপাক্না। সর্দার এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়। একজন কুলি ভাগলেই তার কমিশান মারা গেলো। মানুষকে সে বোঝে কমিশান দিয়ে। তিগ্গার মত অসহায় ছেলের দুঃখের দাম তার কাছে কিছু নেই।

দলের বুড়ো এবং ঝানু কুলিদের অবশ্য তত মন খারাপ হয় না। তারা এসবে অভ্যস্ত। ছোটনাগপুরকে আর তাদের দেশ ব'লে মনে হয় না। বরং. চা-বাগানই তাদের স্বদেশ।

বুড়োরা গল্প করে, কেমন করে আগে যখন রেল হয় নি, তখন তাদের পায়ে হেঁটে যেতে হতো দলে দলে। একমাস দেড়মাস লেগে যেতো। আরও কত কি সব আজগুবি চিত্র তুলে ধরে বাগান সম্বন্ধে। ছোটরা মন দিয়ে তা শোনো।

বালক তিগ্গার কানে সেসব ঢোকে না। রেলগাড়ী চড়া তার জীবনে সেই প্রথম। তাই এক অদ্ভুত ভয় তাকে আড়ষ্ট ক'রে রাখে। পথের দু'ধারের ছুটে যাওয়া গাছপালা, মানুষ-গরু, ঘরবাড়ী সব তার কাছে উপকথার বিস্ময়ের মত মনে হয়। আশঙ্কার দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বেঞ্চটাকে শক্ত ক'রে জাপ্‌টিয়ে ধরে।

বাগানে ওকে প্রথমে রাখতেই চায় না ওর চেহারা দেখে। শেষ পর্যন্ত রাখা হয়। ওকে একটা ধোস্ (কম্বল), একটা ঘইলা (কলসী) আর এগারোটা টাকা দেওয়া হয়। বুড়োরা আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলো মিথ্যা নাম দিতে—দরকার হলে যাতে এক বাগান থেকে আর এক বাগানে ইচ্ছে মত পালাতে পারে। বলা তো যায় না কোন্ বাগান কি রকম।

বাগানের চেহারা দেখে তার স্বপ্ন টুটে যায়। সর্দারের দেখানো লোভ রঙীন্ ফানুস্ হ'য়ে আকাশে মিলিয়ে যায়। কোথায় পাকা দালান?—হাত দশ-বারো লম্বা জানালাহীন একটা অন্ধকার ঘর। ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মেঝে। মাসে বড় জোর গোটা আটেক টাকা মজুরী। ব'সে ব'সে মজুরী পাওয়াটা আকাশ কুসুম। উঠতে বসতে বাবুদের তাড়া। স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হ'য়ে যায়। আঝোরে কাঁদে সে কয়েকদিন ধ'রে—স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার মেঝের এক কোণে পড়ে। কাঁদে সে তার নিষ্ঠুর দাদার জন্যে। কাঁদে তার প্রাণ প্রতিমা ফুলকেরিয়ার জন্যে। তার মনে হয়, দেশের গাছ-পালা, নদী, পাহাড়, বন, পাখী, পশু সবাই তার দুঃখে কাঁদতো। এখানে সবাই হাসে—টিটকারী দেয়। সেখানে ক্ষিদে পেলে বনফল খেয়েও কাটান যেতো, এখানে চায়ের কাঁচা পাতা ছাড়া খাবার কিছু নেই। দাদার ছোট্ট মেটে কুটীরটাই তার কাছে হয়ে উঠে প্রাসাদ। কোথায় দাদা? কোথায় ফুলকেরিয়া?

আগুনে যা দেওয়া যায় তাই সে শুষে নেয়। মানুষের দেহ ও আত্মায় এমন কিছু আছে যা সমস্ত দুঃখ কষ্টকে ধীরে ধীরে শুষে নেয়। কষ্ট কি আর হয় না? হয়, তবে দিনে দিনে তিগ্‌গার সব সয়ে আসে। বুড়োদের শেখানো বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সে এক বাগান থেকে আর এক বাগানে ঘুরে বেড়াতে থাকে যাযাবরের মত।

তারপর এলো যুদ্ধ। চায়ের দাম বেড়েছে। কুলিদের কদর বেড়েছে।

তাই তিগ্‌গা একটু সুখে আছে বাগানে। আগে বাগানে বাবুর পা ধরে সর্দারকে ঘুঁষ দিয়ে ভর্তি হতে হতো। এখন তার উল্টো হয়েছে। কিন্তু, তবু সে এক বাগানে বেশীদিন থাকে না। কেননা, ঘুরতে ঘুরতে যদি হঠাৎ ফুলকেরিয়ার সাথে দেখা হ'য়ে

যায়! নিশ্চিত বিশ্বাস, ফুলকেরিয়া চা-বাগানে এসেছেই। তারই আশায় সে আজও টাকা জমিয়ে যায়।

এই বাগানে সে ঢুকেছে কিছুদিন হয়। বাগানটা তার পছন্দসই। ম্যানেজার বাবু ভালো, তাঁর পুরানো অক্সফোর্ড জোড়া তাকে বখসিস্ দিয়েছেন। মাঝে মাঝেই তিনি অমন দেন। ছেলেমেয়েরাও খুব ভালো। তাকে সবাই ভালবাসে। কতরকম অজানা খাবার জিনিষ খেতে দেয়। বাগানে এক বছর কাজ না করলে ম্যানেজারের বাসায় থাকতে পারা যায় না। কিন্তু ম্যানেজার বাবু তার কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক বছরের আগেই থাকতে দিয়েছেন। সে এখন নিজেকে একটা মানুষ মানুষ বোধ করে। তার জীবন-বিকাশের পালা সুরু হয় এতদিনে। দাদার কথা অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে তার মনে। কিন্তু ফুলকেরিয়াকে সে আজও ভোলে নি। তার জন্যে সে আজও প্রতীক্ষা করে থাকে।

ফুলকেরিয়ার সাথে দেখা হ'লো তার অবশেষে এই বাগানে।

তিগ্‌গার সাথে পালাতে পারেনি ফুলকেরিয়া। তার এবা ঠিক পেয়ে তাকে ঘরে আটকিয়ে রেখেছিলো। খুব মেরেছিলো। কত কেঁদেছে সে সারা রাত মাটিতে শুয়ে! ভোরে উঠেই সে নির্দিষ্ট গাছের তলে গিয়েছে। গাছ তলার মাটি আঁচলে বেঁধে নিয়ে রেখেছে নিরাপদ জায়গায়। সেই শীতল মাটির স্পর্শে তপ্ত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে চেয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সে পালাতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাইরের জগতের সাথে প্রথম পরিচিত হ'য়ে সে দিশেহারা হ'য়ে যায়। নতুন একদল কুলির সাথে সে বাগানে ঢোকে। ভেবেছিলো, বাগানে গেলেই তিগ্‌গার

সাথে দেখা হবে। কিন্তু বাগান যে এতো, সে কি তা জান্‌তো। কেঁদে কেঁদে বস্তীর ভিজে মাটি সে আরও ভিজিয়েছে। সে যখন এক বাগানে পাত্তি তুলে উইদারিং রুমএর উপর দিয়েছে, তখন তার কাছের কোন বাগানেই হয়তো তিগ্‌গা রোলিং মেসিনএ পাত্তা ঢেলেছে। সে যখন চুনাই ক'রেছে, তখন তিগগা হয়তো পাশের বাগানেই চা প্যাকিং মেসিনে তুলেছে।

এমনি ক'রেই বছরের পর বছর পরস্পর পরস্পরকে খুঁজে বেড়িয়েছে ওরা—কিন্তু কেউই কাউকে পায় নি। যখন পেয়েছে তখন তিগ্‌গা হ'য়েছে মার্টিন আর ফুলকেরিয়ার জীবনে অমন কত মার্টিনের আবির্ভাব হয়েছে।

এর আগে ফুলকেরিয়ার জীবনে ছিলো সংকীর্ণ এক পটভূমিকা। ছোট্ট একখানা ওরাও পল্লী। অল্প কিছু লোক। ফুলকেরিয়ার জীবনে ছিলো মাত্র একটি লোক, সে তিগ্‌গা। আর বাগানে আসার পর কত লোকজন। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কত নতুন নতুন সম্পর্ক। সে ফুলকেরিয়া যেন আর নেই। বাগানের শিথিল সমাজ জীবনে ফুলকেরিয়া যেন দেউলিয়া হ'য়ে গেছে: অবশিষ্ট আছে শুধু তার কালো ডাগর দু'টি আঁখি যা একদিন তিগ্‌গার মন চুরি ক'রেছিলো।

মেয়েদের জীবনে শুধু অভাবই একমাত্র ভয় নয়। তার চাইতেও বেশী ভয় তার মর্যাদা বিপন্ন হবার। চা বাগানের কুলি মেয়েদের মর্যাদা যে কত সস্তা সেই দিনই সে ভালো ক'রে বুঝলো যে দিন 'অতসী টী ফ্যাক্টরী'র এ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার তার ঘরে ঢুকবার পথে ধরা পড়লেন। মুন্সীর হস্তক্ষেপে তিনি বেঁচেছিলেন বটে, কিন্তু ফুলকেরিয়া সেই রাত্রেই পালিয়েছিলো। এমনি কত উপদ্রব তার উপর দিয়ে চ'লে গেছে। সেই উপদ্রব তাকে শিথিল ক'রে দিয়েছে। তাই 'জ্যোছনা টী ফ্যাক্টরী'তে যে ফুলকেরিয়ার সাথে দেখা হ'লো

মার্টিনের সে ছোটনাগপুরের পবিত্র বন্য কুসুমটি নয়। সে তার প্রেতাত্মা।

প্রথম দর্শনে মার্টিনের কি যে আনন্দ হয়েছিলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার ভুল ভাঙলো। আলোর বদলে আলেয়ায় ভুলেছে সে। এ ফুলকেরিয়া নয়। বুক যেন তার ভেঙে গেছে। অনেক দিন পরে আবার কাঁদলো সে। এত প্রতীক্ষায় ছিলো যার জন্যে, সেই এ? বিশ্বাস করতেও তার বাঁধে। তাই ব'লে ফুলকেরিয়া যে মার্টিনকে ভালবাসে না তাও নয়। তবে তাকে কাব্য জগতের বিশুদ্ধ ও অখণ্ড প্রেম বলা যায় না।

কিন্তু শিথিল সমাজ-জীবন যেখানকার বাতাসকে কলুষিত ক'রে রেখেছে সেখানে এ ধরণের পবিত্র ভাবনার অস্তিত্ব বেশী দিন থাকে না। পঁচিশ টাকা চার আনা খরচ করলেই যেখানে বৌ মেলে, সেখানে ফুল কেরিয়ার চিন্তা আর বেশী দিন মার্টিনকে কাবু ক'রতে পারে না। সে অন্য চেষ্টা দেখতে থাকে। পরিপাটি হ'য়ে নিয়মিত হাটে যেতে আরম্ভ ক'রে। আনাড়ির মত সে একে ওকে গন্ধ তেল, সাবান বিলোতে থাকে। কিন্তু তাতে ব্যয়ই বাড়ে—ফল হয় না কিছু। ফাদার লার্কিনের কাছে মার্টিন হ'য়ে (ব্যাপটাইজ হ'য়ে) দিন কতক তার যে আনন্দ হ'য়েছিলো—হাঁড়িয়া খাবার আনন্দের মত। সে আনন্দের নেশা তার ভাঙতে আরম্ভ ক'রে যতই সে দেখে মানুষ হিসেবে সে ততটুকু বামনই আছে—আর বামনকে কোন মেয়েই পছন্দ ক'রছে না। মার্টিনের কি যে দুঃখ! তবু সে আজও হাটে যায়। আজও সে ফিটফাট হয়ে ডাক্তারের প্রশংসা আদায় করে নিয়ে তবে হাটের পথ ধরে।

চেয়ারের পেছনে যে বনানী কখন এসে দাড়িয়েছে ঠিকই পায় নি ডাক্তার। চট্ করে টেবিল থেকে ডাইরীটা উঠিয়ে নিয়ে বনানী বলে ওঠে—দেখি কি লিখছিলেন। বারে, আপনি যে লেখেন দেখছি—বেশ মানুষ তো। লুকিয়ে লুকিয়ে......, ডাক্তারের শত নিষেধ সত্ত্বেও সে পড়তে আরম্ভ ক'রে দেয়। সেদিনের ডাইরীতে ডাক্তার লিখেছিলো এ বাগানের বাবুদের দু' একটা ভবঘুরে ছেলের সম্বন্ধে যাদের দূরে গিয়ে পড়াবার মত সম্বল নেই এবং বাবুদের মধ্যে পদের ব্যবধানের জন্যে কিছুটা যারা বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ। লিখেছিলো ডাক্তার—ওরা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো দ্বীপ। সেই দ্বীপে আদিম অন্ধকার। আলোর উৎসব নেই, সভ্যতার উজ্জলতা নেই—মৌন নিশীথিনী যেন তাদের জীবনের শিরায় শিরায সঞ্চালিত। ওরা যেন নিঃসঙ্গ আলেকজান্দার সেলকার্কের মত নির্জন দ্বীপের দুর্ভাগা রাজা। ওদের জীবনে ফেরি-ওয়ালা নেই, সিনেমা নেই, ফল চুরি করার মত গাছ নেই, সাঁতরাবার মত নদী পুকুর নেই। এমন কি দৌরাত্ম্য করবার মত সঙ্গ নেই। শুধুই নিজেদের ঘুমন্ত ঘরের চৌসীমানায় তাদের রাজত্ব। এখানে ফুটবলের মাঠ নেই, হাই স্কুল নেই। সরস্বতী পুজোয় ফুল চুরির রঙীন উৎসব নেই, উন্মাদনা নেই। যাদের বাবা অর্থের দিক দিয়ে কিছুটা সৌভাগ্যবান তারা দূর সহরের স্কুলে নাগরিক জীবনের সুবিধে পায়। নইলে, চা বাগানের অন্ধকারেই এদের দিন কাটে। এরা মানুষ হবে কি করে? চা বাগানে যেন বেহিসেবী শৈশব নেই, যাযাবরী যৌবন নেই—আছে শুধু এর আকাশ-বাতাস জুড়ে এক সীমাহীন—হিসেবী বার্দ্ধক্য। এ কেমন দেশ?

ডাইরী থেকে মুখ তুলে বিব্রত ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বনানী বলে—লুকিয়ে লুকিয়ে বেশ লেখেন দেখছি—বেশ লোক আপনি! এবার থেকে কিন্তু যা লেখেন পড়ে শোনাতে

হবে। বনানীর মাথার ঠিক মাঝখানটায় লাল সিল্কের ফিতে দিয়ে একটা সাদা-টগর বাঁধা। অপরূপ মানিয়েছে তাকে—মাথার খোপায় এক থোকা রক্ত করবীর সাথে কিছু কৃষ্ণচূড়া। সে যেন বনকন্যা।

কবিতার ছন্দে ডাক্তার একটু হেসে বলে—অরণ্যের আহ্বান এসেছে, এবার আমাকে উঠতে হবে।

—ওঃ! ব'লে বনানী মুচকি হাসে। অরণ্যই আপনাকে খাবে দেখছি। বুঝেছি এবার কেন আপনি বনের অত ভক্ত।

—কেন?

—লেখায় ভাব আনবার জন্যে—ঠিক কিনা বলুন?

—না, ঠিক না। বনের দিকে তাকিয়ে থাকাটাই আমার কেমন নেশা হ'য়ে গেছে।

—কি দেখেন তাকিয়ে তাকিয়ে? আমার তো ছাই গাছপালা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

—আমি যে ও ছাড়া বিশেষ কিছু দেখি তাও নয়। তবু যেন কেমন আকর্ষণ। বনের বোধহয় হিপ্‌নোটাইজ করার ক্ষমতা আছে।

—কিন্তু সত্যি, ও পথে যাবেন না, কবে যে আপনি বাঘের সামনে পড়বেন তাই আমার ভয়।

—বাঘ! ব'লে ডাক্তার একটু হাসে।

—বাঘে আপনার ভয় নেই? আপনি যেন কেমন! কি ক'রে যে রাত্রে ঘুরে বেড়ান বাগানে-বাগানে! এখানকার লোকে তো বিকেল বেলা পর্যন্ত সে পথে চ'লতে সাহস পায় না।

—কিন্তু, ঘুরে যে আমাকে বেড়াতে হয়—আমার পেশাই যে ওই। ভয় ক'রলে তো আমাকে চলে না।

বাড়ীর ভেতর থেকে সেদিনকার মতই মিহি একটানা গলায় ডাক পড়লো—বনা, বিকেলের ওষুধ খেয়ে যাও, আর কনককে বলো, জল খেয়ে যেন বের হয়।

—যাচ্ছি, মাদার—বনানী সাড়া দেয়। ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলে—মা কি ব'ললো শুনেছেন তো?

—শুনেছি, কিন্তু আমি এসে খাবো—ক্ষিদে পায় নি' এখনও।

—সে কি, ক্ষিদে পায় নি কি? আমাদের তো সব খাওয়া হ'য়ে গেছে এরই মধ্যে।

—কি জানি আমার তো পায় নি এবং কোনদিনই পায় না। তোমাদের গুরুভার খাবারগুলো আমার মত দরিদ্রের পেটে না গিয়ে গলা টিপে ধরে অনধিকারের জন্যে—ছাড়তে চায় না কিছুতেই।

—আবার সেই কথা উঠলো তো! যান্, যান্, আপনাকে খেতে হবে না। আপনি বেড়াতে যান্। আপনার খোঁচা দেওয়া কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। ব'লেই বনানী ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ডাক্তারের মুখে একটুখানি হাসির রেখা মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

ডাক্তার বনের পথ ধরে। আজ একা। মাষ্টার মশাই আসতে পারেন নি। বিধু বাবুর Monthly Return তৈরীতে সাহায্য ক'রতে হ'চ্ছে তাঁকে।

কারখানা অঞ্চল আজ শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। দু' একজন মেয়ে কুলিকে হাট থেকে সদাইপত্র নিয়ে বাড়ী চলতে দেখা যায় এখানে-ওখানে। একটা বাসার পাশ দিয়ে যেতেই কে যেন বলে—এই, বুনো ডাক্তার বনে চ'ললো রে। ডাক্তার শব্দ লক্ষ্য ক'রে তাকাতেই কে যেন টুক্ ক'রে মাথা নীচু ক'রে ফেলে। ডাক্তারের মুখ আর কান্‌টা

একটু লাল্‌চে মারে। চা-বাগান সম্বন্ধে আবার একটা নৈরাশ্যবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে।

লোকালয়ের বাইরে এসে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নির্জন-নিঃসঙ্গ পথ, যেন বড় আপনার। অন্যান্য দিন এই সময়ে পাতি তুলে ফেরার বিরাট শোভাযাত্রা সামনে পড়ে। আজ এ পথ শূন্য। যতদূর দৃষ্টি যায়, দুধারে চায়ের সবুজ ঝোপ। মাঝখান দিয়ে নুড়ি-বাঁধানো প্রশস্ত পথ—রক্তমেঘের আভায় রক্তাভ। ঢ্যাঙা শিরীষ গাছগুলো নিঃশব্দে চা-গাছগুলোকে আগলিয়ে—মায়ের মত স্নেহে। তীব্র একটানা রোদের হাত থেকে চা-শিশুদের রক্ষা করাই তাদের কাজ। ঝোপে ঝোপে নানা অদৃশ্য পাখীর শব্দ। চারিদিকের ঝোপঝাড় কথা ব'লছে যেন। বড় একটা গাছের বেগুনী আভাওয়ালা কিশলয়কে দূর থেকে ঠিক মুকুল ব'লে মনে হয়। ঝর ঝর ক'রে অদৃশ্য নালার জলের শব্দ হচ্ছে ঝরণার মত। চারিদিক নিঝুম। সিঁদূরের মত মেঘের আভায় ফিকে নীল রং-এর পাহাড়ে অস্ফুট বেগুনীর ছোপ ধ'রেছে। পাহাড়ের পাদদেশে একটানা ঘন সাদা তুলোর মত শারদীয় মেঘের বেষ্টনী—শিরীষ গাছের ফাঁকে সেটাকে মনে হচ্ছে যেন মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মস্ত এক সাদা চাঁদোয়া। একজন কুলি সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে একটা শুক্‌নো শিরীষ গাছ কাটছে—নীচে দাঁড়িয়ে র'য়েছে একজন স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ ওর স্ত্রী।

বনের ধারে এসে দাঁড়ায় ডাক্তার। কী অপূর্ব গাম্ভীর্যে ভরা বন। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবান্তর হয়। কতরকম গাছ বনে। কোনটা পেঁপে গাছের মত, কোনটা গাঁদা গাছের মত। মানুষ হয়তো এই সমস্ত বন্য গাছকে আয়ত্তে এনেই পৃথিবীকে সাজিয়েছে ফলে এবং ফুলে। অপ্রয়োজনীয়কে ক'রছে প্রয়োজনীয়—অসুন্দরকে সুন্দর। ঠিক বাঁশীর মত আওয়াজ ক'রে ঝিঁঝি ডাকছে। মনে হ'চ্ছে যেন

বনের দেবতা প্যান্ কোন্ অদৃশ্য গাছের ডালে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে—আর সমগ্র বন্ গভীর নিস্তব্ধতায় সে গান শুনছে।

পূর্ণিমার সোনালী চাঁদ বনের মধ্যে অতলস্পর্শী রহস্যের মত উঁকি ঝুঁকি মারে। বনের মধ্যেকার আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি ভেঙে একটা লোক এসে দাঁড়ায় অবাক হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে। কেমন রহস্যময় ওর মুখ। অর্ধোলঙ্গ ওর দেহ। মাজায় গোঁজা ভোজালি। যেন বনের দেবতা মানুষের গন্ধ পেয়ে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কৈফিয়ৎ তলব ক'রতে এসেছে—বাঁশী বাজানো মুলতুবী রেখে। ডাক্তারের কেমন একটু আধটু ভয় ক'রতে থাকে ওর ভোজালির দিকে চেয়ে,—ওর অরণ্যের মত রহস্যময় মুখখানার দিকে চেয়ে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে—কে? তোমার বাড়ী কোথায়?

অত্যন্ত নিরীহভাবে লোকটি বলে—বনের মধ্যে আমাদের বস্তী বাবু। কুর্মা বস্তী।

ভয় ভেঙে এবার কৌতূহল হয় ডাক্তারের। কানে গোঁজা এক-থোকা বন্য-সাদা ফুলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—কোন্ জাতি তোমরা?

গারো জাতি আমরা আছি বাবু। আমার নাম পুণার আছে।

গারো জাতি! এদের সম্বন্ধেই শুনেছিলো সে যে ওরা গরুর দুধ খায় না। দুধ খেলে নাকি ওরা সমাজে পতিত হয়; যে-মেয়ে কাপড় বুনতে জানে না, বিয়েতে তার দাম বিশেষ কিছু নয়। ডাক্তার তাকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে অদম্য কৌতূহলের সাথে।

সে বলে যে সে ফ্রাসে (ফরেষ্টে) কাজ করে। বন ঝুরানির কাজ করে। বন্ থেকে ওরা বিনা পয়সায় কিছু জমি পায়—বন সাফ করার জন্যে। সে জমি যখন তখন নিয়ে নিতে পারে সরকার। বন ঝুরানির জন্যে দৈনিক দু'আনা থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচ আনা পর্যন্ত মজুরী

পায়। ওর কথায় যেন সরলতা ঝরে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে ডাক্তারের সাথে খুব আলাপ জমে যায় ওর। বনে শীকারের একটা অসীম আগ্রহ রয়েছে তার বহু দিন থেকে। ডাক্তার বলে সেকথা তাকে। শুনে পুণার খুসী হ'য়ে আমন্ত্রণ জানায় শীকারের। সমস্ত রকমে সাহায্য ক'রতে প্রতিশ্রুত হয় সে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করে—এ-বনে হাতী-গণ্ডার আছে নাকি খুব ?

—খুব আছে। দিনের বেলায়ও বেরোয়!

—তোমার ভয় করে না এরকম সময় একা একা বনে বের হতে ?

—খাপ্ থেকে সাঁ ক'রে ভোজালি টেনে বের ক'রে দেখায় সে। অন্ধকার যেন একবার দাঁত বের ক'রে হাসে।

লোকটা বলে—আমাকে এখনই 'ফ্রাস্' অফিসে যেতে হবে বাবু। আপনি আসবেন আর একদিন।

যাবার সময় ব'লে যায়, এরকম জায়গায় আপনিও আর দেরী করবেন না বাবু। বনের আলো-ছায়ায় লোকটাকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ওর দিকে চেয়ে ডাক্তার ভাবে—আশ্চর্য মানুষ ওরা। আজও ওরা প্রকৃতির অংশ হ'য়েই রয়ে গেছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষদের মত আজও আকাশ ওদের বাড়ীর ছাদ; বন—কুঠরী, সঞ্চিত ঝরণার জল—প্রসাধনী আয়না; বনকুসুম—অঙ্গসজ্জা; বন-জ্যোছনা—রাতের আলো; জোনাকী—সন্ধ্যাপ্রদীপ; ঝিঁঝি—বাউল; জীবজন্তু—প্রতিবেশী; গাছের পাতা—ছায়াছত্র; প্রজাপতি—নৃত্য-নাট্যের অভিনেত্রী; ফল—আহার; জল—পানীয়; মহুয়া—নেশা; ঝরণার রঙীন্ মাছ—প্রাসাদের সৌখীন খেয়াল।

সেই আদিম কাল থেকে আরম্ভ ক'রে একদল লোক আরণ্যক সভ্যতার পতাকা তুলে রেখেছে ক্রমবর্ধমান সভ্যতার বিরুদ্ধে।

ওই বন্য গরোজাতি যেন তাদেরই বংশধর। কিন্তু তাদের পতাকা বড় দুর্বল। তাদের পতাকা নুয়ে প'ড়েছে ধীরে ধীরে। নুয়ে যাবে একেবারে। তখনই হবে সভ্যতার সার্থক শোভাযাত্রা। এইসব আপাতঃ সুন্দর বন্য সভ্যতার হবে তখনই সার্থক পরিণতি। হঠাৎ দূরে এক জোড়া উজ্জল চোখ ফুটে উঠে। বনের গম্ভীর ভয়াল পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ডাক্তার চমকে ওঠে সেই আলো দেখে। ধীরে ধীরে আলো কাছে এগিয়ে আসে। মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নামতে নামতে বনানী বলে—আচ্ছা মানুষ তো আপনি? আপনার কি জীবনের মায়া নেই?

ডাক্তার অবাক হ'য়ে বনানীর দিকে চেয়ে বলে—কে বনানী? তুমি যে বড়?

—এমনিই! বনের আকর্ষণেই আসতে হ'লো আমাকেও।—মুখে তার ব্যঙ্গের আভাস।

—চলো, চলো, ডাক্তার ওর কথার সুরটুকু ধরতে পেরে বলে—বড্ড দেরী হয়ে গেছে আজ সত্যিই। একটা গারো জাতীয় লোকের সাথে দেখা হয়ে গেলো কিনা। তার সাথে একটু গল্প করছিলাম। যাক, ভালোই হ'লো, যাবার সময় মোটর পাওয়া গেলো। এমন সৌভাগ্য আর ক'জনের হয়?

—থামুন। আপনার সবই বেশী বেশী যেন। ভারী ইয়ে!

মোটরে উঠতে উঠতে ডাক্তার দেখে পেছনের সীটে মাথায় হলুদ পাগড়ী—বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভার বলবন্ত সিং। ডাক্তারের সাথে চোখা-চোখি হ'তেই বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে হেসে উঠে বলে—সাবাস ডাক্তার বাবু। ডাক্তার বাবু আমাদের ঠিক বাঘের বাচ্চা আছে! পুরুষ মানুষের তো এইরকমই হওয়া চাই। বনাকে আমি কত বললাম, বাঘের বাচ্চাকে

কি আর বাঘ ধরে—বৃদ্ধের নিবিড় শ্বশ্রুগুম্ফের আড়ালে অস্পষ্ট ঠোঁট খানায় একটা হাসির রেখা ফোটে।

ক্রুখে উঠে বনানী বলে—হুঁ তুমি আরও একটু মাথা খেয়ে দাও কাকুর। ষ্টীয়ারিং ঘুরাতে ঘুরাতে একবার চারিদিকে অরণ্যের ভয়াল্ তিমির স্তব্ধতার দিকে বড় বড চোখে চেয়ে বনানী বলে--উঃ, এইরকম ভীষণ জায়গায় লোকে একা থাকে কি করে আমি ভেবে পাইনে। আশ্চর্য লোক!

পাশের আসনে বসতে বসতেও ডাক্তার একবার বনের দিকে দিকে তাকায়। চাঁদ তখন একেবারে রূপোর মত সাদা ধব্‌ধবে হ'য়ে উঠেছে। মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে ডাক্তার বলে কেন নিতে এলে আমাকে শুধু শুধু ব'লতো? কেমন মায়াময় রাত্র দেখেছো?

ফুঁসে ওঠে বনানী বলে হুঁ আপনাকে নিতে আসতে আমার তো ব'য়ে গেছে! আমি এসেছিলাম মোটর চালাবার লোভে। তার শুভ্র সুকোমল গ্রীবাটা বাঁকিয়ে রাখে উল্টো দিকে।

সেকথা লক্ষ্য না ক'রে ডাক্তার অন্য মনস্ক ভাবে বলে যেন সমাধিস্থ সে—ক'লকাতায় থাকতে যে রকম ধন্য জীবন কামনা ক'রেছিলাম, এখানে ঠিক তাই পেয়েছি। এমন অপূর্ব রাজ্য!

—ভারী তো রাজ্য! আমার তো একবার চেয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না। বলবন্ত সিংকে ব'ললাম অন্য পথে চলো, তা না, সে এই পথেই এলো। না হ'লে কে আসতো এই বিশ্রী বনের ধারে!

বলবন্ত সিং কেবল ব'লতে গেলো—বারে আমি—সঙ্গে সঙ্গে চকিতে গ্রীবা বাঁকিয়ে তাকায় বনানী। বলবন্ত সিং থেমে যায়।

পথটুকু নীরবে কাটে। বাসায় পৌছতেই ম্যানেজার বাবু উপর থেকে বলেন কবে যে কি ক'রে ব'সবে তুমি কনক্! না, না, ওভাবে তোমার আর যাওয়া উচিত নয়।

সবাই দৌড়িয়ে এলো। অঞ্জু মঞ্জু—উর্ধশ্বাসে। যেন ডাক্তার কি একটা ক'রে এসেছে।

তা সত্ত্বেও পর পর কয়েকদিন ডাক্তার সেই বনে গেলো মাষ্টার মশাই আর সেই খৃষ্টান্ মাষ্টারকে সাথে ক'রে। কুর্মা বস্তী খুঁজে বের ক'রতে অসুবিধে হয় নি ওদের। পুনারকেও খুঁজে পাওয়া গেলো। বনে বনে সাথে ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে কত রকম গাছপালা, ফুলের সাথে পরিচিত ক'রে দেয় সে। কি উল্লাস তার। এসব গাছ পালার নাম কেউ জানতে চাইবে এটা সে ভাবতেই পারে না। তার নিজের মূল্যও এমন ক'রে কেউ সৃষ্টি করে নি কোনদিন। উৎসাহের সাথে সে গাছ পালা দেখাতে লাগলো। এইটে জারুল; ওইটা কুনী; সেটা লামপাতি। এই দেখেন্ মলাগিরি গাছ। এর কাঠ থেকে বাক্স আলমারী, চোকী হয়। আর যে ঘরে সেই সব জিনিষ রাখবেন সেসব ঘর একেবারে সুগন্ধিতে ভরে যাবে। খুব সুন্দর গন্ধ ওর। লালি গাছ দেখবেন? এইটা—তক্তা, বটম্ হয় এর থেকে।

ফুল গাছ দেখাতে ব'ললে সে দেখাতে আরম্ভ করে—ওই যে সাদা মত ফুলটা দেখছেন ওটা বল্লু—এই কার্তিক মাসে ফুটে ও। নীল ফুলটা যে দেখছেন ওটাকে বলে অবিজাল্। ওটাও কার্তিক মাসেই ফোটে।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ওর পিছু পিছু ঘুরছিলো ডাক্তার। অরণ্যের গভীর স্তব্ধতা সে যেন কান পেতে শোনে। গুল্ম লতায় প্রতিটি দোলা, প্রতিটি হিল্লোল্ রহস্যময় লাগছিলো তার কাছে। হঠাৎ কান খাড়া করে পুনার বললে ওই শোনেন বাবু সম্বর ডাক্‌ছে!

পুনার সহজেই যা শুন্‌তে পেয়েছিলো ডাক্তারদের খুব ভালো ক'রে কান পেতে সেই শব্দ শুনতে হয়। যেন বহুদূর থেকে অস্পষ্ট কু কু একটা শব্দ ভেসে আসছে সঙ্গীতের মত।

পাতায় পাতায় কানাকানি চলে। ডালে ডালে ওঠে মর্মর। নিস্তব্ধ বনভূমিতে হঠাৎ নিঃসঙ্গ বানরের ডাক শোনা যায়। বনের এক জায়গায় এসে দেখা যায়, বেশ কিছুটা জায়গা পরিষ্কার। পুনার বলে। একবছর আগে এ জায়গাটা পরিষ্কার করা হ'য়েছে। কতকগুলো বাবলা ধরণের গাছ দেখিয়ে সে বললে এই দেখুন খয়েরের বন। এ গাছ থেকে খয়ের তৈরী হয়। বনে টিয়া ডাকছে টি টি ; ম্লান রোদের আলোয় প্রজাপতির রঙ্গীন নৃত্য চ'লেছে অরণ্যের রঙ্গমঞ্চে। গাছ-গুলো যেন সব দর্শক। দুধার দিয়ে লজ্জাবতীর লতা। গোলাপী বেগুনী কেশরের উপর হলুদের টিপ দেওয়া ফুলে বন তন্ময় হয়ে আছে যেন।

কয়েকদিন গম্ভীর হ'য়ে ছিলো বনানী। বেশী কথা বলে নি। আজ তাড়াতাড়ি যেতে ব'লেছে। আজ নাকি ওর জন্মদিন্। সকাল সকাল না ফিরলে জীবনে ডাক্তারের সাথে নাকি আর কথা ব'লবে না কোনদিন। আজ ফিরতেই হবে সকাল সকাল। সবার অলক্ষ্যে কতকগুলো অবিজাল্ আর বল্ব তুলে নেয় ডাক্তার।

আর একদিন রাত্রে শীকার ক'রতে আসবে ব'লে পুনারের কাছে ওরা বিদায় চায়। পুনার মাথা চুলকিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলে, ঘরে বিশেষ কিছু নাইতো বাবু—আপনারা মহিমান্ (অতিথি) মাকাইয়ের ছাতু আছে আর কলা, যদি আপনারা—

ওকে খুসী করার জন্যে সবাই রাজী হয়। নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করলে ওরা আবার খুব অসন্তুষ্ট হয়।

পুনারের ঘরে ভোঁটকা গন্ধ। কত রকম জীবজন্তুর চামড়া। ওরা অবাক হ'য়ে দেখে খেতে খেতে। খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে ঝোরার জলে পিপাসা মিটায়। পুনারের ঘরের পাশ দিয়েই একটা কাকচক্ষু স্বচ্ছ ঝোরা ব'য়ে গিয়েছে—নিবিড় বনের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি ক'রেও ফিরতে ফিরতে দেরী হ'য়ে যায় অনেক। বনানী সেজে গুজে প্রতীক্ষা ক'রে আছে। ডাক্তার এলে তবে আরম্ভ হবে জন্মোৎসব। জানালা দিয়ে সে বারবার চাইছে। গুগ্ গুল্ পুরে নিভে গেছে। ধূপকাঠি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। টাটকা ফুল নিষ্প্রভ হ'য়ে আসছে তবু ডাক্তারের পাত্তা নেই। বাবা মাঝে মাঝেই তাড়া দিচ্ছে। অঞ্জু মঞ্জু বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বার বার জল খাবারের প্লেট্ দেখে আসছে। কান্নাকাটী লাগিয়ে দিয়েছে শেষে; মার্টিনের মাতাল করা সাঁওতালী শিস্ ঝিমিয়ে পড়েছে। তবু ডাক্তার এলো না। এলো যখন তখন ঠিক আলোর ফার্ষ্ট ওয়ার্নিং হ'লো। ধীরে ধীরে আলোটা নিভে গিয়ে আবার জলে উঠলো। যেন একটা শিশু হঠাৎ লুকিয়ে আবার তখনই উকি মেরে ফিক্ ক'রে হেসে উঠলো। ডাক্তার তখন ঠিক সোজা উপরে গিয়ে উঠেছে।

বনানী গম্ভীর হ'য়ে রইলো। ডাক্তার অপ্রস্তুতের একশেষ। না ব'সলেও চলে না। বিব্রতভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আড়ষ্টভাবে বসে। এসব ক্ষেত্রে কি সব ব'লতে হয় তা সে বোঝে না। হাজার হোক বড়লোকের মেয়ে তো। নইলে দেখতো কি অদ্ভুত অবস্থায় ফেলেছে তাকে। একবার বসতে পর্যন্ত ব'ললো না, একবার তাকালো না পর্যন্ত। কি ব'লতে কি ব'লে শেষে বিভ্রাট বাঁধাবে।

শেষে উৎসব আরম্ভ হলো কিন্তু জমালো না আর তেমন। ধূপের গন্ধ বৃথাই ছুটলো। ফুলদানির ফুলের গুচ্ছ তুচ্ছ হয়ে গেল যেন। সবার অনুরোধে বনানী তার সেতারটা একবার বাজায়।

বাপ মা উঠে একে একে আশীর্বাদ করলেন বনানীকে। বাবা উঠে ডাক্তারকে কিছু ব'লতে ব'ললেন। বুড়ো দাদু কিন্তু একপাশে চেয়ারে ব'সে দিব্বি খুসীর সাথে বনানীর দিকে চাইছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। আজ আর তাঁর মুখে কোন অভিযোগ নেই রোগের।

অঞ্জু আর মঞ্জু ছোড়দির সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনা লাগিয়ে দিয়েছে। ঝক ঝকে কানবালা দুটোই ওদের আলোচনার বস্তু।

ম্যানেজার বাবুর অনুরোধে আড়ষ্ট ডাক্তার ঘেমে ওঠে একেবারে—যদিও এসময়টা ভোটান্ সীমান্তের হেমন্তের অদিকাল। কিছু না ব'ললে ভালো দেখায় না। বনানী মাথা নীচু ক'রে র'য়েছে। গলায় খেঁকর দিয়ে ডাক্তার বলে—যে দেশে মৃত্যু তিথি পালনেরও অবকাশ নেই, সে দেশে জন্ম তিথি উদ্‌যাপিত হতে দেখলে স্বভাবতঃই আনন্দ হয়। জীবনকে সামনে রেখেই আমরা এগোচ্ছি তাই শুধুমাত্র মৃত্যু তিথি উদ্‌যাপন জীবনেরই ব্যঙ্গ, জীবনের মর্মান্তিক উপহাস। জন্মোৎসবই হ'চ্ছে পিছন্ থেকে অগ্রগতি—মৃত্যুৎসব যেমন অগ্র থেকে পশ্চাৎগতি। তাই জন্মোৎসবই জীবনের উৎসব। কিন্তু জন্মটাই যেখানে অভিশপ্ত হয়ে আছে, পরাধীন সেই দেশে জন্মোৎসবটা আজও অধিকাংশের হিসেবেরই বাইরে। সে হিসেবেব ব্যতিক্রম এখানে দেখতে পাচ্ছি ব'লে আনন্দ হ'চ্ছে কিন্তু একই সাথে এই উৎসব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাদের কথা যাদের জন্মতিথি পালন্ তো দূরের কথা, মৃত্যু তিথি উদ্‌যাপনের পর্যন্ত অধিকার নেই। জন্মতিথি পালনের কথা দূর থেকেই শুনেছি এতদিন, তাই আকাশের দূর নক্ষত্রের মতই তাকে অপরিচিত মনে হ'য়েছে। আজ কাছ থেকে তাকে দেখছি। তাই সুযোগ নিচ্ছি আজ এই জন্মতিথির পবিত্র রঙের ভেতর দিয়ে জীবন্‌কে স্বাগত জানাবার, উষাকে অভিনন্দিত করবার, সৃষ্টিকে বন্দনা করবার। যাকে উপলক্ষ্য ক'রে এই জীবন বন্দনা, তারই উদ্দেশ্যে আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি রইলো এই সুনির্মল্ নিষ্কলঙ্ক, অমূল্য শ্বেত বল্লু আর নীল অবিজালের স্তবকে—বলেই ডাক্তার তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সেই বুনো ফুল বের করে টেবিলের ওপর রাখে।

এইবার বনানীর মুখে হাসি ফুটেছে।' ম্যানেজার সপ্রশংস দৃষ্টিতে ডাক্তারের লজ্জারক্ত ঘর্মাপ্লুত মুখের দিকে চেয়ে আছেন। অপূর্ব বিস্ময়ে সেই বুনো ফুলের দিকে এগিয়ে যায় অঞ্জু মঞ্জু।

উৎসব শেষ হয়ে যায়। নতুন এক প্রস্থ স্যুটে ভূষিত মার্টিন চটাপট্ প্লেট্ নিয়ে এসে হাজির করে, অঞ্জু মঞ্জুর হুরোহুরি লেগে গেছে। এসবে উদাসীনা বনানী হাতে সেই অবিজাল স্তবক নিয়ে ডাক্তারকে বলে—আপনার কিন্তু ভারী অন্যায়! কেন দেরী করে এলেন ?......

হেমন্তের অপরাহ্ণ। গভীর নীল আকাশের দিকে চেয়ে সমস্ত বাগান স্বপ্নমদির। উপর থেকে পিয়ানোর টুং টাং করুণ স্বর ভেসে আসছে। দূরে রহস্যাবৃত হিমালয়। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে ডাক্তার চুপটি করে—ইন্‌স্‌পেকসান্ বাংলোর বহুরূপী পাতাবাহার গাছটির দিকে চেয়ে। দৃষ্টি উদসীন।

পাতাবাহার গাছটা প্রথমে ছিলো সবুজ শুধুই সবুজ। ধীরে ধীরে তার কিছু কিছু পাতা লাল হ'তে হ'তে এখন একেবারে টকটকে লাল হ'য়ে উঠেছে। সবার ওপরে গজিয়েছে গোছা গোছা কুঁড়ি—গোলাপী কুঁড়ি। মনে হচ্ছে যেন রক্তবসনা এক তরুণী সবুজ গাছের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠে, গোলাপী কুঁড়ি হাতে, হেমন্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। হেমন্ত যেন ওর প্রেমিক। হেমন্ত যেন বছরে বছরে একবার করে এসে ওকে জাগিয়ে যায়। ওর আরক্ত যৌবনকে বিকশিত করে। সারা বছর সে ঘুমিয়ে থাকে, হেমন্তের স্বপ্নে ভরে থাকে তার ঘুম।

কাজকর্ম নেই বিশেষ। কেমন উদাস উদাস লাগছে যেন। এইরকম দিনে ডাক্তারের স্মৃতিকে নিষ্ঠুর অতীত পীড়ন করে।

তার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ডাক্তার ক্লাবে গিয়ে ঢোকে। ছুটির দিন বলে আজ দুটো দল্ জমেছে ব্রীজের। ম্যানেজার বাবু ক্লাবে আসেন না বড়।

ডাক্তার যখন ঢোকে তখন খেলা মুলতুবী রেখে লাইব্রেরীর কাগজ নিয়ে তুমুল ঝগড়া লেগেছে। কাগজের সমস্যা অবশ্য অনেক দিনের। এ নিয়ে রোজই একটু আধটু হয়ে যায়। প্রায়ই কাগজ ঠিক মত এসে পৌছায় না। কোন কোন বাবুর বাড়ী পড়ে থাকে—সে বাবুরা প্রায়ই উচ্চ স্তরের।

নিম্নস্তরের ছোকরারা প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে পারে না। কেন না, একই ক্লাবের মেম্বর হিসেবে সমান্ অধিকার থাকলেও একই বাগানের অধঃস্তন্ বাবু হিসেবে তাদের কণ্ঠরুদ্ধ। কুনজরে পড়ে চাকরীর অবনতি ঘটানোর সাহস নেই ব'লে সামনে কেউই প্রতিবাদ করে না। তাই, ছোকরাদের অসন্তোষের ঝাপ্টা সহ্য করে প্রায়ই হতভাগ্য ক্লাব ঘর। তারও ওপর আবার আছে—বাবুদের মধ্যেকার স্বার্থপ্রসূত দলাদলি। অফিসে সেটা প্রকাশ হতে পারে না বলে তারও বেশীর ভাগ জেরই টানে ক্লাব। তাই, ক্রমবর্ধমান্ বাগানে ক্লাব বেচারাই মুমূর্ষু। কর্তৃপক্ষের অবশ্য তা'তে ক্ষতি নেই কিছু। কেন না, 'গুদামের' (ফ্যাক্টরী) চা উৎপাদন তা'তে কমে না। বরং বাড়ে। তাই ক্লাব এখানে অবহেলিত অপসন্তান।

ডাক্তার ঢুকতে না ঢুকতেই ধীরেন (ম্যানেজারের গুপ্ত বিরোধী দলের) বলে ওঠে এই যে ডাক্তার বাবুর টেবিলে আমি কতদিন কাগজ পড়ে থাকতে দেখেছি।

সঙ্গে সঙ্গে রমেশ বলে ওঠে—থাকবে না কেন, বড় বাসায় থাকেন তো!

ভ্রূকুঁচকে ডাক্তার বলে—মানে, আমার টেবিলে কাগজ, মানে?

—মানে, মানে! ছিলো না আপনি বলতে চান? ধীরেন রুখে ওঠে।

—না, তা চাই না। কেন না, ছিলো একদিন। তাও—

—ওঃ, একদিন! মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে রমেশের।

ডাক্তার ভ্রূকুটি ক'রে ব'লে ওঠে—যেন, আপনার টেবিলে একদিনও পড়ে থাকে না।

—প্রমাণ দিতে পারেন?

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকনাথন্ হাতে কয়েকখানা ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি নিয়ে প্রবেশ করে। বলে, এই যে, রমেশ বাবুর টেবিলে এই কয়েকখানা পত্রিকা প'ড়ে ছিলো। সব বাসায় আমি গিয়েছিলাম কি না। তা—রমেশের মুখটা একটু ফ্যাকাসে মারে।

হঠাৎ লাইব্রেরীয়ান্ হেসে ব'লে ওঠেন—এ্যাঃ, রমেশবাবু ঠকে গেলেন্। একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ এসে গেছে।

মুখটাকে অদ্ভুতরকম বিকৃত ক'রে রমেশ বলে ম্যানেজারের বাসা খুঁজলে লাইব্রেরীর অর্ধেক বইএর প্রমাণ অমন বেশ পাওয়া যাবে।

সৌরীন হেসে ব'লে ওঠে আপনার প্রমাণটা কিন্তু তাই বলে—হঠাৎ সেই মুহূর্তে আলোটা দপ্ করে নিভে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত হৈ চৈ।

কিছুক্ষণ পরও আলো জ্বললো না দেখে একজন বলে ওঠে—আর বোধ হয় আলো জ্বললো না আজ। সোমবার তো।

পীযুষের গুদামে ডিউটি ছিলো রাত্রে। সে পালিয়ে চলে এসেছে কিছুক্ষণ যেতে। ব'লে ওঠে সে—জ্বলবে না মানে, ঘানি চ'লছে এখনও পাতা 'শিরানো' হয় নি ব'লে! কালকের পাতিতো শেষ ক'রতে হবে আজ। রাত বারোটা পর্যন্ত আলো জ্বলবে আজ।

একজন বললো ফিতে ছিঁড়ে গেছে বোধ হয়।

আর একজন প্রতিবাদ করে বললো না ফিতে ছিঁড়লে এতো দেরী হ'তো না! বোধ হয় বিয়ারিং অথবা ফিউজ জ্বলে গেছে।

রমেশ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে অন্ধকারের মধ্যে আত্মরক্ষা করে বসে ছিলো। লজ্জা ঢাকবার জন্যেই অনেকটা সুরে ঝাঁজ মিশিয়ে বললো আলো জ্বলবে কি বাপু—বড় বাসার রেডিওর কাজ করতে করতেই দম বন্ধ হ'য়ে যায় বুড়ো মেসিনের।

পীযুষ হেসে বলে তা বটে। একদল রেডিও শোনে আমাদের অন্ধকারে রেখে। মজা মন্দ না!

বিধু নির্বিরোধী লোক। ম্যানেজারের একটু ভক্ত। বললো হেসে বাপু, বড় বাসায় থাকার উপযুক্ত হও তবে তো রেডিও শুনবে! একজন সায় দিল তার কথায়।

রমেশ বিদ্রূপ করে বলে—ইস্, বিধুর যে বড় বাসার দিকে বড় বেশী নজর দেখা যাচ্ছে! বাপু, কবিই হও, আর কপিই হও—তোমার কোন আশাই নাই তা বলে রাখছি। সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। ডাক্তার শুধু বিমর্ষভাবে চুপ করে বসে আছে। অহেতুক অভিযোগে সে মনে বড় আঘাত পেয়েছে। তাছাড়া এই ধরণের আলোচনা তার ভালো লাগে না। এদের সঙ্গও যেন তার সহ্য হয় না।

—নাঃ, চা না হলে জমছে না। এই কালুর্স্! একটু থেমে এই বাঞ্চোৎ কালুর্স্। হারামজাদারা কোথায় যে থাকে। এক কাপ চা পর্যন্ত দেবে না। এই হারামজাদা কালুর্স্। ধীরেনের কণ্ঠস্বর।

বিধু মৃদু প্রতিবাদ করে বলে ওরকম গালা গালি দিয়ে ডাকাটা কি ভালো। রমেশ বিদ্রূপের হাসি হেসে ব'লে ওঠে—কবি কি হঠাৎ কমিউনিষ্ট হ'য়ে উঠলে নাকি?

একটু পরে কালু'স্ মাথা নীচু করে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়। কি একটা অস্পষ্ট শব্দ করে। রুখে উঠে রমেশ বললো—কালু'স্ না কি রে হারামজাদা, তোমকো ডাকতা হ্যায় না বাবু! এক কাপ চা ভি পিলানে নাহি শকতা হ্যায় তো হিয়া পর হ্যায় কিস্‌কে লিয়ে! একদম্ কুদায় দেগা! প্রাণহীন মূর্তির মত নিঃশব্দে আবার কালু'স চলে যায়। ধীরে ধীরে একটা রঙীন্ ফুলের মত লাইট্ জ্বলে উঠে। ডাক্তারের আসনটা শূন্য পড়ে আছে শুধু।

লাইব্রেরীয়ান সেটা লক্ষ্য করে বলে ওঠেন,—আরে ডাক্তার বাবু যে কখন নিঃশব্দে চ'লে গেছেন।

যাবেন না তো কি! যা আঁতে ঘা প'ড়েছে। রমেশের মুখে বিদ্রূপের হাসি।

—কিন্তু, যাই বলো ভাই, ওটা তোমার অন্যায় বলা হয়েছে। লোকটা সত্যিই ভালো। তাছাড়া, ম্যানেজার বাবুর কানে যদি এসব কথা উঠে!

—ব'য়ে গেছে। এই বাগানে কাজ ক'রছি, না হয় অন্য বাগানে কাজ ক'রবো—এই তো!

বিধু বললে—ওসব বড় বড কথা ব'লে লাভ কি। চাবাগানে কাজ ক'রে অতখানি পৌরুষের গর্ব আর ক'রো না ভাই। খুব দেখা আছে সব। ম্যানেজারের সামনে গেলেই সব ভিজে বেড়ালটি। তখন তো দেখি হাত কচলিয়ে শেষ ক'রতে পারো না। কে ক'মাসের বোনাস চাও, কে কোয়ার্টার চাও, কার ছুটি চাই—এসব বলতে পার না তখন?

—রমেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—ইস্, কবির এবার প্রোমোশান অনিবার্য। সঙ্গে সঙ্গে বাগানের আলো একবার চোখ টেপে। লাইব্রেরীয়ান সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠেন—চলো, এবার ক্লাব বন্ধ করা

ক্। আমাদের লাইনের আলো তো আবার শীগ্‌গির শীগ্‌গির নেভে।

উঠতে উঠতে রমেশ বললে—তা নিভবে না—তোমরা তো আর বড় বাসার লাইনের বাসিন্দা নও।

ক্লাব ভাঙে।

মনে কেমন এক ধরণের শূন্যতা নিয়ে ফিরেছে ডাক্তার। টেবিলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে ডাইরীটা ঠিক জায়গায় নেই। আর বিছানার ওপর এক রাশ রাঙা গোলাপ। ধীরে ধীরে তার ঠোঁটে প্রসন্ন হাসি ফুটে ওঠে।

ওরাওঁ বস্তী। সারি সারি দোচালা ছোট ছোট খ'ড়ো ঘর। কোন ঘরের সামনে সজনে গাছ, কোনটার সামনে বা পেঁপে। থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে আছে অজস্র। কোথাও বা দু একটা কাঁঠাল গাছ চোখে পড়ে। কারও বাড়ীর সামনে গাদা করা কাঠ। দু'চারটে মুরগী ইতস্ততঃ চ'রে বেড়ায়। কোঁকড় কঁক্ ব'লে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে ওঠে কোনটা—মাথার লাল ঝুঁটি নাড়িয়ে। মোষগুলো লেজ দুলিয়ে, পা চালিয়ে খেয়ে চ'লেছে পথের প্রান্ত থেকে। নোংরা পথ। অন্ধকার ঘর। শত সহস্র নেংটি পড়া অর্ধোলঙ্গ নরনারী অধ্যুষিত এই বস্তী। হঠাৎ দেখে মনে হয় যেন ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অর্ধসভ্য মানুষ বুঝি এরা। অথচ এরই পাশে জাপানী প্রাসাদের মত বড় বাবুর বাংলো, ছবির মত বাবুদের বাসা আর আলোকোজ্জল রঙীন্ কারখানা। শত সহস্র অর্ধসভ্য মানুষ রক্ত জল ক'রে মেহনৎ করে, প্রাসাদ আর বাংলো গ'ড়ে তোলে।

এখানে আর ওখানে কত পার্থক্য! এখানে তিনটে মাত্র ট্যাপে আশীজন লোকের সমস্ত রকম জলের কাজ চলে। দশ বারো টাকা মজুরীতে যুদ্ধের সংসার চালাতে হয়। ভিজে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার সঙ্কীর্ণ মেঝেতে গাদাগাদি করে পড়ে থাকতে হয়। সাপে কামড়িয়ে মারলে ভগবানের কাছে অভিযোগ জানাতে হয়। কলেরায় ভুগে মরলে আক্ষেপ করতে হয় শুধু। অন্ধকারের আড়ালে যখন মৃত্যুরূপী এ্যানোফেলিস তার অদৃশ্য নিষ্ঠুর সিরিঞ্জ নিয়ে এদের কালো চামড়ার সন্ধানে মাতাল হ'য়ে বেড়ায়, তখন এখানকার মানুষ তাদের অর্ধোলঙ্গ দেহগুলোকে উন্মুক্ত রেখে হাঁড়িয়ার নেশায় নাক ডেকে ঘুমায় মেঝেতে বিছানো শুকনো খড়ে। এরা ঝগড়া করে, মাতলামি করে, মারামারি করে, খুনোখুনি করে। আবার রক্ত ধুয়ে ফেলে, ধুলো ঝেড়ে ফেলে, মালিন্য মুছে ফেলে ভোরে উঠে ছোটে ডোকো ঘাড়ে বাগানে পাতি তুলতে। হাসতে হাসতে, টলতে টলতে, জীবনের স্বতোঃসারিত আবেগে সাড়া দিতে দিতে চলে।

আর ওখানে বিদ্যুৎ উজ্জ্বল প্রাসাদের প্রদীপ্ত গবাক্ষ থেকে ভেসে আসে গ্রামোফোন রেডিওর মিষ্টি সুর, রামধনুর রং চুরি করা সাড়ির জৌলুসে ছায়া সমস্ত রঙীন হ'য়ে ওঠে, উচ্ছ্বসিত ঝরণার রিমিঝিমির তালে তালে জীবন কেমন মধুময় মনে হয়। মধুময় মনে হয় রান্নাঘরের ভেসে আসা লোভনীয় গন্ধ, চীনা মাটির প্লেটের টুং টাং শব্দ।...

ভক ভক ক'রে নীল বাষ্প দমকে দমকে শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। আর ছোটনাগপুরের সমাজ সংসার ভেঙে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে—যেন আরব্য-রজনীর কোন দৈত্যের আকর্ষণে। লাল কারখানটা স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মাটির পানে। আর, তারই নীচে

মূক্‌-অসহায়—এখানকার মানুষের দল যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যায়। ওরা কী কথা কয়? ওরা কী মানুষের মত হাসতে জানে? ওদের জীবনে কী প্রেম আসে? ওদের ছেলেমেয়েদের কী ওরা মানুষের মতই ভালবাসে? ওদের ছ'হাত চওড়া কুঁড়েতে কী আলো বাতাস ঢোকে? বস্তীর কালো হাওয়া শুধু হাসে—মিটিমিটি হাসে।......

এই বস্তীরই এক প্রান্তে এতোয়া সর্দারের লাইনে থাকে ফুল-কেরিয়া—তার উচ্ছ্বসিত-দুরন্ত যৌবন নিয়ে।

কুলি হ'লেও একটু সৌখীন মানুষ ফুলকেরিয়া। ঘরের সামনে তার নানা ফুলের গাছ। এক এক ঋতুতে এক এক ফুল লাগায় সে। এখন কার্তিকের শেষ, লাল ভেলভেটের মত কোঁকড়োচন্দী ফুলে (মোরগ) তার ছোট্ট প্রাঙ্গণ আলোকিত। গাঁদা গাছগুলি ফুলের স্বপ্নে বিভোর। রঙীন দোপাটিরা বিদায় নিয়েছে সবে। ঘরের মাথায় নীল অপরাজিতার নীলিম্‌ বিস্ময়। এক কোণে রক্ত জবার বঙ্কিম কটাক্ষ। ফুলকেরিয়ার কটাক্ষের মতই তীব্র তার জৌলুস।

ডোকো ঘাড়ে বাগানের পথে যাবার সময় তার স্ফীত খোপায় অন্ততঃ একটি রক্ত জবা দেখা যাবেই। নেচে গেয়ে, উচ্ছ্বসিত হ'য়ে, সে চঞ্চলা ঝরণার মত এতোয়া সর্দারের লাইনকে জীবন্ত ক'রে রাখে। সে যেন নববসন্তের সুবাসিত হিল্লোল, যেন বরফাচ্ছন্ন তুন্দ্রার বসন্ত ফুল, অন্ধ মেরুর রঙীন বোরিয়ালিস। ফুলকেরিয়া নেচে গেয়ে স্ফূর্তি ক'রে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। তার তীব্র কটাক্ষে কত কুলির সজীব হৃৎপিণ্ড অসাড় হ'য়ে গেছে। তার সাথে দুটো কথা বলতে পারলে কত কুলি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। এতোয়া সর্দারের তাকে নিয়েই গর্ব।

ফুলকেরিয়া শুধু ফুলই নয়—ফলও। বসন্তই নয় শুধু ফলপাকানো গ্রীষ্মও। তার বুদ্ধির ওপর অনেকেরই আস্থা। তার সাহসের ওপরও অনেকের ভরসা। স্পষ্ট কথা ব'লতে সে ম্যানেজার বাবুকে পর্যন্ত ভয় করে না—যে ম্যানেজার বাবুর কাছে গেলে সবার মাথাই নত হ'য়ে আসে। তার স্পষ্ট কথা বলার সাহস থাকার মস্ত একটা কারণও আছে—সে অলস নয়। বাগানের অন্যান্য কুলিরা যেখানে বড় জোর দু'হাজরির উপযুক্ত পাতি তোলে—কেউ কেউ তিন হাজরিও তোলে—ফুলকেরিয়ার সেখানে তিন হাজরী একেবারে বাঁধা। সে জানে, বারো পাউণ্ডের এক হাজরীর পর থেকে প্রতি পাউণ্ডের বাড়তি আয় দু'পয়সা। তাই সে অক্লান্তভাবে খাটে। অথচ তার মুখ দেখে কেউই সেটা বুঝতে পারে না। প্রকৃতিকে দেখে কি পৃথিবীকে চেনা যায়?

গতবার বস্তীতে আগুন লাগলো, সে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ছোট্ট শিশুকে উদ্ধার করার পর থেকে সমস্ত বস্তীতেই তার কদর বেড়েছে।

অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছে ফুলকেরিয়া। আজ সোমবার। কাজ নেই। পাশ ফিরে আবার শোয়। মাচাটা মচ্‌মচ্‌ ক'রে ওঠে। হঠাৎ কে এক বৃদ্ধা 'আইওগো' (মাগো) ব'লে বিকটভাবে চীৎকার ক'রে কাঁদতে কাঁদতে এসে ঢোকে।

ফুলকেরিয়া লাফ দিয়ে উঠে বসে। আলুলায়িত চুল ঠিক করতে করতে বৃদ্ধার দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে বলে—বীরশার মা! কাঁদছো কেন অমন করে?

বৃদ্ধা কথা বলে না—শুধুই কাঁদে। তার স্বর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বস্তীর প্রাভাতিক শান্ত আকাশকে মুখর করে তোলে।

এরই মধ্যে অনেক লোকজন জুটে গিয়েছিল। সবাই অবাক হ'য়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ফুলকেরিয়ার অনেক চেষ্টায় শেষে বৃদ্ধা তার খাটো আঁচলের আড়াল থেকে অশ্রুসিক্ত মুখ বের করে বলে—আমার বীরশা নাইরে, বীরশা নাই ফুলকেরিয়া।

—বীরশা নাই! সেকি? কি হ'লো তার? বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে প্রশ্ন করে ফুলকেরিয়া।

বুড়ী হাউ হাউ করে কেঁদে ব'লে—আজ ভোরে সে মারা গেছে—আর তাকে মেরে ফেলেছে ওই 'ঘরমুহী' (ঘোড়ামুখী) সোমারী।

—মেরে ফেলেছে কি রকম?

—হ্যাঁ রে মেরে ফেলেছে ওই রাক্ষসী আমার বাছাকে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে বৃদ্ধা—কাল ঐ 'ঘরমুহী' আমার বীরশাকে গাল দিয়েছিলো ঘরমুহা, পকেরডাহা এই সব ব'লে। আমার 'ভ'হিস' তার লাউ-এর গাছ নাকি খেয়েছিলো। শুধু কি আর গাল দিয়েছে—শাপ শাপান্ত ক'রে ব'লেছে, যার ভ'হিস আমার লাউ গাছ খেয়েছে সে কালই মরবে। বুড়ী আবার আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে। তার শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে আবেগের প্রচণ্ডতায়। কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি বলে—সে আরও ব'লেছে, নিংঘাই মারান্ বাস্তোন্ (তুই মরলে তোকে পোড়াবো)।

আমি শুনে ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলাম সেই বিষাহী (ডাইনী) মাগীর দিকে। সে ছুটে পালিয়ে গেলো। না হলে আমার বাছা কি—উহুরে, আইওগো!—আবার তেমনি কান্না।

একবার সে আকাশের দিকে চেয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার ভঙ্গী ক'রে বলে,—ভগবানকে ডেকে বললাম—ঈশ্বর, ইংঘাই খাদ্দান্ বাছা। (আমার বাছাকে বাঁচাও ঈশ্বর)। আবার একটানা করুণ কান্না।

ফুলকেরিয়ার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। বলে—কি হারামজাদী বিষাহীর এত বড় আস্পর্দা! দাঁড়াও।

হঠাৎ দরজায় ডাক্তারের ছায়া পড়ে। ডাক্তার খবর পেয়ে বীরশাকে দেখতে এসেছিলো। ডাক্তারের পিছু পিছু কয়েকজন উত্তেজিত কুলি লাঠিসোটা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ভীষণ উত্তেজিত তারা।

ডাক্তার ওদেরকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করে যে বীরশার মৃত্যুতে বিয়াহির কোন হাত নেই। ও মরেছে রোগে। রোগটার নাম ব্লাক ওয়াটার ফীভার। অন্যদিন ডাক্তারের কথা এ শ্রদ্ধার সাথে শুনলেও আজ এরা কিছুতেই শুনছে না। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা করার পর ডাক্তার বলে—বেশ, তোমরা যখন শুনছোই না, তখন ম্যানেজার বাবুকে বলো গে আগে তারপর যা ব্যবস্থা হ'য় করো। চট্ করে কিছু ক'রে বসো না। ডাক্তার চ'লে যায় একটু হতাশ হ'য়ে।

বস্তীর জটলা বাড়তে থাকে মৃত বীরশাকে কেন্দ্র ক'রে। একে ছুটির দিন, তারপর এই ঘটনা। যারা কাল রাতে হাঁড়িয়া খেয়ে সারারাত মাদল বাজিয়ে নেচেছে, তারাও সবাই টলতে টলতে এসে হাজির। কেউ কেউ সেই 'বিষাহী' সোমারীর সন্ধান ক'রছে। সোমারী তখন ট্যাটন্ সর্দারের লাইনে তার বোনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

হৈ হৈ ব্যাপার। দরীয়ার কী জীয়ে হুজুর। ম্যানেজারের কাছে গিয়ে দলবল নিয়ে সবাই হাজির। সবার সামনে ফুলকেরিয়া। আজ তার আর এক মূর্তি। অগ্নিমূর্তি। জবাফুল আজ তার খোপার বদলে ফুটে আছে চোখের কোণে। গোঁফে চাঁড়া দিতে দিতে মুন্সীও হাজির হ'য়েছে এসে।

বিচার করলেন ম্যানেজার বাবু। পেছনে এসে কৌতূহলে দাঁড়ালো বনানী, অঞ্জু-মঞ্জু, ঠাকুর-চাকর সবাই। জানালার ফাঁকে

ম্যানেজার বাবুর স্ত্রীর কৌতূহলী চোখ জোড়াও চক্ চক্ ক'রতে থাকে।

সোমারীর অনুপস্থিতিতেই বিচার চলে। ওকে সামনে আনাতে সাহস হয় নি। যেরকম উত্তেজিত ওরা।

ম্যানেজার বাবু ওদেরকে প্রথমে বুঝাতে চেষ্টা ক'রলেন, বিষাহীদের মানুষের প্রাণ নেবার ক্ষমতা আজকাল আর নেই। জনতার চোখে অবিশ্বাস বজায় রইলো দেখে তিনি ব'ললেন—অন্যায় সে করেছেই—গুরুতর অন্যায়! সেজন্যে তাকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে। ওর প্রাণ নিলে যদি বীরশার প্রাণ ফিরে পাওয়া যেতো তা'হলে না হয় তাই নেওয়া যেতো। জনতা সায় দেয় দেখে তিনি উৎসাহিতভাবে বলতে থাকেন, তাই তাকে এমন শাস্তি দিতে হবে যেটা সে সইতেও পারে, অথচ শাস্তিটা গুরুতর রকমই হয়। যাও, তার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ক'রলাম আমি। বীরশার মাকে এ টাকা দিতে হবে তার। আর, এতোয়ার লাইনে সে থাকতে পারবে না।

মুন্সীকে একবার টিপে দিলেন তিনি। মুন্সীর ঠোঁটে হঠাৎ খুসীর রেখা ফুটে ওঠে। সবাইকে লক্ষ্য ক'রে সে বুঝায় যে বাবা যে দরীয়ার (বিচার) ক'রেছেন, সেটা খুব ন্যায্য হ'য়েছে। মানুষকে জিন্দা যখন আর করা যাবে না তখন এই শাস্তিই ঠিক। সবাই তখন মাথা ঝুঁকিয়ে তার সারবত্তা মেনে নেয়। কেবল বীরশার মা'র আর্তনাদ হঠাৎ সব শব্দকে ছাপিয়ে ওঠে। ম্যানেজার মুন্সীকে কি ইঙ্গিত ক'রতেই মুন্সী গিয়ে বুড়ীর হাত ধরে বুঝাতে বুঝাতে নিয়ে চলে বস্তীর দিকে। জনতা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

এসব ঘটনা ফুলকেরিয়ার মনে বেশীক্ষণ দাগ রাখতে পারে না—

আজ ছুটির দিন হ'লেও তার সময় নেই। পরশু থেকে আজকের দিনটার জন্যে সে তৈরী হ'চ্ছে। দু'হাঁড়ি হাঁড়িয়ার আয়োজন তাকে

ক'রতে হ'য়েছে। ঠাণ্ডা ভাতে পোরান্ মিশিয়ে বেশ ক'রে রেখে দিয়েছে সে গোপনে। শাল্মা গুড়ীর কাছ থেকে সে গোপনে শিখে নিয়েছে—কী ক'রে হাঁড়িয়া তৈরী করতে হয়। আজই তার কৃতিত্বের প্রথম পরীক্ষা। ভালো ক'রে ভাত পরীক্ষা ক'রে যখন বুঝেছে যে আর এতটুকু গরম নেই তখনই সে পোরান্ (হাঁড়িয়ার একরকম পাউডার) মিশিয়েছে। তার বুক ঢিব ঢিব করছিলো। কি জানি কেমন হবে হাঁড়িয়া। দু'জন মহিমান ব'লেছে সে। যদি হাঁড়িয়া মিষ্টি হ'য়ে যায়? যদি টক্ হয়ে যায়? মিষ্টি হলেও অবশ্য ক্ষতি কিছু হবে না কেননা মার্টিন্ মিষ্টিটাই পছন্দ করে বেশী। আর তাছাড়া পাড়ার টপ্‌পা, সোমরা, মংরা প্রভৃতি ছোঁড়াগুলোকেও দিতে পারবে। ও-গুলোর জন্যে আবার তার মায়া অপরিসীম। তার নিজের যদি একটী ছেলে থাকতো। শাল্মা, মরিয়ম্, মেরী এদের কেমন ছেলে মেয়ে আছে। জমজমাট্ তাদের ঘর। অন্যমনস্কভাবে হাঁড়িয়ার মুখটা খুলতে খুলতে শূন্য ঘরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে তার বুকটা একেবারে খাঁ খাঁ করে উঠে।

ধীরে ধীরে ঘর সংসারে মন দেয় সে। আজ গরম গরম ভাত খেতে পারবে বলে মনের মধ্যে এক ঝলক আনন্দ বয়ে যায় বসন্ত বাতাসের মত। অন্যদিন তাকে ভোরে উঠেই পান্তা খেয়ে যেতে হয়। অবশ্য সবাইকেই তাই খেতে হয় অন্ততঃ যারা কাজে যায়। কাল সে পাতি তুলতে তুলতে চায়ের ফুল তুলে এনেছে। তারই ভাজা ক'রবে। জঙ্গল থেকে শাক এনেছে তার চচ্চড়ী করবে। এ বেলা ওতেই চ'লবে। ও বেলা মহিমানদের জন্যে হাট থেকে মুরগী আন্‌বে। মুরগীর কথা ভাবতে জিভ্ দিয়ে তার জল্ গড়িয়ে পড়তে চায়। আজ হাটবার। খেয়ে উঠে তাকে সাজ গোছ ঠিক করতে হবে। সেটাই তার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। শ্রেষ্ঠ

গর্ব। এ লাইনের মধ্যে তার চেয়ে আর কার বেশী গয়না আছে! না খেয়ে এইসব গয়না গড়িয়েছে সে। আনন্দের আতিশয্যে নতুন গড়ানো হাঁসুলিটা বের করে ফেলে। ষাট্ ষাট্টি টাকা খরচ ক'রে সে এই হাঁসুলিটা কিনেছে। সোজা ব্যাপার! তার কতদিনকার সাধ। কতদিন থেকে সে টাকা জমিয়েছে। প্রাণভরে খায় নি কোনদিন। আজ তারই সামনে সেই হাঁসুলি। ইচ্ছামত তাকে নিয়ে যা খুসী ক'রতে পারে।

হঠাৎ তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। কি দুরবস্থার মধ্যেই তাকে কাটাতে হয়েছে। মা বাপ ছোটবেলায়ই তার মারা গেছে। এবা (বাপের বন্ধু) তাকে মানুষ করেছে। কোনদিন একখানা ভালো কাপড়, ভালো জামা সে পায় নি। বনকুসুম ছিলো তার অঙ্গরাগ। আর, আজ? হ্যাঁ, চা বাগানই তার জীবনকে সার্থক করেছে। এখানেও কষ্ট আছে কিন্তু সে কষ্টটা তার একান্তই নিজের। অন্যের ভাত খাবার মত জ্বালা তো আর নেই। নিজে পরিশ্রম করে সে খায় এখানে। অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না। আর সেখানে? উঃ, ভাবতে পারে না ফুলকেরিয়া। জ্বর নিয়ে বন থেকে কাঠ টেনে আনতে পারে নি বলে এবা'র তাকে কি মার! আজ তুমি মার দখি এবা!

পেছন্ থেকে পা টিপে টিপে এসে খিল্ খিলিয়ে হেসে বন্ধু শাল্মা বলে উঠলো—কি রে ফুল কার সাথে কথা বলছিস্ একা একা? বড় খুসী যে দেখছি। ওঃ, বুঝেছি, ব'লে সে ফুলকেরিয়ার দিকে চেয়ে কটাক্ষ করে।

ফুলকেরিয়া কিল্ ওঠায় একটা। হাঁসুলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে ক্ষিপ্রপদে এগোতে এগোতে শাল্মা বলে—বারে, তুই হাঁসুলিটা

এনেছিস্ তাহলে—বেশ, আমাকে বলিস্ নি! আচ্ছা, দেখলাম,—ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়ায় সে।

ওকে জাপ্‌টিয়ে ধরে ফুলকেরিয়া বলে—রাগ করিসনে ভাই শাল্‌, কালই এনেছি, তোকে বলবার সময় পাই নি।

শাল্‌মার অভিমান্ খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যায়। উৎসাহের সাথে সে বলে, আয় ফুল, তোর গয়নাগুলো পরিষ্কার করি। দরিদ্র শাল্‌মা বন্ধুর গয়না পরিষ্কার ক'রেই আনন্দ পায়।

—এখন না ভাই শাল্‌, খাবার পরে আসিস্, দুজনে মিলে পরিষ্কার করব, হ্যাঁ?

—তাই ভালো। আচ্ছা আসবো। কি রাঁধবি তুই আজকে?

—চায়ের ফুল্ ভাজবো আর শাক রান্না করবো।

—আয়না ভাই, রাঁধি—আমার তো বাড়ীতে কাজ বিশেষ কিছু নেই।

—যদি খাস্ এখানে, তবে রাঁধবি। কিন্তু খেতে তো বললাম তোকে কি দিয়ে যে খাওয়াই তার ঠিক নেই—যেমন আমি!

চোখ পাকিয়ে শাল্‌মা বলে—আমি না তোর বন্ধু ফুল্। বুঝলাম, আমি বন্ধু না ছাই!

—চটিস্ নে ভাই। তোর কথায় কথায় যে অভিমান্।

এর পরে দুজনে রাঁধতে বসে। রাঁধতে রাঁধতে মাঠা ভাণ্ডীর একটা গান করে। সে গানের অর্থ সামান্যই—একটা আমের রং সবুজ, একটা হলদে আর একটার সিঁদুর রং। কাঁচা খেলে টক্ লাগে, পাকা মিষ্টি ও গাদ্‌রাল্ (আধপাকা) খেতে খুব ভালো।

গানের ভাষা সামান্যই কিন্তু ছোটনাগপুরের পাহাড়ী ফুলকেরিয়ার সুরের গুণে সেটা অসামান্য হ'য়ে ওঠে। গানের সুরে যেন পাহাড়ী নির্ঝরের তান, বনটিয়ার রং, বনকুসুমের গন্ধ।

ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে যেন এদের মাতৃভূমি ছোটনাগপুর রূপায়িত হ'য়ে ওঠে।

গানের শেষে ফুলকেরিয়া বলে—ভাই, একবার দেশে যেতে ইচ্ছে করে। কতদিন যাই নে।

—সত্যি ভাই আমারও।

—চল্, একবার যাই দুজনে।

—উঠবে কোথায় ?

—কেন তোর এবা'র বাড়ী।

—না ভাই, ওইটা বাদে। কেন তোদের বাড়ী নাই সেখানে ?

—ছিলো ; কিন্তু সর্দার দখল করে নেছে সব দেনার দায়ে।

শাল্‌মার বিষণ্ন টানা চোখ দুটির দিকে চেয়ে ফুল্‌কেরিয়া বলে, আমাদের দেশ বড় গরীব রে—না ? এই দেখ, অভাবের জন্যেই তো আমাদের দেশের লোক সব এখানে চলে এসেছে। না হ'লে কি দেশ ছেড়ে আসে কেউ ?

কড়াইএর দিকে চেয়ে ফুলকেরিয়া হঠাৎ বলে ওঠে ও, যাঃ, তেতুল তো দেওয়া হলো না শাকে। একেবারেই ভুলে গেছি—একটা টোপ্‌লা থেকে তেঁতুল বের করে।

ফুলকেরিয়া বলে, 'ফুট্টালগে'র আচার ভালো বাসিস্ ?

—খুব ! শাল্‌মা খুসী হ'য়ে বলে।

—আমার কিন্তু ভাই টেপার পাতার আচারই ভালো লাগে। তা, ফুরিয়ে ফেলেছি খেতে খেতে—তোকে খাওয়াতে পারলাম না। আচ্ছা খাওয়াবো একদিন।

খেতে খেতে বলে, তোকে তো কিছুই খাওয়াতে পারলাম না ! ভাই ওবেলা কিন্তু তুই আমার মহিমান্—ওবেলা দুটো মুরগী মারবো। আরও দুজন মহিমান্ হবে কিনা।

চোখ ঘুরিয়ে শাল্‌মা বলে—মার্টিনকে বলেছিস্‌ তো।

হেঁসে বলে ফুলকোরিয়া—বলেছি তো।

শাল্‌মা হেসে ওঠে।

খেয়ে দেয়ে উঠে দুজনে বসে বুরুস দিয়ে গয়না সাফ করে। গয়নাগুলো যতই ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে ততই শাল্‌মার চোখ দুটো উজ্জল হ'য়ে উঠতে থাকে।

হাটের অনেক আগে শাল্‌মা একখানা ফর্সা কাপড় পড়ে আসে। আনন্দে আজ ডগ্‌মগ্‌ করছে সে। ফুলকেরিয়াও একখানা কাপড় পাট ভেঙে পরে। পান খেয়ে ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে করে বার বার পরখ করে বেরোয়। উঠোনের এক প্রান্ত থেকে অতসীর মত গাছ থেকে হলুদ হলুদ চাকুন্দা ফুল পেড়ে খোপায় গোঁজে দুই বন্ধু। পথের ধার থেকে বেগুনী দাঁতরঙ্গা ফুল পেড়ে তার মধ্যে মধ্যে গোঁজে। ফুলের মতই অপরূপ হয়ে উঠেছে ফুলকেরিয়া। কানের মাঝখানে পরেছে সে রূপোর কানোসি। কানের লতিতে পিপার পাতা, গলায় হাঁসুলির উপরে বদনা। হাতে বেড়া। নাকে সোনার খোট্টা। খোপার মাঝখানে গুঁজেছে কোঁহারা।

বন্ধুকে আপত্তি সত্ত্বেও সে তার খামিয়া পরিয়েছে গলায়। খোপায় সে সাদা পাড় এমন ভাবে কাঁটার সাথে গুঁজে দিয়েছে যাতে ঠিক বেলী ফুলের মত দেখায় দূর থেকে!

দুজনে চলেছে হাটের পথে। যেন দুটি দুই রঙের সন্ধ্যা মালতী। পথে যেতে যেতে দুজনে উচ্ছলতায় চল্‌কে ওঠে। কখনও গুন্‌ গুনিয়ে গান করে। হাট্‌ চল্‌তি কুলিদের সাথে দেখা হলে হেসে কথা বলে! কটাক্ষ করে স্বৈরিনীর মত। যৌবনে উচ্ছ্বলিত তাদের সর্বদেহ। মদির আঁখি আকাশের ভেনাস্‌কেও হার মানায় যেন।

হাটে কেনবার বেশী কিছু নেই। কেবল পুরনো, পরিচিত বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে হাসি ঠাট্টা, গল্প গুজোব। পাহাড় ডিঙিয়ে, বন ভেঙে দূর দূরান্তের কত বিচিত্র মানুষ এসেছে। কে কোন্ জাতির জোর ক'রে বলা কঠিন। এটা কোন্ দেশ তাও বলা কঠিন। কত দেশী জিনিষপত্র উঠেছে। দেশী ধূপ কাঠি, কাঁচা কাঁচা কমলা, অম্ল মধুর নটকা ফলও উঠেছে।

মজা সুপারী, চীনাবাদাম, মুড়ি, মুড়ির নাড়ু, চিড়া, রসগোল্লা, সন্দেশ, মাছ, শুকনো চিংড়ী, শূয়োরের মাংস, মুরগী কিছুরই অভাব নেই। স্থানীয় রূপোর গয়না নিয়ে এসেছে একটা লোক। কুলি মেয়েরা সেখান দিয়ে যেতে যেতে একবার লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে যায়। দূর সহর থেকে মনোহারী দোকান-পসারও এসেছে। সহরে কণ্ট্রোলের ভয়ে যে সব জিনিষ প্রকাশ্যে বিক্রয় হয়না—এখানে দিব্বি প্রকাশ্যেই বিক্রী হ'চ্ছে সেসব। ছোট খাট সহরে দুর্লভ অনেক জিনিষও এখানে পাওয়া যায়। দোকানীরা জানে, সহর থেকে বিচ্ছিন্ন চা-বাগানের বাবুরা দামের চিন্তা না করে কেনবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে।

হাওয়ায় চঞ্চল আকন্দের তুলোর মত ফুলকেরিয়া আর শাল্মা দোকানে দোকানে হানা দিয়ে বেড়ায়। সবাই প্রায় পরিচিত। কারও দিকে চেয়ে শুধু একবার হাসে। কারও কাছে থেমে দুটো রসিকতাপুর্ণ কথা কয়, কারও দোকানে বা একটা পান খায়।

কোন কুলি ফিস্‌ফিস্ করে অভিযোগ করে—তোর আজকাল দেখা পাওয়াই ভার ফুল।

ফুলকেরিয়া চোখ উল্‌টিয়ে বলে—ইস্, ভারী আমার ই'য়ে রে। আমার কাছে কী দরকার তোমার শুনি? ব'লে চোখ উল্‌টিয়ে হাসে।

লোকটা মাথা চুলকায় বিব্রতভাবে।

কা'কে যেন খুঁজছে ফুল্‌কেরিয়া। খুঁজতে খুঁজতে মুরগী লড়াইএর দিকে গেলো দুজনে। সেখানে তখন প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা, যেন প্রাচীন গ্রীসের গ্ল্যাডিয়েটার লড়াই। থেকে থেকে রব উঠছে 'রঙ্গুয়ামে' দু' আনা; 'ঝিঞ্জিরিয়ো'মে চার আনা। অর্থাৎ লাল মুরগী লড়াইএ জিঁতলে যারা তার উদ্দেশ্যে দু'আনা বাজী ধরবে তারা তা পেয়ে যাবে। ঝিঞ্জিরিয়া' হ'চ্ছে নানা রঙের মুরগীগুলো—চক্‌রা বক্‌রা। অনেকটা ঘোড় দৌড়ের মত এই মুরগী লড়াই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে চুক্তি হয়। বিশেষ এক ধরণের সরু লম্বা ছুরি বেঁধে মুরগী দুটোকে কয়েকবার ঠোকাঠুকি লাগিয়ে উত্তেজিত করে লড়াইএ ছেড়ে দেওয়া হয়।

একটা লাল মুরগীর ওপর বাজা ধ'রে ব্যাকুল এবং উত্তেজিত-ভাবে চেয়ে ছিলো স্যুট্‌-পরা মার্টিন। তার বাহ্যজ্ঞান তখন একরকম নাই ব'ললেই চলে। অনেকটা উপুর হয়ে বসে সে নিরীক্ষণ করছে, কিভাবে তার কামনার লাল মুরগী কেশর ফুলিয়ে, মাথা নীচু করে, শুয়ে পড়ে তাক্‌ খুঁজছে প্রতিপক্ষকে দুর্বল জায়গায় আক্রমণ করবার জন্যে। চোখে মুখে তার হিংস্রতা ফুটে উঠেছে—সর্বাঙ্গে যেন তার মৃত্যুর ছায়া। অধীর ভাবে মার্টিন উপুর হয়ে পড়ে অন্যান্য সবার সাথে তার চিকন কণ্ঠ মিলিয়ে চীৎকার করছে রঙ্গুয়া রে, রঙ্গুয়া—

হঠাৎ পিছনে একবার স্পর্শ পেয়েই ফিরে তাকায়। মুহূর্তের জন্যে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সে, দাঁড়া রে ভাই একটু, ব'লেই আবার ঝুঁকে পড়ে। রঙ্গুয়া তখন অন্যটাকে আহত করছে। ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে রক্ত পড়ছে কালো মুরগীটার উরু বেয়ে। মৃত্যুর কালো গ্রাস তার দিকে হিংস্র হ'য়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তবু তার আক্রমণের চেষ্টার বিরাম নাই। টলে পড়তে পড়তেও সে এগিয়ে যাচ্ছে। আকাশ ফাটা চীৎকারের প্রতি তার দৃক্‌পাত

নাই। নিপুণ যোদ্ধার মত সে তার শাণিত ছুরিকার রক্ত ক্ষুধা মিটাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রছে। কিন্তু বৃথা। হঠাৎ, আর এক আঘাতে ঝলক্ কয়েক সিঁদূরে রক্ত পড়তেই সে টলে পড়লো মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাততালি। মার্টিন হাততালি দিতে দিতে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। উৎসাহের আতিশয্যে সে প্রায় জড়িয়ে ধরতে গেলো ফুলকেরিয়াকে। পেছিয়ে গিয়ে ফুলকেরিয়া ব'ললো, মরণ দেখো না। সাল্মা মুখ টিপে হাসলো শুধু।

বাজী ধরা পয়সা জিতে নিয়ে মার্টিন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে আয় ফুল, একটা মুরগী লিয়ে লি।

রুক্ষস্বরে ফুলকেরিয়া বলে—তুই লিবি কেনে—আমি লিবো। আমার বুঝি পয়সা নাই। আর তুই আমার মহিমান্ না আজ। আয় আমার সাথে, বলে ফুলকেরিয়া একটা দিক লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে যায়।

একটা লোক দুটো মৃত মুরগী হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

তার সাথে একবার চোখাচোখি ক'রে, মুচকি হেসে ফুলকেরিয়া এগিয়ে গেলো সেই দিকে। হেসে সম্ভাষণ করলো তাকে। উদ্দেশ্য ব'ললো।

লোকটি হেসে বললো—তোমাকে কি আমি না ক'রতে পারি! নাও বড়টাই নাও। দেখো, এর কী তেল। মহিমান্রা কেমন খুসী হবে খেয়ে দেখো।

এইবার হাট থেকে ফিরে চললো ওরা। দিনের শেষ আলো সোণা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ চা পাতার গায়ে গায়ে। চা-বাগানের মাঝে মাঝে যে সমস্ত অপ্রশস্ত পায়ে চলা পথ বহুদূর পর্যন্ত সরল রেখার মত চলে গেছে সেই সব নির্জন পথ এখন হাট-ফিরতি লোকের ভীড়ে মুখরিত। ওরা তিনজনও সেই পথ ধরে। মার্টিন পেছনে পেছনে তার ফর্সা কোটের উপরে বড় বাসার সওদা ঝুলিয়ে

অক্সফোর্ড পায়ে মচ্ মচ্ ক'রে চলেছে ছোট্ট খোকাটির মত। টুক্ টুক্ টুক্ টুক্ ক'রে তার জুতোর শব্দ হচ্ছে ক্ষিপ্র। ফুলকেরিয়া আর শাল্মা তেমনিভাবে হাসি ঠাট্টা করতে করতে চ'লেছে। মার্টিনের দশ আনা ছয় আনা ছাঁটের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ফর্সা কোটের ওপরে ঝোলা চাপানোর ধরণ দেখিয়ে ফুলকেরিয়া হেসে কুটপাট্। পয়সা জেতার নেশা তখনও কাটেনি মার্টিনের। সে অনর্গল বলে যাচ্ছে উচ্ছ্বসিতভাবে। তারপর, ফুলকেরিয়া যে তাকে হঠাৎ আজ মহিমান্ করেছে সে আনন্দও মিশেছে তার সাথে। ছোটনাগপুরের ফুলকেরিয়াকে সে চিন্তো,—কিন্তু এখানকার ফুলকেরিয়াকে সে চিনে উঠতে পারে না। কখনও সে এত কাছে আসে, মনে হয় এই বুঝি পেয়ে গেলো তাকে। আবার, কখনও সে দূরে, এতই দূরে চলে যায় যে তাকে মনে হয় যেন এক টুকরো ভোরের স্বপ্ন অথবা রহস্যময় সন্ধ্যাতারা।

কারখানার কাছে এসে ফুলকেরিয়া শালমাকে খোঁচা দিয়ে হেসে বলে উঠলো—ওই দেখ, কোহাকুক্ আর ঝোলেয়া যাচ্ছে। একটু দূর দিয়ে ম্যানেজার বাবু আর তাঁর পেছনে একান্ত অনুগতের মত রমেশ চলেছিলো।

তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক তাকালেন ওদের দিকে। শালমা ব'লে উঠলো—যাঃ, শুনতে পেলো ওরা—তুই যে কি!

কোহাকুক্ আর ঝোলেয়া কথা দুটোর এদের ভাষায় এক বিশিষ্ট অর্থ আছে। কোহাকুক্ বলে এরা যার মাথা খুব বড় তাকে। আর, ঝোলেয়া বলে খচ্চর লোককে। কুলিরা বাবুদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক একজনকে এক একটা গুপ্ত নাম দিয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় তারা সেটা ব্যবহার করে। এমনি ঝগরুবুড়া

(ঝাকরা চুলওয়ালা উদাসীন লোক), পোকো (পাকা চুলওয়ালা), চাড্‌রা (মাথা ন্যাড়া) প্রভৃতি বাবুদের এক একজনের নাম আছে।

বন্ধুর কথার উত্তরে ফুলকেরিয়া বলে—ভারী তো! আমি ভয় পাই নে কাউকে।

বড় বাসায় ঢুকে পড়তে পড়তে মার্টিন বললো, আমি যাচ্ছি একটু পরে রে ফুল।

ফুল্‌কেরিয়া বললো—হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি যাস্‌। মার্টিনের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে শাল্‌মা বলে, মার্টিনকে তোর শীগ্‌গিরই বিয়ে করা উচিত—দেখতো, তোর জন্যে ও পাগল। ফুলকেরিয়া মুখ টিপে হাসে।

বস্তীর পথে পড়তেই লাঝার নামে একটা ছোট্ট ছেলে ছুটে এলো 'আমার জন্যে কী এনেছো এদাই (দিদি) ?'

—তোমার জন্যে ? গালে একটু চুমু দিয়ে হাতের মুঠো থেকে মুড়ির একটা চ্যাপ্টা মোয়া বের করতে করতে ফুল্‌কেরিয়া বলে—এই দেখো তোমার জন্যে কী এনেছি বাপ। মোয়া পেতেই ছেলেটা উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে। ফুল্‌কেরিয়া চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। দৃষ্টিতে যেন স্নেহ ঝ'রে পড়ে।

ঘরে পৌঁছে শাল্‌মা থামিয়া খুলে দিতে যায় গলা থেকে। ফুলকেরিয়া চট্‌ করে হাত ধরে ফেলে খুলতে বাধা দেয়। ওর অর্থহীন বিহ্বল দৃষ্টির দিকে চেয়ে ফুল্‌কেরিয়া বলে, তুই না বন্ধু আমার শাল্‌। ওটা আমার বন্ধুত্বের চিহ্ন। আমার তো হাসুলিই রইলো।

রান্না হতে হতে একটু রাত হয়ে যায়। নানা বস্তী থেকে মাদলের শব্দ উঠছে। মাতাল-করা শব্দ, বর্ষার অবরোধ ভেঙে, কারখানার প্রাচীর ভেঙে এবার বস্তীর প্রাণীরা মানুষ হ'য়ে উঠছে ধীরে ধীরে। নাচে-গানে-হল্লায় এবার জীবন ফিরে আসবে তাদের বুকে। মাদলে পাগল করে ফুলকেরিয়ার মন। মুরগীর মাংস সিদ্ধ হয়েছে

কিনা পরখ করতে করতে দু' এক কলি গুন্‌গুনিয়ে গায়। শাল্‌মাকে সোৎসাহে বলে—আজ বেশ আমরা খাওয়ার পরে নাচ-গান করবো ভাই। এ্যাঁ? কতদিন যে নাচ-গান নাই! বৃষ্টি আর বৃষ্টি যা বৃষ্টি গেছে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সবাই হাঁড়িয়া নিয়ে বসে। দু'হাঁড়ি হাঁড়িয়া। একটা হাঁড়ি মিষ্টি হয়ে গেছে। আর একটা হাঁড়ি বেশ ঝাঁজালো হয়েছে। অর্ধেক কৃতিত্বেও ফুলকেরিয়া খুসী হয়। মিষ্টি হাঁড়িয়া লাঝার আর টপ্‌পাকে ডেকে এনে খাওয়ায়। শেষে নিজেরা গোল হয়ে বসে খায়। হাঁড়িতে তিনবার জল ঢেলে সেই জল ছেঁকে এক একজনকে গ্লাসে করে দেয়। ভাত তলে পড়ে থাকে। কেউই দু' গ্লাসের বেশী পারে না। ফুল্‌কেরিয়া তিন গ্লাস কাবার করে। নেশার ওপর তার একটা মোহ আছে। তাই নেশাটাকে ভালো করে জমাবার জন্যে কথার বান ডাকিয়ে দেয়। তারপরে কয়েকজনে মিলে ওরা ওর উঠানে অর্ধচন্দ্রকারে, চন্দ্রের আলোয় নাচতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মাদল বাজতে থাকে দাতুন্ থুনা থুন্।

এগিয়ে পিছিয়ে, করুণ স্বরে, ডম্‌কচ্ ডাণ্ডী (খেলার গান) গান করে ওরা। তার মর্ম হ'চ্ছে—দশরথ মুনির চরণ ধরে তপ ক'রছে। তার তিন যুগ চলে গেছে কিন্তু ছেলে হ'লো না। তার ভাগ্যে কি লেখা ছিলো। ধন-সম্পত্তি সব পুরা আছে। খালি একটা ছেলের জন্যে জগৎ অন্ধকার তার। কপালে কি লেখা ছিলো!

মদির হ'য়ে উঠেছে জ্যোছ্‌না রাত্রি। মদির হ'য়ে উঠেছে ফুলকেরিয়ার চোখ। মাজায় হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে অর্ধবৃত্তাকারে নাচছে তারা। ডান পা তুলে এগিয়ে যায়—বাঁ পা ফেলে পিছিয়ে আসে। একটানা করুণ স্বর বয়ে যায় স্বপ্নাচ্ছন্ন বস্তীর আকাশে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে অবিরাম। অন্য সবাই ক্লান্ত হলেও ফুলের ক্লান্তি

নাই। মদালস্ আঁখি মেলে সে শুধু চেয়ে থাকে রহস্যময় পৃথিবীর দিকে। পায়ের তাল আপনিই ছন্দ রেখে চলে।

মার্টিন তন্ময় হ'য়ে গেছে একেবারে। অনেকদিন পরে ফুলের সাথে নাচছে সে। সমস্ত পৃথিবীটাকে আজ সে কৃপা কর'তে পারে। জ্যোছ্‌নালোকিত এমন রাত্রি বুঝি এক স্বপ্নের দেশেই আছে। মার্টিন নেচে যায়—মোহগ্রস্ত হ'য়ে নেচে যায়। ফুল কি সুন্দর!

অনেক রাতে নাচ থামলো। অন্য সবাই বিদায় নিলে মার্টিন ফুলকেরিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে স্খলিত-স্বরে বলে—তুই আমাকে বিয়া করবি না ফুল?

ফুলকেরিয়া হঠাৎ তার গালে চটাস্ করে এক চড় মেরে দেয়। বাপরে বাপরে ক'রতে ক'রতে মার্টিন টল্‌তে টল্‌তে পালায়। ফুল-কেরিয়া খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে।

...পরদিন সকালে আবার দিব্বি ডোকো ঘাড়ে, হাসতে হাসতে, রাজহাঁসের ছন্দে পা ফেলে, বাসন্তিক বাতাসের মত হাল্‌কা গতিতে চলে যায় সে বাগানের পথে। জীবনের পথে।

বাঘের উপদ্রব বেড়ে গেছে কয়েকদিন থেকে। পরশু রাতে ডাক্তার যে ঘরে থাকে সেই ঘরের সিঁড়িতে লাফিয়ে প'ড়েছিলো বাঘ একটা কুকুরের ঘাড়ে। কাল রাতে ম্যানেজার বাবুর গোয়ালে একটা বাছুরকে মেরে রেখে গেছে। আজ একটি লোক জখম হ'য়েছে।

ডাক্তার শিকারে গেছে। বনানী আশঙ্কায় জেগে থাকে। রাত বারোটা, একটা, দুটো......

আজ তার ভোল একেবারে পাল্টে গেছে। মুখে ব্যস্ততা, উদ্বেগের সাথে হাসি খুসী ভাব। দেহে তৎপরতা।

ডিরেক্টার বাবুরা এসেছেন। বাগানে ভয়ানক একটা সসব্যস্ততা। ছুটতে ছুটতে কতবার যে আজ কাছা খুললো সুধীরদার। তাঁর চোখের মণি যেন আজ চোখে নেই, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। উঁচু স্তরের বাবুদের অনেকেরই ইন্‌স্‌পেকসান্ বাংলো-মুখো ঝোঁক। যাওয়া আসা লেগেই আছে। ইন্‌স্‌পেকসান্ বাংলোর রান্নাঘর থেকে নানাবিধ সুমিষ্ট গন্ধ উঠছে। আজ লোকনাথন্-এর কদর বেড়েছে। লোকনাথন্ তার ধবধবে ফরসীটা বের ক'রে প'রেছে।

নতুন ডাক্তারের সাথে পরিচয় হ'লো ডিরেক্টারদের। ডিরেক্টারদের কে কতখানি খোসামোদ ক'রবে তারই পাল্লা লেগেছে বাবুদের মধ্যে। যে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না, সে সিগারেট কেসটা, জলের মগ্‌টা এগিয়ে দিচ্ছে। অনাবশ্যক হ'লেও খাবারের ডিসটা মাঝপথে লোকনাথন্‌এর হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে। রমেশের তৎপরতা আজ সবচাইতে বেশী। উৎসবে আর উল্লাসে, শীকারে আর বিকারে দেবগণের মর্ত্যের ক্ষণিক অবস্থান সার্থক হলো। মুনাফার বিপুল প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিপুল দেহভারগুলিকে কোন রকমে দামী দামী মোটরে গুজে তাঁরা স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন। তাঁদের মোটরের ধূলো না মিলাতেই দেখা গেলো এলিজাবেথ তাঁদের উচ্ছিষ্ট পাউরুটির টুকরো কোত্থেকে যোগাড় করে মহা উল্লাসে যাচ্ছে আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছে আর ব'লছে, ভগবান এমন রুটির টুকরো যদি রোজই পেতাম।......

এলো ডিসেম্বর। শীত জাঁকিয়ে প'ড়েছে। হাড়ের মধ্যে যেন শীতের আবাস এখানে। পাহাড় একটু আধটু লালচে মারছে। বোধ হয় শিউলীর মত তুষার ঝ'রছে পর্বত চূড়ায়। উদয় আলোয়

হয়েছে তুষার। হঠাৎ একদিন এক উজ্জল প্রভাতে হিমালয় স্বর্ণমুকুট প'রে সামনে এসে দাঁড়ায়। ডাক্তার অপূর্ব বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখে। দিগন্ত জোড়া রাশি রাশি সোনার মুকুট-স্বর্ণাভ, গোলাপী, কোথাও বা দুধে আলতার রং।

বনানী তখন বাগানের লালচে কাঞ্চন-ফুল এক থোকা মাথায় গুঁজে, এক থোকা হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। ব'লে—বলুন তো কি ফুল এটা?

—আমি ডাক্তার! হেসে বলে সে।

—বারে, ডাক্তার হ'লে কি ফুলের খোঁজ রাখে না?

—আমাদের দেশে রাখে না!

—কেন, আমাদের দেশ কি সৃষ্টিছাড়া?

—আপাততঃ। চাপা হাসি ডাক্তারের ঠোঁটে।

—আপনার কথাবার্তা বুঝি নে আমি—কেমন হেঁয়ালি লাগে। ঠোঁটটা একটু উল্‌টায় সে। ছায়া নামে মুখে। আবার আলোয় উছল্ হয়ে ওঠে তক্ষুণি। বলে, এই ফুলটার ইংরেজী নাম কি জানেন! উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা না ক'রেই বলে—বোহেমিয়ান্, দাদা বলেছে। যাই, বাবা আবার ডাকাডাকি আরম্ভ ক'রবে—পড়তে বসিনি —এক ছুটে ধপ্ ধপ্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ওপরে পৌঁছয়— চীৎকার ক'রতে ক'রতে যায়—মাদার! মাদার! তুমি কোথায়? আমার ওষুধ দাও।

মাষ্টারমশাই সেদিন পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে ছাত্রীদের কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাচ্ছিলেন। এই দিনটির জন্যে বহুদিন ধ'রে অপেক্ষা ক'রছিলেন তিনি। উচ্ছ্বসিত অঞ্জু—মঞ্জু। কাঞ্চনজঙ্ঘার গোলাপী ছায়া যেন তাদের চোখে। ফার দেওয়া নেভি-ব্লু গরম কোট তাদের গায়।

মাষ্টারমশাই আজ ছাত্র হ'য়েছেন ছাত্রীরা হয়েছে মাষ্টার। এমনি ক'রে পড়ান তিনি মাঝে মাঝে। ছাত্রীরূপী এক নং মাষ্টার জিজ্ঞেস ক'রছে তার ছোট্ট ছোট্ট রাঙা ঠোঁট নেড়ে—আচ্ছা বলতো, হিমালয়ের কতগুলো শৃঙ্গ আছে ?

মাষ্টাররূপী ছাত্র না জানার ভান করে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে, মাথায় হাত বুলায় আর বলে—ক'টা যেন, ক'টা যেন। আপনি বলুন তো।

খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে ওটে ২নং মাষ্টার। বলে, বা, আমরা ব'লবো কেন। তুমিই তো বলবে—তুমি তো ছাত্র—আমরা তো মাষ্টার! কচি গাল দুটো তার হাসিতে টোল খেয়ে যায়। আর একজনের চিবুকটা আর একটু ছুঁচলো হ'য়ে ওঠে। ১নং মাষ্টার বলে—হিমালয়ের দু'শোটা শৃঙ্গ তাও জানো না! আজ তোমার পড়া হয় নি—গম্ভীরভাবে বলে সে।

এইবার ২নং মাষ্টার প্রশ্ন করে—বিড়াল ছানাকে ছানা বলে কেন ? ছানার মত খেতে নাকি ? বহু কষ্টে ধরে রাখা গাম্ভীর্য ফেটে চৌচির হ'য়ে যায় তার।

ম্যানেজার বাবু পেছনে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। ডাক্তার মজা দেখছিলো। ঘাড়টা কাৎ ক'রে, হেসে ম্যানেজার বাবু বলেন, ইস্‌ মাষ্টারমশাই দুটোর বয়েস কত? চুলে যেন পাক ধ'রেছে। ডাক্তারের দিকে ফিরে বলেন—মাষ্টারমশাইএর পড়াবার কায়দা বড় চমৎকার। আমার সৌভাগ্য যে এমন মাষ্টার পেয়েছি।

রেডিওতে বাংলা খবরের সময় হওয়াতে ম্যানেজার বাবু সসব্যস্তে দৌড়লেন। মাষ্টার মশাই ব'ললেন—একটা মজা দেখবেন ?

ডাক্তার বলে—কি ?

—একটু এগিয়ে আসুন। আচ্ছা, মঞ্জু বের করতো গ্লাস্‌গো।

হঠাৎ অঞ্জু আর মঞ্জুতে ম্যাপখানা নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। দুজনেই একই সঙ্গে একই জায়গায় চট্ ক'রে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। অঞ্জু আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে খুসী হয়ে বলে—এই জায়গায় দাদা থাকে রে। মঞ্জু ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কোঁচা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বলে—কাকু, দেখবে এই জায়গায় আমার দাদা থাকে। দাদার আসতে আর দশ মাস দেরী বাবা ব'লেছে। দাদার জন্যে আমি কত কাঁদি।

মাষ্টার মশাই ব'ললেন—এইবার দেখবেন। আচ্ছা বের করো তো বঙ্গদেশ—তুমি অঞ্জু।

অঞ্জু ইংলণ্ডের ম্যাপের মধ্যেই বাংলাদেশ খুঁজতে আরম্ভ ক'রলো। —দেখুন। ব'লে মাষ্টার মশাই হাসতে লাগলেন। তার গালে একটা ঠোনা মেরে ব'ললেন—বোকা, নিজের দেশ বের ক'রতে পারো না—আর—

বনানী এই সময়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। মঞ্জু কাঁদো কাঁদো হ'য়ে দিদির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার নীল কল্কাপেড়ে সাড়ীর আঁচল ধরে ব'লে—ছোড়দি। ওর মুখের চেহারা দেখে সবাই হেসে ওঠে। এই সময়ে দুচারজন ভদ্রলোক ঢু'কতেই আপাততঃ ক্লাশ শেষ হয়ে যায়। মাষ্টার মশাই বলেন, ছোড়দির আঁচলের তলে লুকোলে হবে না—এদিকে এসো। তুমি না আজ মাষ্টার।

বনানী হেসে বলে—মাষ্টার কি রকম?

মাষ্টার মশাই বলেন—হ্যাঁ, আজ ওরা দুজন মাষ্টার আর আমি ছাত্র।

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বনানী বলে—তাই নাকি রে অঞ্জু? তাহ'লে তো আজ বড় মজা, তুই তোর ছাত্রকে আচ্ছা করে ব'কে দিবি তা'হলে—বুঝলি।

অঞ্জু দিদির আঁচলের তলে মহাখুসী।

মাষ্টার মশাই-এর সাথেই বনানী এইরকম নানা কথাবার্তা ব'লে যায়। ডাক্তারের উপস্থিতিই যেন সে স্বীকার করতে চায় না। তার দিকে একবার চায় না পর্যন্ত। ডাক্তার আড়ষ্টভাবে ব'সে থাকে। হঠাৎ অন্দর মহল থেকে ডাক আসে—অঞ্জু-মঞ্জু বনা ওষুধ খেয়ে যাও। সবাই পড়িমরি করে ছোটে। যাবার সময় বনানী একবার কটাক্ষ ক'রে যায় ডাক্তারের দিকে চেয়ে। ওর হাবভাব বোঝা ডাক্তারের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। ভাবে, বড় মানুষের মেয়ে!

শীতের শেষ দিকে লেবার কমিশনার এলেন বাগান পরিদর্শনে। তাঁর আসার আশঙ্কায় বেশ কিছুদিন থেকেই বাগানে তোরজোড় চলছিলো। সারাটা বাগান তিনি ঘুরে দেখলেন। পথের ধারের চাটাই দিয়ে ঘেরা জলের ট্যাপ্‌গুলির দিকে চেয়ে অনুসরণরত বাবুদের দিকে ফিরে মন্তব্য করেন তিনি—মন্দ করেন নি এটা, তবে একটু নতুন নতুন মনে হচ্ছে যেন। মুখ টিপে হাসলেন তিনি। সে হাসিতেই সুধীরদার প্রাণ উড়ে যায়। মাথা চুলকাতে চুলকাতে আমতা আমতা করে কি যেন ব'লতে যান তিনি—ম্যানেজার বাবু কি একটা যুক্তি দিয়ে তাকে বাঁচান। বাবুদের কোয়ার্টারের দিকে চেয়ে ষ্টিক্ উঁচু ক'রে নির্দেশ ক'রে কমিশনার বলেন—কুলি কোয়ার্টার না?

বিরক্তভাবে ম্যানেজার বাবু বলেন—না, বাবুদের কোয়ার্টার। ঠোঁট দিয়ে তির্যকভাবে বয়ার পাইপের এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে তিনি ব'লে ওঠেন—ফিউ!

ম্যানেজারের কোয়ার্টারে ঢুকতে ঢুকতে কমিশনার অপাঙ্গে একবার সমগ্র বাংলোর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে মন্তব্য করেন, বাঃ, আপনার

বাংলোটি তো চমৎকার! হেসে বলেন, বাবুদের অমন কোয়ার্টারে রেখে আপনার তো এমন কোয়ার্টারে থাকা শোভা পায় না।

বাবুদের মুখে চোখে একটু রক্তোচ্ছ্বাস দেখা যায়। ম্যানেজার বাবুও হেসে উত্তর করেন, লেবার কমিশনার হয়ে এসে আপনারও তো মজুর বস্তীতে ওঠা উচিত ছিলো। পোলাও মাংস না খেয়ে বস্তীর পান্তা ভাত খাওয়া উচিত ছিলো। সাহেব সশব্দে হেসে কোঁৎ ক'রে কথাগুলো গিলে ফেলেন। বাবুরা ম্যানেজারের সাহসে অবাক এবং ততোধিক খুসী হন।

•

ফাল্গুন এসেছে। এনেছে বসন্ত। বিশ্বজোড়া একটা জড়তার আবরণ অপসারিত হ'য়ে যেন একটা হাল্কা দেহ যৌবনশ্রী মণ্ডিত, গন্ধস্নিগ্ধ তরুণীর আবির্ভাব হ'য়েছে। মাঠে মাঠে যেন তার হাল্‌কা পায়ের রক্তছাপ। মাধবী বাতাশে তার স্বপ্নমদির গন্ধ। প্রকৃতির গায়ে যেন রঙীন বরণ। সমগ্র প্রকৃতি যেন এক কুঁচ্‌বরণ কন্যা।...ইউক্যালিপ্‌—টাসের মর্মরিত পাতায় বাসন্তিক হাওয়ার দোলা লেগেছে। তন্বী মেয়ের আলুলায়িত কেশের মত তার পাতার স্তবকে স্তবকে নিবিড় উদাসীন ভাব। তার তেলোসিক্ত পাতায় পাতায় লেবুর গন্ধ। সেই লেবু গন্ধ মেখে বাতাস ছুটেছে বাসন্তিক উৎসবে। ফুল যেন তার প্রেমিকা। ভ্রমর যেন তার বাউল। সেই বাউলের সুরে সুরে, উতলা ফুলে ফুলে বাতাস কাঁপন তুলেছে—যেন প্রথম প্রেমের শিহরণ।

বসন্ত যেন রূপায়িত হয়েছে আজ বনানীর দেহে। অপরূপ সাজে সেজে সে মোটরে উঠে ব'সেছে! ডাক্তার বাগানের প্রান্তে এক কঠিন নেপালী রোগীকে দেখতে যাবে। বনানী চালাবে মোটর।

মোটরে ষ্টার্ট পড়ে তবু মোটর এগোতে চায় না। ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌ ভট্‌ ক'রে অতি দ্রুত গুলি ছোঁড়ার মত শব্দ উঠছে গ্যাসোলিনের

পাইপ থেকে। গ্যাসোলিনের ঝাঁঝালো গন্ধ বনানীর চুলের গন্ধকেও ছাপিয়ে উঠেছে। ইঞ্জিনীয়ার বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশেই। বললেন, হয় পেট্রোল পৌঁছচ্ছেনা অথবা এতই পৌঁছচ্ছে যে misfire হ'য়ে যাচ্ছে। বলবন্ত সিং ঠাট্টা করে বলে, এবার হেরে গেলে বনা। হঠাৎ মোটর এগোতেই বনানী ঘাড় বেঁকিয়ে বলে, ইস্! ডাক্তারকে বলে, দেখি, কেমন শিখেছেন বলুন্ তো পাশে বসে।

ডাক্তার মাথা চুলকিয়ে বলে, সব ভুলে গেছি আবার। ও আমার মনেই থাকে না। অথচ ডাক্তারীর মোটা মোটা বইগুলো মুখস্থ করেছি আগাগোড়া।

তাঁর আনাড়ীপনা লক্ষ্য করে বনানী বলে—নাঃ, আপনাকে দিয়ে হবে না দেখছি। এই দেখুন এবার ভালো করে বুঝবেন কিন্তু—বলে চাপা হেসে সে দেখাতে থাকে এই দেখুন, এই clutch আছে না, ওটায় চাপ দিয়ে মোটরের unity divide করলাম। ছেড়ে দিলে সমস্ত part-এর সঙ্গে মোটরের যোগাযোগ হয়ে যায়, তখন গাড়ী চলে। অবশ্য সবচেয়ে প্রথমে switch on করতে হয়। তবে gear neutral রাখতে হবে আগে থেকেই। gear তিনটি আছে। ক্যাচখটাং করে Ist gear টেনে সে বলে—এই দেখুন Ist gear টানলে speed জোড় হয়। গাড়ী মাল টান্‌তে Ist gearএর দরকার। এই দেখুন, এটা axelerator, এটাতে যত চাপ দেবেন তত speed বাড়বে—বলেই সে তার হাই হিল্ ওয়ালা জুতোর আগা দিয়ে পায়ের মত একটা যন্ত্রে চাপ দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে মোটর ছুটে চলে। বনানীর চূর্ণ কুন্তল হাওয়ায় দোলে লতার মত। ডাক্তার খুসী হয়ে বলে হ্যাঁ, এইটেই একমাত্র ভালো করে বুঝতে পেরেছি আমি। আচ্ছা, সরো তো দেখি বলেই সে পা দিয়ে চাপ দিতে যায় সেটায় এবং

বনানীর পায়ের সাথে পায়ের স্পর্শে শিহরণ অনুভব করে সারা দেহে।

নীলাম্বরী সাড়ীর মত আকাশ মাথার ওপরে ঘুরছে। শিরীষ গাছগুলো বন্ বন্ করে ছুটে যায়। নতুন গজানো চায়ের সবজে পাতা অপলক চোখে চেয়ে থাকে। বাগানের শেষ প্রান্তে মোটর থামে। নির্জন সীমান্তে একখানা নিঃসঙ্গ কুটীর। বাগানের নেপালী চৌকিদার বীর বাহাদুর থাকে এখানে। বাঁশের ঝোপের শব্দ হয় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ হিস্ হিস্। তারই সাথে সুর মিলিয়ে কে যেন গান করে—

শাক্‌ছো শায়লি
শাক্‌ছো মায়লি
রায়ো কোপি শাক্‌ছো
পরে হোলা চামার হোলা
তিস্র মায়া লাগ্‌ছ।

ডাক্তার উঠোনে পা দিতে দিতে বলে—আরে বীর বাহাদুর যে গান করতে লেগে গেছো দেখছি! ব্যাপার কি। আমি আরও ভাবতে ভাবতে আসছি।

—সেলাম হুজুর। ব'লে বীর বাহাদুর দুর্বল পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বিনয়ের হাসি দিয়ে ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করে। ভদ্রঘরের মেয়েকে দেখে সসব্যস্তে ছোট্ট টুলটা এগিয়ে দেয়। কিন্তু কেউই বসে না। ডাক্তার মুচকি হেসে বনানীর দিকে চেয়ে বলে—দেখো, বসন্ত রোগীকেও কবি বানিয়েছে। পরশু পর্যন্ত দেখেছি লোকটার কঠিন অবস্থা, নড়তে পারে না।

ষ্টেথিস্কোপ্ দিয়ে বীর বাহাদুরের বুক ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তার বলে—না, বুকটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এম, বি ট্যাবলেটের আশ্চর্য গুণ!

মাটির দাওয়ায় বসে বীর বাহাদুরের বৌ 'গোরাংলা' কুট ছিলো। ফর্সা, বেঁটে, চুল ছোট করে ছাঁটা একজন লোক একটা ছোট্ট মেয়ে কোলে এসে দাঁড়ায়। বনানী উৎসাহের সাথে ব'লে ওঠে বাঃ, কি সুন্দর মুখখানা মেয়েটির! ওকে কোলে নেবার জন্যে এগিয়ে দেয় হাত দুখানা। মহাসঙ্কোচে লোকটা ওকে দেয় বনানীর কোলে। ডাক্তার মুখ টিপে হেসে বলে—তোমার বাবা টের পেলে কিন্তু—

—বেশ! ব'লবে তো ব'লবে—ব'লেই সুললিত ছন্দে একবার দোল খেয়ে ওকে চায়ের ছোট চাড়াগাছের ক্ষেতের দিকে নিয়ে যায়। বদেলার সাদা সাদা ফুল দেখিয়ে বলে—ওই দেখো ফুল কেমন সুন্দর না? ছোট্ট মেয়েটি এমন আশ্চর্য মেয়েছেলে তার জীবনে দেখেনি বোধ হয় কোনদিন তাই, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

একটু পরেই হঠাৎ বনানীর চীৎকার শোনা যায়—কাকু। দেখবেন আসুন্ কি সব কাণ্ড এখানে। ডাক্তার যায়। সেই লোকটিও ডাক্তারের অনুসরণ করে।

ডাক্তার দেখে একটা জায়গায় গাছের সরু ডাল দিয়ে খোপ খোপ করে কয়েকটা খেলা ঘরের মত ঘর তৈরী করা হয়েছে—ছাদ নেই অবশ্য। চারটে খোপ। প্রতিটি খোপে শুক্‌নো কলার পাতা। তার ওপর রক্তের দাগ। তার ডান্ ধারে ধারে আবার একটা ক'রে শুক্‌নো কলা পাতার ফালি তাতে পোড়া কয়লা। দারুণ কৌতূহলী হয়ে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে লোকটাকে—এটা কী রে?

ও হিন্দীতে যা বলে তার মর্ম হচ্ছে—ওটা হচ্ছে ওদের নয়া খাওই উৎসব। নতুন ধান হবার পর এই উৎসব করতে হয় ওদের। দেবতাকে পুজা করা হয়েছে ধান যাতে প্রতি বছর ভালো হয় তার জন্যে প্রার্থনা করে। পান, সুপারী, ধান, লঙ্কা ইত্যাদির সাথে মুরগীর রক্তও লাগে।

লোকটা কথায় কথায় আরও বলে, বীরবাহাদুর হচ্ছে ওর মামা। এই নয়া খাওই উৎসবে আসবার জন্যে ওকে নিয়ে এসেছে দার্জিলিং থেকে। ওদের গ্রাম হচ্ছে নেপালের চাদরা বস্তীতে। মেয়েটি হচ্ছে ওরই মেয়ে। নাম নেপ্‌টী।

জাগাটী বড় চমৎকার। গভীর নির্জনতায় ঘেরা। উদাসীপাখী ডেকে যায় একটানা। কত রকম রঙীন্ বুনো ফুল রঙ্গীন্ পোষাক পরে বসন্তকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। বাঁশের ঝোঁপ তাদের সে সৌন্দর্য দেখে নিঃশ্বাস্ ফেলছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমন জায়গায় থাকে নেপালী চৌকিদার বীরবাহাদুর। বাগান পাহারা দেয় সে। কলার কাঁদি ডাঁসা হলে বড় বড় বাবুদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসে। নেপ্‌টীদের মত মেয়েরা তাকিয়ে থাকে সে কলার পানে।

বসন্তের বার্তাবহ কোকিলের মত গাছ থেকে গাছে, ঝোপ থেকে ঝোপে ছুটে বেড়ায় বনানী। কোন গাছের ফুল শোঁকে, কোন গাছের ফুল মাথায় গোঁজে। অপরূপ ছন্দের ঝিলিমিলি তুলে বার বার বলে, আঃ, কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! সুরের গুঞ্জন ওঠে তার গোপালের মত ঠোঁটে। অনেক ক'রে তাকে মোটরে উঠাতে হয়। মোটর ছোটে শিরীষের ছায়ায় ছায়ায়। পাখীর কাকলিতে মুখরিত সে পথ।

সে পথ জ্যোছনা আলোকিত, ছায়া খচিত—আলোছায়ার এক বিচিত্র আলিম্পন রহস্যে নিবিড়। এ্যাক্সিলিরেটারে যতদূর সম্ভব চাপ দেয় বনানী। হাওয়ার মত উদ্দাম গতি হয়ে ওঠে মোটরের। সে গতি যেন কোন নব যৌবনোচ্ছল তন্বী তরুণীর দেহ ও মনের গতি। চারিদিকের দিকে বনানীর যে দৃষ্টি ফিরছে সে দৃষ্টি স্বপ্নমদির, কিসের নেশায় ডগমগ। প্রাত্যহিকতার বহু উর্দ্ধে সেটা। ডাক্তারকে বলে, কাছে সরে আসুন, কথা বলি।

নেশাচ্ছন্ন ডাক্তার সে আহ্বানে যন্ত্রের মত সাড়া দেয়। কি এক অনাস্বাদিত জীবনের মধুর দোলা লেগেছে ডাক্তারের সমগ্র সত্তায়। গাছপালা, মাটি তাদের স্থূল সত্তা হারিয়ে ফেলেছে ডাক্তারের কাছে —তাদের আছে শুধু রং, আছে আলো, ছায়া, গন্ধ, শব্দ।

বনানী একঝলক আড়চোখে ডাক্তাররের দিকে চেয়ে বলে—আর এ রাত্রির যদি শেষ না হয়, এ পথের যদি অবসান না হয়, অনন্তকাল ধরেই যদি আমরা দুজনে এমনি চলি? পৃথিবীর রূপ আর বনানীর রূপ উভয় রূপে উদ্‌ভ্রান্ত অথচ কঠোর জীবন সংগ্রামে আত্মসংহত ডাক্তার বলে—চলাটাই যে জীবনের সবচাইতে সত্যি বনা (এই তার প্রথম বনা বলে সম্বোধন)—আমরা যখন বসে আছি তখনও তো চ'লেছি।

—কিন্তু সব চলাই কি একরকমের সত্যি। সব চলার ছন্দই কি এক? এমন রাত্রি আর এমনি পরিবেশের মধ্যে আমাদের দুজনের এই যে চলা অসীম কালের বুকে এরও কি নজীর থাকবে?

—থাকবে কিনা জানিনে, কটা জীবনেরই বা আমরা খবর রাখি?

বাঁ ধারে মোড় নিতে নিতে বনানী হঠাৎ বলে ওঠে—আচ্ছা কাকু কোন মেয়েকে কোনদিন ভালোবেসেছেন?

বনানীর এই অতর্কিত প্রশ্নে ডাক্তারের দেহে যেন উষ্ণ রক্তস্রোত চন্‌চনিয়ে ওঠে। আজকের বনানীকে তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। কিছুদিনের তার সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং অনুমান যেন রূপ ধরতে চাইছে আজকের এই মায়াবী রাত্রির ছোঁয়ায়। কি উত্তর দেবে সে এমন প্রশ্নের? কোনরকমে বলে ফেলে—না। সঙ্গে সঙ্গে বনানী বলে—তাহলে আমার আজকের কথাটার অর্থ ঠিক আপনি ধর'তে পারবেন না। যাক আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি আর চাইনে, জবাব মিলে গেছে। ব'লেই সে মুখ ঘুরিয়ে

ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে স'রে বসে। ডাক্তার ওর এই হঠাৎ ভাবান্তরের কারণ বুঝে উঠতে পারে না। মোটর ফেরে, মোটরের আবহাওয়া হঠাৎ স্তব্ধ, থমথমে হ'য়ে ওঠে।

বাসার সামনে মোটর এসে থামতেই ফুলকেরিয়া এসে হাউমাউ ক'রে কেঁদে পড়ে ডাক্তারের পায়ে—ডাগদর বাবু, মার্টিন খুব জখম হইছে, আপনি শীগগির চলুন, না হ'লে মার্টিন বাঁচবে না!

ওকে আশ্বাস দিতে দিতে ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালের দিকে চলে। গিয়ে দেখে মার্টিন চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে একটা বেডে—জ্ঞান তখনো আসেনি। ওর হার্টের অবস্থা এবং অন্যান্য সব পরীক্ষা করে ডাক্তার বলে—না, ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তারের পরীক্ষার সময় ফুলকেরিয়া তার দিকে ভয়ত্রস্ত, শঙ্কিত, ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়েছিলো। ডাক্তারের কথা শুনে সে মস্ত একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। অনুসন্ধানে জানা যায় ফুলকেরিয়া যখন কুলিদের কথিত 'উইদিং' (writhing) ঘরের ফোঁকর গলিয়ে রোলিং মেসিনের ওপর পাতি গড়িয়ে দিচ্ছিলো তখন মাথার ওপরে দাঁড়ানো অদৃশ্য ফুলকেরিয়ার সংগে রসিকতা করতে গিয়ে রোলিং মেসিনের ধাক্কায় মার্টিন আহত হয়।

কাজকর্ম ক'রে হাঁসপাতাল থেকে ফিরতে ডাক্তারের অনেক রাত হয়। রাতে ডাক্তারের আদৌ ঘুম হয় না। সারারাত এপাপ ওপাশ করে। মায়াবী জ্যোছনা রাত তার মনের তারে যে দীপক রাগিনী সৃষ্টি ক'রেছিলো কোন মেঘমল্লার তাকে নিভাতে পারে না। কত চিন্তা, কত সংশয় আর সম্ভাবনার তরঙ্গদোলায় তার চিত্ত উৎক্ষিপ্ত বিক্ষপ্ত হতে থাকে। বনানীর কথাগুলি অনবরত তার মনে ওঠাপড়া করে। কিসের একটা দূরাতীত ইঙ্গিত তার সমস্ত দেহে-মনে-আত্মায় শিহরণ তোলে। উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত ক'রে তোলে তাকে। তাহলে

বনানী কি সত্যিই তাকে ভালবাসে? ওর সমস্ত কাজকর্ম, ভাব-ভঙ্গী-ইঙ্গিত তার মনে মনে যে অস্পষ্ট সন্দেহের মায়াজাল রচনা করেছিলো, আজ এই নিস্তব্ধ জ্যোছনা রাতের মোহনস্পর্শে তা যেন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে? একথার স্পষ্ট উত্তর দেবার দুঃসাহস তার নেই। কিন্তু অস্বীকারই বা করে কি করে? ভালবাসা, এই একটি শব্দের মর্মর প্রাসাদে পৃথিবীর কি অনির্বচনীয় সুধা, সুষমা, স্বপ্ন, সৌরভ লুকানো রয়েছে। এই ভালবাসা পাত্রাপাত্র ভেদ করে না, মাত্রার অপেক্ষা রাখে না, অবস্থার তারতম্যের হিসাব করে না। পাহাড়ী ঝর্ণার মত রঙিন গতির নেশায় পাগল হ'য়ে এ ছোটে—তালে তালে, ছন্দে ছন্দে। তাই একদিকে ডাক্তারের মন যখন ব'লছিলো—এও কি সম্ভব, আমার মত একটি দরিদ্রের রাজকন্যার লোভ? এও কি হ'তে পারে তার মত রাজকন্যার পক্ষে···? তার বুদ্ধি বোঝে—এ রঙীন মোহ, দুদিনেই এর অবসান—সূর্যালোকের বন্যায় রঙীন কুয়াসার অন্তর্ধানের মত। কিন্তু তার মোহ তার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। সেই ঘুম পাড়ানির গান শুনতে শুনতে ডাক্তার ঘুমাবার চেষ্টা করে—কিন্তু 'সরোবরের স্ফটিকস্তম্ভে বন্দী' ঘুমের দেখা নেই। বস্তীর প্রান্ত থেকে সাঁওতালী মাদলের বোল উঠছে—

ঘুম ঘুম ঘুমাও
খুব ঘুম ঘুমাও
ও আমার যাদুরে;
ঘুম ঘুম ঘুমাও
খুব ঘুম ঘুমাও
ও আমার সোনারে!

কিন্তু ডাক্তারের ঘুম আসে না, কেমন এক সুখতন্দ্রার সুরভিত বিস্মরণের রাজ্যে সে তলিয়ে যায়।.........

এর পরে পর পর কয়েকটি ঘটনায় বাগানের বৈচিত্র্যহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো।

প্রথম ঘটনাটি হ'চ্ছে, ম্যানেজার বাবুর কাছে নীল্‌চে এরোপ্লেনের ছবি দেওয়া একখানা চিঠি এসে পৌছায় একদিন—তাঁর বড় ছেলে তরুণ পরের জাহাজেই আসছে। আনন্দে উত্তেজনায় সারা বাড়ী মুখর। কি ভাবে তাকে অভ্যর্থনা করা হবে তাই নিয়ে মা বাবা ভাই বোনে রীতিমত উত্তেজিত আলোচনা। অবশেষে একদিন তরুণ সত্যিই এসে উপস্থিত হয়—সুটকেস হাতে খদ্দরের পাঞ্জাবী-পরা ঢ্যাঙা ফুটফুটে একটি যুবক। বাপ-মাকে সামনে দেখেই সে সুটকেসটা রেখে হাত বাড়িয়ে দিলো পায়ের দিকে। বাপ মা একটু অবাক হলেন, খুসীও হলেন। নিবিড় আনন্দে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আলিঙ্গন মুক্ত হ'য়ে নিজের বিশাল সুটকেসটা কাঁধে ফেলে যখন সে ওপরে উঠতে উদ্যত হলো তখন ম্যানেজার বাবু স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলে উঠলেন—করিস্ কি তরুণ, রাখ রাখ—এই মার্টিন, এই এতোয়া, তুম্‌লোগ.........

অত্যন্ত সহজভাবে এগোতে এগোতে তরুণ বলে, এতোয়ার প্রয়োজন নেই বাবা। নিজের জিনিষ নিজে নেবো—শ্রমের মর্যাদা তো তুমিই শিখিয়েছিলে বাবা। বিলেতে সে ভাবটি পুষ্ট হ'য়েছে মাত্র।

নির্বাক ম্যানেজার বাবু ভাবলেন, ছেলেটা কেমন যেন খাপছাড়া হ'য়ে এসেছে। লোকনাথন কিন্তু মহা খুসী। আজ একজন খাঁটি

বিলাত ফেরৎকে সে তার রান্না খাওয়াবে। গায়ে উঠেছে তার ফর্সী, মুখটা আনন্দে ডগমগ। তার রান্নার কদর বুঝতে পারে এমন একজন লোকও এ অঞ্চলে নেই। আজ খাঁটি বিলাত ফেরৎ তার এগ্‌পোচ্‌, তার টোষ্ট, পুডিংএর মর্ম বুঝবে।

বাগানের কর্মচারীদের আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে তরুণ সবার সাথে প্রাণ খুলে মিশলো—এমনকি মজুরদের সাথেও। তাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্টের কথা দরদভরে, সহানুভূতির সুরে শুনলো। একটা ছেড়া গেঞ্জী গায়ে, খালি পায়ে বনানীর হাত ধরে কারখানার মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ালো। মুগ্ধ চোখে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে ব'ললো, How lovely! কি নরম ঘাস, কি কোমল মাটি, ওঃ! বিলেতে কিন্তু আমার এতো ভাল লাগতো না, তবে হ্যাঁ, বিলেত না গেলে "এ জন্মের তীর্থভ্রমণ অসমাপ্ত থেকে যেতো"—এক গৌরবময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠভূমি বিলাত।

দুদিন পরেই বাবা ছেলেকে বলেন, কি রে, তুই নাকি বস্তীর দিকে বেড়াতে যাস্?

হ্যাঁ বাবা, Dark Continent Africa দেখে এলাম যেন! ইস্ কি ভাবে বেঁচে আছে ওরা! কিন্তু বাঁচার জন্যে ওদের কোন চেষ্টা নেই, কোন আন্দোলন—

ম্যানেজার বাবু অবাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে চান। শুকনো হেসে বলেন, আন্দোলন হ'লে কি আর তোর বাবার চাকরি থাকবে রে। তুই ওদের সাথে কিন্তু এসব বিষয়ে আলোচনা করিস্ নে বাপু। বস্তীর দিকেই বা তোর বেড়াবার দরকার কি, বেড়াবার কি আর জায়গা নেই? কত সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে আসে পাশে। সে সব জায়গায় ঘুরে বেড়া। কারখানার যন্ত্রপাতিগুলোও তো একটু দেখলে

পারিস্। কোন্‌টা কি বদলানো দরকার, কোথায় মেরামত দরকার, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার বাবু তো ভাল বোঝেন না তেমন—

সহজ হেসে তরুণ বলে—কিন্তু বাবা, তুমিইতো শিখিয়েছিলে, দরিদ্রের দুঃখ বুঝবার জন্যে, তার সুখ দুঃখের সাথে পরিচিত হবার জন্যে—

ম্যানেজার বাবু একটু বিরক্তভাবে বলেন, কিন্তু যে দুঃখ বোঝায় পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনে—কথাটা বলতে গিয়ে থমকে যান তিনি। মোড় ফিরিয়ে বলেন, কিন্তু পৃথিবীতে দরিদ্রের তো আর অভাব নেই তরুণ। ঠিক সেই সময়ে মুন্সী এসে খবর দেয় যে টাকা নিয়ে দুজন লোক এসেছে। ম্যানেজার বাবু একটা জটিল প্রশ্নের হাত থেকে যেন রেহাই পেয়ে বাঁচেন।

বনানীর শারীরিক অবস্থা কিছুদিন থেকে কাহিল হয়ে পড়েছিলো বলে সে মাইল কুড়ি দূরে তার টমকাকার বাগানের একজন ইউরোপীয়ান ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলো। তিনি হচ্ছেন ঐ অঞ্চলের মেডিকেল অফিসার। খুব ভালো চিকিৎসক। সপ্তাহে দুবার ক'রে ইঞ্জেকসান নিতে যেতে হয়। বাগানে জীপ্‌স্ আসার পর যাতায়াতের বেশ সুবিধে হয়ে যায়। সেদিন জীপ্‌স্‌এ চড়ে ওরা চার জন রওনা হয়—ভুটিয়া ড্রাইভার, বনানী, ডাক্তার আর বলবন্ত সিং। বনানীর মোটর চালানো নিষেধ।

ডিমা, কালজানি প্রভৃতি বড় বড় নদী পেরিয়ে গাড়ী ছুটে চলে। চারিদিকে নিস্তব্ধ বনভূমি। নদীগুলোয় শুধুই ধূ ধূ করা তৃষ্ণার্ত গোলাপী বালুচর। দূরে গোধূলির ধূসর ছায়া পাহাড়ে নেমেছে। কেমন গভীর রহস্য ভরা পাহাড়। ভুটিয়া ড্রাইভার উদাসী দৃষ্টি মেলে মাঝে

মাঝে বিশেষ একটা শৃঙ্গের দিকে তাকাচ্ছে। ওইখানে তার ঘর। তার মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় একটা কুকুর চাপা প'ড়তে প'ড়তে বেঁচে যায়। বনানী রেগে উঠে বলে—কান্‌সা, কেয়া করতা হ্যায় ?

এইবার রেললাইন আর মোটরের রাস্তা পাশাপাশি। রাস্তার মোড় ফিরতেই দেখা যায়, ট্রেন চলেছে। ডাক্তার তার শিক্ষানবিশী বিদ্যার মিথ্যা প্ররোচনায় ষ্টিয়ারিংটা ধরে বাঁ ধারে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসে সিট্ বদলে। মোটর ছুটে চলে পথের ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। মোটর ট্রেনকে ছাড়িয়ে যায়। উৎসাহ উদ্দীপ্ত ডাক্তার ষ্টিয়ারিং চেপে বসে আছে। অবসাদগ্রস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠে বনানী প্রদীপ্ত উৎসাহে হাততালি দেয়। ইঞ্জিনের ড্রাইভার এইবার ব্যাপারটা টের পেয়েছে। জীপের সুন্দরী তরুণীকে দেখে ফায়ারম্যান্ আর ড্রাইভারের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ফায়ারম্যান্ ড্রাইভারের কানে কানে কি বলে। ইঞ্জিন ফুঁসে উঠে। ট্রেনখানা এগোতে আরম্ভ করেছে। গাড়ীর লোকেরা দারুণ উত্তেজনাভরে এই প্রতিযোগিতায় সক্রিয় অংশ নিচ্ছে। এমন কি স্ফিংস্এর মত রহস্যময় মুখ, ছাগলের মত দাড়িওয়ালা ভুটিয়া প্যাসেঞ্জাররাও জানালা দিয়ে মুখ অনেকটা বাড়িয়ে হলুদ দাঁত বের ক'রে হাসছে। ট্রেনটা মোটরকে পেছনে ফেলে যায়। প্যাসেঞ্জারেরা হাততালি দিতে আরম্ভ করে। বনানীর মুখটা কালো হ'য়ে যায়। স্থান কাল পাত্র সব ভুলে গিয়ে ডাক্তার প্রাণপণে এক্সিলরেটরএ চাপ দিতে থাকে। গাড়ী থর থর ক'রে কাঁপছে। ট্রেন ধরি ধরি করেও ধরতে পারে না। আর একটুক্ষণ এইভাবে চললে কি হতো বলা শক্ত—হঠাৎ শূয়োরের মাংস বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে আসা একটা লোককে বাঁচাতে গিয়েই জীপ্ নিমেষে উল্টে গিয়ে পড়ে বাঁ ধারের খাদের মধ্যে।

নিমেষের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন ওলোটপালোট হ'য়ে গেছে। একটু প্রকৃতিস্থ হবার পরে বনানী দেখে ডাক্তার এক প্রান্তে প'ড়ে আছে। মাথা রক্তে লাল, সংগাহীন। দেখেই তারও যেন সংগা হারাবার উপক্রম হয়। চীৎকার ক'রে ওঠে সে, যেন বিকারের রোগী। হঠাৎ কোত্থেকে যেন তার সাহস ফিরে আসে। সে ভাবে, এই সময় তাকে বিহ্বল হ'লে চ'লবে না। অতগুলো লোকের প্রাণ তার হাতে। বলবন্তসিং তখন গোঙাচ্ছে। ভুটিয়া ড্রাইভারটা অক্ষত আছে কিন্তু ভয়ে সে আধমরা। একটু সামলিয়ে নিয়ে বনানী ছোটে ডাক্তারের কাছে। রক্ত দেখে এবার আর সে বিহ্বল হয় না। সে তার মূল্যবান সাড়ীর এক প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলে এবং তাই দিয়ে কোন রকমে ডাক্তারের মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে দেয় ড্রাইভারের সাহায্যে।

এসব শেষ ক'রতে তার বেশী সময় লাগে না। অনেকগুলো লোক জমে গিয়েছিলো দেখতে দেখতে। তাদের সাহায্যে ডাক্তার আর বলবন্তসিংকে সেই মোটরে উঠান হয়। ভয়ে ও বিস্ময়ে ভুটিয়া ড্রাইভার বনানীর আদেশ পালন করে।

মোটরে ষ্টার্ট দিয়েই একেবারে ফার্ষ্ট গীয়ারে মোটর তোলে সে। এবার ড্রাইভার সে নিজে। চোখে তার আগ্নেয় দৃষ্টি, চুল ঝোড়ো মেঘের মত আলুলায়িত। হাত-পা কাপড় রক্তসিক্ত। এক হাতে সে ডাক্তারের সংগাহীন রক্ত মাথাটা জাপটিয়ে রেখেছে কোনরকমে। মোটর উল্কা গতিতে ছুটেছে। কাল বোশেখীর মেয়ে যেন মোটরের কর্ণধার। সেই ট্রেনখানা মাঝখানে একটা ষ্টেশনে থেমে আবার চলেছিলো। জীপ্‌কে আসতে দেখে ড্রাইভারও ফ্যায়ারম্যান বিস্মিত হয়ে আবার গাড়ীর গতিবেগ বাড়ায়। কিন্তু কালবোশেখীর মেয়ে কাণ্ডারী। জীপ্ উল্কাগতিতে ছুটেছে।

ধাপে ধাপে মোটর ট্রেনকে ছেড়ে এগিয়ে যায়। অবাক হ'য়ে যাত্রীরা তাকিয়ে থাকে ওই বিস্ময়কর পার্থিব উল্কাটির দিকে।......

ইতিমধ্যে ডাক্তার নিজের বাসা পেলেও বড় বাসাতেই তাকে উঠানো হয়েছে। কয়েকদিন ডাক্তারের অবস্থা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে থাকে। জ্ঞান হয় দিন তিনেক পরে। এই ক'দিন যে কি অসহ্য অবস্থায় বনানীর কেটেছে। মাঝ রাতে উঠেও সে ডাক্তারের ঘরের সামনে পায়চারী করেছে। মুখে ব্যাকুল আশঙ্কার ছায়া। পায়ে লক্ষ্যহীন উদাসী গতি। দৃষ্টি চঞ্চলা, লক্ষ্যহীন, শূন্য। নার্সদের লুকিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে একদিন সে বাবার কাছে ধরা প'ড়ে গিয়েছিলো। বাবা পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় কি মা, কনক সেরে উঠবে—তুইই তো ওকে বাঁচিয়ে তুললি। নির্বাক বেদনায় সে মুখ ঢেকে দাঁড়ায়।

বলবন্তসিংকে পাঠানো হ'য়েছে জেলা হাসপাতালে। তার আঘাত আরও গুরুতর। তার ছোট ছেলে কৃষাণ রোজই এসে খবর নেয়—বাপুজী ক্যাইসে হ্যায় বাবুজী? তার পিঙ্গল, কোমল দীর্ঘ চুলগুলো চারিদিক থেকে গুঁটিয়ে এনে চাঁদির ওপরে স্তূপীকৃত করা—যেন কৃষ্ণ ঠাকুর। কি মায়াময়, কচি তার মুখশ্রী। এই সেদিন মাত্র বলবন্ত-সিং ওকে দেশ থেকে নিয়ে এসেছে। পাঞ্জাবের স্মৃতিতে আজও সে ভরপুর। লুধিয়ানা, অমৃতসরের গল্প কতদিন সে ডাক্তারকে শুনিয়েছে—বঙ্গাল তো পঞ্জাব কো হ্যায়। তুম্ তো পাঞ্জাবী হ্যায়। ওর এক ভাই যে 'ফৌজী' মে কাম করে প্রসঙ্গক্রমে তাও শুনিয়েছে।

দীর্ঘদিন পরে ডাক্তার এবং বলবন্তসিং দুজনেই সেরে ওঠে। এই দুর্ঘটনা যেন বনানীকে ডাক্তারের আরও নিকটে এনে দেয়। ডাক্তারের ভাবান্তর সৃষ্টি হয় গভীরভাবে। দ্বন্দ্বে এবং সংঘাতে, সুখে এবং বেদনায়, আশা এবং নৈরাশ্যে জীবন তার উদ্বেল।......

হঠাৎ একদিন যুগান্তকারী এক ঘটনা ঘটে যায়। যে যুদ্ধ তার অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিলো আনবিক বোমার কালান্তক আঘাতে তাতে একদিন ছেদরেখা পড়ে। যুদ্ধ থেমে যায়। বোমা বিধ্বস্ত কুটীরে, রক্তপ্লাবিত রাস্তায়, অশ্রুসিক্ত লক্ষ কোটি কবরে বিজয়ের বৈজয়ন্তী ওড়ে। মিত্রপক্ষের জয়। কঙ্কালসার ভারতের ক্ষীণ কণ্ঠ, দুর্ভিক্ষ বিধ্বস্ত বাংলার শ্মশান শবের কণ্ঠস্বরও সেই উৎসবের ধ্বনীর মধ্যে মিশবার চেষ্টা করে।

বিজয়োৎসবের শেষ হয় কিন্তু ভারতের বিজয় তখনও বাকী। অজস্র রক্ত ঢেলেছে ভারত কিন্তু রক্তের মূল্য সে পায় নি। আটলান্টিক মহাসাগরে যে মুক্তির পতাকা উড়েছিলো আটলান্টিকের অতলান্ত জলেই তা ডুবে গেছে। তাকে উদ্ধার করার সাধনায় আসমুদ্র হিমাচল মাতে। পাহাড় কাঁপে, নদী ফাঁপে, তরঙ্গ গর্জায়, ভারতের শান্ত তপোবনেও মুক্তির ঝড় ওঠে। এমন ঝড় কেউ দেখে নি। চীনা টাইফুন্‌ও তাকে দেখে বিবরে লুকোয়। এমন কাঁপন কেউ অনুভব করে নি। রক্তক্ষয়ী পম্পাই অতীতের পিঞ্জরে ব'সে কেঁপে সারা হ'য়ে যায়।

সেই ঝড়ে কারাগারের লৌহদ্বার কুটোর মত উড়ে যায়। বেরিয়ে আসে একে একে, দুয়ে দুয়ে, কাতারে কাতারে ভারতের মুক্তি যোদ্ধারা। ঝঙ্কৃত হয় রাজপথ। আলোকিত হয় দিগন্তবিসারী তমসা। যেখানে তারা মশাল রেখে গিয়েছিলো সেখান থেকে সুরু হয় মশালের নব জয়যাত্রা। অনুসরণ করে সমগ্র ভারত। আকাশ গায় জয়হিন্দ্, বাতাস বলে জয়হিন্দ্। জীবনের নব বসন্তের মাঙ্গলিক ফোটে কোকিলের কণ্ঠে—জয়হিন্দ্, ইন্‌কেলাব। অপূর্ব বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রক্তস্নাত পৃথিবী।

ঘুমন্ত চা-বাগানেও সেই ঝড়ের মাতন এসে লাগে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজই স্পষ্টভাবে চা-বাগানকে জাগায়। সোনান্ সেণ্টারের বাণী

শোনার জন্যে সারা ভারতের মত চা-বাগানও তার রেডিওর মুখে গিয়ে ভীড় করে দাঁড়ায়। ফিসিফিসি উত্তেজিত আলোচনা চলে—কখনও কখনও হাতাহাতি। যারা কংগ্রেসের নাম পর্যন্ত শুনতে পারতো না একদিন তারাও আজ নিষ্ঠাবান ভক্ত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটানা সাফল্যজনক পশ্চাদপসরণে তাদের এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

জগৎব্যাপী এই আলোড়নের মধ্যেও কিন্তু চা-বাগানের মানুষের ছোটখাট সুখ দুঃখের ফল্গুস্রোত থেমে থাকে নি। তেমনি মন্দাক্রান্তা ছন্দেই ব'য়ে চ'লেছে।

ইতিমধ্যে মার্টিনের বিয়ে হয়ে গেছে। সে বহু গন্ধ সাবান, পাউডার, স্নো প্রভৃতি অকাতরে বিলিয়ে বহুকষ্টে একটি মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করেছে। ফুলকেরিয়া তাকে যত ভালই বাসুক, তার আশা তাকে ছাড়তে হয়েছে। মেয়েটি কি সহজে রাজী হ'তে চায়। চার্চে যাবার পথে প্রথমবার তো সে পালিয়ে আসে। শেষে তার বাপ মার তাড়নায় তাকে বাধ্য হ'য়ে যেতে হয়। গীর্জায় অনুষ্ঠান হয়। দুজনের গলায় দুটো সীসের ক্রস্ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য জিজ্ঞাসাবাদের পরে পাদ্রী বিদায়কালে ওদের বলে দেয়, ডুইজনে ডুইজনকে বহুট্ ভালবাসিবে—একজন ঠাকিতে আর একজনকে সাদি করিবে না। দুজনে একটা খাতায় ঠেপা (টিপসই) দিয়ে ফিরে আসে।

কিন্তু বিয়ের পরে কয়েকদিন যেতে না যেতেই মার্টিনের বৌ শাভিনা তাকে চিমটায়, কামড়ায়, হাঁচড়ায়, মার্টিন নির্বিবাদে হাসে, ছুটে পালায়। কিন্তু সে হাসি আর বেশীদিন থাকে না। ওর ব্যবহারে মার্টিন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে সুট্ নেকটাই ঝুলিয়ে সে শ্বশুর বাড়ী যায়। শাশুড়ী দু'হাতে ক'রে পা ধোবার জলের ঘটি ওর হাতে তুলে দেয়।

পা ধুয়ে ঘরে ঢুকে ও শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করে। শাশুড়ী হাঁড়িয়ার পাত্র ওর হাতে তুলে দিয়ে নমস্কার করে। ও সেটা নিয়ে নমস্কার করে। তারপরে আরম্ভ হয় খাওয়া।

ফুলকেরিয়া কিন্তু মার্টিনের বৌএর ওপর মোটেই খুসী নয়—যদিও সে কলাপাতা দিয়ে তৈরী চাঁদোয়ার তলে বসে উৎসব আসরে হাঁড়িয়া খেয়ে সারারাত জেগে বেঞ্জা ডণ্ডী (বিয়ের গান) গেয়ে সবাইকে মাৎ করেছে। সে গানের অর্থ হলো—আমি কত দেশ ঘুরলাম, কিন্তু তোমার মত উপযুক্ত মেয়ে কোথাও দেখলাম না। পত্র পড়ো—আমাদের রাঁচী জেলার লোহার দাগাতেই তোমার উপযুক্ত মেয়ে আছে। প্রাণমন ঢেলে ফুল গানটা গায়। আর একটা গানও সে গায়! তার অর্থ—মা, আমাকে তুমি বিয়ে দেবে কিন্তু একটু দেখে শুনে দিও। না হলে পালিয়ে আসবো আমি। ডোঙা ঘাটে আমি থাকবো। চুঁয়া ঘাটেও থাকতে পারি। ওপর থেকে জল আসবে, আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি খুঁজতে যাবে, কিন্তু পাবে না। তারপরে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদবে।

তার গানের সুরে শিরীষ গাছের রাত্রির নিদ্রাহারা পাখী পর্যন্ত কেঁদে আকুল হয়েছে। কিন্তু গানের সুর না মিলাতেই ফুল কেন যেন শাভিনার ওপর বেঁকে বসেছে। শাভিনার ঘরে ঢুকে সে তার অসাক্ষাতে ভাতের হাঁড়ি ফুটো ক'রে ভাত নষ্ট ক'রে রেখে যায়। চালের সাথে মাটি মিশিয়ে দেয়। চুনাইএ বসলে ওর সাথে খিটিমিটি লাগিয়ে চায়ের লাল্‌চে ধুলো চোখে ছুঁড়ে মারে। কখনও খিম্‌চিয়ে কামড়ে দেয়। সবাই আশ্চর্য হয়ে যায় ওর কাণ্ড শুনে।

আরও আশ্চর্য হয় যেদিন শোনে ফুলকেরিয়াও সেই কোঁকড়া চুলওয়ালা ছেলেটিকে বিয়ে করবে। ছেলেটির সৌভাগ্যে কতজন ঈর্ষান্বিত হয়। কিন্তু ফুলকেরিয়া জান্‌তো না যে এই বাগানের

মধ্যেই, তার একজন হঠাৎ জ্যাঠা আবিষ্কার হ'য়েছে। এদের মধ্যে পিতৃমাতৃহীন মেয়েদের বিয়ের সময় এমন অনেক হঠাৎ জ্যাঠার আবির্ভাব হয় ডালি পাওয়ার লোভে।

জ্যাঠা গিয়ে ম্যানেজার বাবুর কাছে নালিশ করে। তলব হয় ফুলকেরিয়ার। বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ফুলকেরিয়া—যেন আস্ত একটা গোখরো। জ্যাঠার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একঝলক আগুন নিক্ষেপ ক'রে বলে সে ম্যানেজার বাবুকে—জিজ্ঞেস করুন তো জ্যাঠাকে আমার বয়েস কত? আর, আজকে ছাড়া ওঁর সাথে আমার কোনদিন সামনা-সামনি দেখা হ'য়েছে নাকি?

ফুলের ভাবসাব দেখে হঠাৎ জ্যাঠা একেবারে হকচকিয়ে যায়। উত্তর দেয় সে আমতা আমতা ক'রে। ম্যানেজার বাবু বোঝেন সবই। বলেন, যা তোরা—যা। ফুল মাজা দুলিয়ে লীলায়িত ছন্দে বিজয়িনীর বেশে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আবার তক্ষুণি হঠাৎ ফিরে বলে—বাবা, আমাকে কয়েকটা টাকা দে না?

ম্যানেজার বাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—কেন রে?

মাথা নীচু ক'রে সে বলে, ডালি দেবো না ব'লে কি জ্যাঠাকে সম্মান দেখাবো না। ম্যানেজারবাবু অবাক হ'য়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে, পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বের ক'রে ওর হাতে রেখে বলেন—তোর বিয়ের আশীর্বাদী ফুলকেরিয়া। আশীর্বাদ করি, এমন উঁচু আর সাহসী মন নিয়ে বেঁচে থাক্ তুই।

ফুলকেরিয়া জ্যাঠাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পা ধুইয়ে, আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে দিয়ে চোব্য-চোষ্য ক'রে তাকে খাইয়ে বিদায় দেয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে সে আর বিয়ে করে না। ছেলেটি নাকি মার্টিনের কি নিন্দা ক'রেছিলো, ফলে ফুলকেরিয়ার কাছে বেদম চাঁটি খেয়ে সে পালিয়েছে। ম্যানেজার বাবুকে ফুলকেরিয়া টাকাগুলো

ফেরৎ দিয়ে এসেছে। মেয়েটীর সৃষ্টিছাড়া ভাবভঙ্গীতে ম্যানেজার বাবু হতভম্ব হ'য়ে যান।

ভয়াবহ ষোলোই আগষ্টের জন্ম হয় ক'লকাতায়। রক্তাক্ত রাজপথ। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে নির্বিকারে-নির্বিচারে হত্যা করে। বাঙালী যে স্বভাব কবি এ অপবাদ ঘুচাবার ত্রুটী থাকে না কিছু। অমানুষিক বর্বরতার কালো হাওয়া সুসভ্য-নগরীর সব আলো মুছে দেয়। রেডিওর মুখে সেই খবর শুনে মানুষ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। সমগ্র বাঙালীজাতি যেন দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে সেই সব খবর শোনে।

বাগানে একমাত্র মুসলমান রুস্তমের অবস্থা কাহিল হ'য়ে ওঠে। লোকটা স্বভাবে ধর্মভীরু এবং সৎ। হিন্দুদের মধ্যে তার বাস। কাজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে তার কণ্ঠ একটু জোরালো হ'য়ে ওঠে। ম্যানেজার বাবুকে সে বলে,—বাবু, খাঁটি মুসলমান কখনও মানুষ খুন করতে পারে না। মসজিদের সামনে বাজনা বাজালে, বন্দেমাতরম্ ব'ললে যাদের ধর্ম নষ্ট হয় তারা কি মুসলমান! খাঁটি মুসলমানের এত সহজে ধর্ম নষ্ট হয় না। দেখুন, মোহম্মদের একনিষ্ঠ শিষ্য আলির পায়ে একবার বল্লম বিঁধে যায় কি ভাবে। সে সময়ে তো আর কলেরাফরন্ (ক্লোরোফর্‌ম্) ছিলো না। কাঁচা মাংস কেটে কিভাবে বল্লম বের করা যায়—মহা মুস্কিল! শিষ্যরা শেষে ঠিক করে, সূর্য অস্ত যাবার সময় আলি যখন নামাজ প'ড়বে সেই সময় মাংস কেটে বল্লম বের করতে হবে। তাই তারা করে—ভাবুন তো কি একাগ্র ধর্মনিষ্ঠা ছিলো তাঁর। এই হলো খাঁটি মুসলমানের ধর্ম।

ম্যানেজার বাবু উৎসাহের সাথে বলে ওঠেন—বাঃ, বেশ চমৎকার গল্পটি ব'লেছো তো। এই গল্পটি রেডিওতে প্রচার করা উচিত। শেষে তিনি কণ্ঠে বেশ একটু জোর দিয়ে বলে ওঠেন আবেগভরে—I doubt whether there is God! না হ'লে এরকম নির্মম হত্যাকাণ্ড চ'লতে পারে!

বাগানে প্রবল উত্তেজনা; নানারকম গুজোব, কাহিনী পল্লবিত হ'য়ে আসতে আরম্ভ করে—বিশেষতঃ যাদের আত্মীয়-স্বজন ক'লকাতা থেকে এসে জুটছিলেন, তাদের মারফৎই এটা বেশী বেশী আসে। ফলে নিরীহ দরিদ্র মুসলমান যারা কোন রকমে জিনিষ ফিরি ক'রে জীবন বাঁচায়, তারা বাগানে ফিরি করতে এসে তাড়া খেয়ে যায়। সব আক্রোশ ওদের ওপর পড়ে।

কয়েকমাইল দূরে মুসলমান গ্রাম ইসমাইলপুর। বাগানে তাই সন্ত্রস্ত অবস্থা—সাজ সাজ রব। নেপালী দ্বারোয়ানরা তাদের মর্চে ধরা ভোজালি বের ক'রে শান্ দিতে ব'সে যায়। সাঁওতালদের তীর-ধনুক বেরোয়। লরীতে ক'রে গিয়ে গোপনে বাঁশের লাঠি কেটে বোঝাই ক'রে আনা হয়। ইস্‌মাইলপুরের মুসলমানরা নাকি যে কোন দিন বাগান আক্রমণ করতে পারে। কয়েকদিন তো বাগানে সন্ত্রস্ত অবস্থা।

ঠিক এমনি সময়ে এলেন সেই বহুকথিত প্রাণীতত্ত্ববিদ বনানী-দের কলেজের প্রফেসার। ক'লকাতার দাঙ্গায় তাঁর বহুমূল্যবান্ লেবরেটারী পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। ক'লকাতার লেবরেটারীতে ব'সে গবেষণার মোহ তাঁর ফুরিয়েছে। এইবার তিনি তাঁর সারাজীবনের সাধ—বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বিভিন্ন প্রাণীর জীবনযাত্রার বাস্তব তথ্য সংগ্রহ পূরণ ক'রবেন। অর্থের তাঁর অভাব নেই, বাবা সে অভাব মিটিয়ে রেখে গেছেন। পেছনে কোন টান নেই—তিনি

অবিবাহিত। হিমালয়ের বনে বনে ঘুরে ফিরে তথ্য সংগ্রহ ক'রবেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পূর্ব বন্দোবস্তমত এই বাগানে এলেন। বাগানই হবে তাঁর কেন্দ্র। বনানীর বাবা সাগ্রহে রাজী হ'য়েছেন। ইন্‌স্‌পেকসান্‌ বাংলোয় তিনি এসে উঠলেন—শেষে একেবারে ম্যানেজার বাবুর খোদ বাসায়।

তিনি আসার পর লোভনীয় কিছু শুনবার জন্যে বাবুরা তাঁকে এসে ঘিরে ধরলেন। কিন্তু অনেককে নিরাশ ক'রে তিনি ব'ললেন, দেখুন! ক্ষতিগ্রস্ত আমি খুবই হ'য়েছি এটা ঠিক, সে ক্ষতিপুরণ আর হবে না তাও জানি। কিন্তু, ব্যক্তিগত স্বার্থের চাপে আবেগে অন্ধ হয়ে যদি আমি বলি, সমগ্র মুসলমান জাতি বর্বর হ'য়ে গেছে, তা'হলে বিশ্বের সারস্বত দরবারে, বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় আমি হব অপরাধী। আমার চাইতেও জ্ঞানী-গুণী-মহৎ অনেক মুসলীম মণীষীকে কলঙ্কিত করার আমার কি অধিকার আছে? আমি চাই যে আমার ভস্মীভূত লেবরেটারী সৎ মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাক্‌, ভ্রাতৃযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি কি। আমার লেবরেটারী আমারও দৃষ্টিপ্রদীপ।...

অদ্ভুত মিশুক এবং অমায়িক এই বৈজ্ঞানিক ভদ্রলোক। যেমন চেহারা তেমনি টক্‌টকে উজ্জল রং, উন্নত নাক, প্রশস্ত ললাট—যেন ভারতীয় আর্যদের এক আধুনিক সংস্করণ। কথা বলেন যেন মধু ঝরে—বীণার ঝঙ্কার হয় যেন। বাঁ কোলে অঞ্জু, ডান কোলে মঞ্জুকে নিয়ে জীবজন্তু সম্বন্ধে কত চিত্তাকর্ষক গল্প বলেন তিনি। সন্ধ্যায় বনানীকে নিয়ে তিনি সেতার বাজান। কদিনেই তিনি এ বাসার সবার যেন প্রাণ কেড়ে নিলেন একেবারে! এঁর আসার পর থেকে বনানীর আর টিকিটিও দেখতে পায় না ডাক্তার। অভিমানে তার বুক ফেটে যেতে চায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। লেবরেটারী-হারা বৈজ্ঞানিক যেন তার জীবনে নতুন ক'রে ওলোট্‌-পালোট্‌ ঘটিয়ে দেয়। মনে মনে সে ভাবে,

বনানী তার কে, কেন তার কথা অষ্টপ্রহর সে ভাবে ? তার স্বপ্ন তো সার্থক হবার নয়, হওয়াও কাম্য নয়, তবে কেন সে তার কথা ভাবে ? আর তার কথা ভাববে না—কিন্তু জীবন-মীমাংসা আর জীবন তো এক নয়। তাই ছন্নছাড়ার মত ডাক্তার ঘুরে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে—বনের অনন্ত আকর্ষণও আজ তার কাছে শিথিল, অর্থহীন হ'য়ে গেছে। অথচ যার স্বপ্নে সে তন্ময়, কেন সে তার কথা ভাবে না ? কেন সে অমন ক'রে তার জীবন রক্ষা করলো ? রক্ষা করলো তো অমন অবহেলা কেন ? নিজের যোগ্যতা বিষয়ে তার উচ্চ ধারণা নেই। বৈজ্ঞানিকের সাথে নিজেকে তুলনা ক'রে সে মাটির সাথে মিশে যেতে চায়। ভাবে, হায় পূর্বের স্থৈর্যশীল জীবনে যদি ফিরে যাওয়া যেতো ! মনে হয় হয় চিরকালের জন্যে সে তার জীবনের ভারকেন্দ্রচ্যুত হ'য়েছে। কোন্ অনিবার্য মৃত্যু-গহ্বরের দিকে তার গতি কে জানে।

মাঝে মাঝে হিমালয়ে যান বৈজ্ঞানিক। তরুণ তাঁর সাথী। ফিরে আসেন বিচিত্র তথ্য নিয়ে। সান্ধ্য আসরে সবাইকে প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে কৌতূহলজনক সব তথ্য উপহার দেন—এমন হিংস্র যে বাঘ ময়ূরকে দেখতে সেও ভালবাসে, জানেন ? আপনাদের ধারণা, সিংহ ভয়ানক হিংস্র, মোটেই তা নয়। অত যে গর্জন তার সিংহীকে আদর করার সময় যদি দেখেন তাকে দেখবেন কেমন মৃদুভাষী, প্রেমগুঞ্জরক সে। এক একটা পাখীর বাসা বাইরে থেকে কদাকার, কিন্তু ভেতরটা চমৎকার। একটা পাখী আছে সে তার বাসার মধ্যে দুটো কুঠরী তৈরী করে—তার স্ত্রীর প্রসবের জন্যে একটা আলাদা কুঠরী। এ ঘরের সাথে ও-ঘরের যোগাযোগের জন্যে একটা মাত্র ফোঁকর। যতদিন বাচ্চা বড় না হয় ততদিন পুরুষ পাখীটা সেই ফোঁকর দিয়ে খাবার দেবে স্ত্রীকে। দেখুন তো কেমন একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেম। আরও কত কি

কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য তিনি শোনান—সবাই তন্ময় হ'য়ে শোনে। বৈজ্ঞানিক কত রকম ফসিল ফুল, লতা, পাতা, পাথর নিয়ে এসেছেন সংগ্রহ করে—সবাইকে তা দেখান এবং বুঝান। বৈজ্ঞানিককে ঘিরে এই সান্ধ্য আসর বড় বাসাকে দিয়েছে প্রাণ—ডাক্তারকে করেছে নিষ্প্রাণ। মাঝে মাঝে ডাক্তার এই আসরের নিষ্প্রাণ শ্রোতা। বনানীর ওপর তার ধিক্কার আসে—ওকে ভাবে সে তরল পদার্থের মত—যে পাত্রে রাখা যায় তারই মত আকার—নিজস্ব কিছু নেই। কিন্তু তার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করার কারণ কি সে নিজেই বুঝে পায় না। বনানীর জীবনের অসঙ্গতি আবিষ্কারে তার জীবনের কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য পুরণ হবে? রাত্রির মুসাফিরের সাথে আলোকের মেয়ের কি সম্পর্ক? ডেক যাত্রীর সাথে রিজার্ভড কেবিনের প্যাসেঞ্জারের কতটুকু যোগ? পরের দয়ায় যার শিক্ষা-জীবন, পরের অনুগ্রহে যার সামান্য ডাক্তারী বিদ্যা, বড়লোকের মেয়ের জীবনের অসঙ্গতি খোঁজায় তার কি লাভ? তার কি ক্ষতি? তবু—কত জাগ্রত রজনীর অভিশপ্ত নিঃশ্বাস যেন অতীতের পার থেকে তাকে ছুঁয়ে যায়।

ছন্নছাড়ার মত সে সাইকেলে ক'রে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে। সে নীরব অভিমানী—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃতি তার নয়। আগে বহু দূরের কল সে ফিরিয়ে দিতো। এখন নিতে আরম্ভ করে—যদি ওতে কিছুটা অন্যমনস্ক হওয়া যায়। ওদের বিচিত্র আচার রীতি-নীতি সুখ-দুঃখের কাহিনীতে নিজেকে ভুলতে চেষ্টা করে। এই রকম ঘোরাঘুরির সময়ে একদিন ভারী একটা মজার ব্যাপার ঘটে। শুকধানের ফুটিগ্রামের এক অধিকারী তাকে এসে কাকুতি-মিনতি ক'রে ধরে, ডাক্তারবাবু আমাকে একটা বুদ্ধি দিয়ে বাঁচান।

ডাক্তার তাকে অভয় দিয়ে তার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস ক'রলে সে যা বলে তার মর্ম—সে গ্রামের এক দাওয়ানী (গ্রাম্য মাতব্বর) তার নিজের বাড়ীতে একজন প্রৌঢ়া আর তার যুবতী মেয়েকে নিয়ে এসে রাখে—এ রকম অনেক দাওয়ানীরই বিধবা আছে। এতে লাভ, বিয়ে করার দায়িত্বও নিতে হয় না, অথচ তাদের দিয়ে সবরকম কাজই চলে—তার জন্যে মজুরীও দিতে হয় না, শুধু খেতে প'রতে দিলেই যথেষ্ট।

এখন কালক্রমে ওই যুবতীটির একটি ছেলে হয়। দাওয়ানী মহা ফাঁপরে প'ড়ে যায়। কি করা? আর এক দাওয়ানীর পরামর্শ নিলে সে বুদ্ধি দেয়, তোর বাড়ীতে তো অধিকারীর যাতায়াত আছে, তাকেই বাপ বানা। ডাক্তার হতবুদ্ধি হ'য়ে শুনতে থাকে।

—অন্যায় অবিচারটা দেখুন ডাক্তার বাবু। আমাকেই সবাই মিলে জোর ক'রে মাথা মুড়িয়ে বাপ বানায়। নিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, হলাম আমি বাপ্; বিধাতার লিখন। কপালে সে বারকয়েক আঘাত করে।

পাশের গ্রামের এক দাওয়ানী ওর শত্রু। তার কাছে আমি বুদ্ধি নিতে গিয়েছিলাম। এ সব ব্যাপারে সে ভারী বুদ্ধি রাখে কিনা। সে বলে, তোমাকে যখন বাপ বানিয়েছেই তখন তুমি এক কাজ করো, সেই বিধবা আর মেয়েটাকে নিয়ে চ'লে এসো এই গ্রামে, আমি ঘর-দোর সব দিচ্ছি। এতে ওর লাভ, ওর এক ঘর প্রজা বাড়ে, আর শত্রুও জব্দ হয়। এখন আমি ভাবছি, এই বুদ্ধি নেবো কিনা। তাই আপনার পরামর্শ চাচ্ছি ডাক্তারবাবু। শুনেছি আপনার দয়ার শরীর —অমাকে দয়া ক'রে বাঁচান, আমি তো আর সহ্য করতে পারছি না—ব'লে ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরতে যায়। ডাক্তার শশব্যস্তে পা টেনে বলে—আঃ, করো কি, করো কি। দাওয়ানীর কথা অনুযায়ী

কাজ ক'রে দেখো না, ওতে ফল হ'তেও পারে। কেন না লোকটার তো বিধবা আর মেয়েটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে।

অধিকারী বলে, হ্যাঁ আমিও তাই ভাবছি।

কয়েকদিন পরের কথা। ডাক্তার সেইদিক দিয়ে ফিরছে। অধিকারী আনন্দে ছুটতে ছুটতে এসে ডাক্তারের পায়ে ঢিব্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে বলে, কাজ হয়েছে ডাক্তার বাবু—ভারী বুদ্ধি আপনাদের। লোকটা স্বীকার গেছে। ডাক্তার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—গিয়ে ব'ললাম লোকটাকে—মু ধরি খাবো ওগরে। লোকটার মুখ শুকিয়ে গেলো একেবারে। শেষে বাধ্য হ'য়ে সবার মধ্যে স্বীকার গেছে। বেঁচে গেছি ডাক্তারবাবু—আচ্ছা, পেরনাম।

ডাক্তার তো অবাক। সে ভাবতে ভাবতে ফেরে, দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবে গ্রামগুলো কেমন অত্যাচার, পীড়ন ও কুসংস্কারের ঘাঁটি হ'য়ে আছে। পরাধীন জীবন মানুষকে বর্বর যুগেই বন্দী ক'রে রেখেছে। চা-বাগানের কুলিজীবনেও ওই একই কলঙ্ক লেখা।

অন্যমনস্কভাবে ফিরছিলো ডাক্তার। হঠাৎ হৈ হৈ হট্টগোলে সচকিত হ'য়ে ফিরে তাকিয়ে দেখে একটা বিয়ে পার্টি দাঁড়িয়ে আছে। বরযাত্রীরা হট্টগোল লাগিয়ে দিয়েছে। গরুর গাড়ী থেকে বর নামলো —আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে এবং ঘোমটা দিয়ে। বড়ই কৌতূহল হয়। এসব বাড়ীতে ডাক্তারের গতায়াত আছে। বরযাত্রীরা ঘরে ঢুকলে একটু ইতস্ততঃ ক'রে সেও বাড়ীর মধ্যে ঢোকে। একটা ঘরে বর সবেমাত্র ঘোমটা খুলে বিড়ি ধরিয়েছে, ডাক্তারকে দেখেই চট্ ক'রে আবার ঘোমটা টেনে দেয়। ভারী মজা লাগে। বাড়ীর কর্তা এসে হাতজোড় ক'রে অভ্যর্থনা জানায় এবং জলযোগ না করিয়ে ছেড়ে দেয় না।

এদের আন্তরিকতায় ও সরলতায় ডাক্তার মুগ্ধ হয় যেমন, এদের দুস্তর দারিদ্র্য, কুশিক্ষা, কুসংস্কার এবং নিরাভরণ আদিম জীবনযাত্রার শূন্যতায় তেমনি বিচলিত হয়। সভ্যতার পরস্পরবিরোধী দুই রূপ তাকে পীড়িত করে—কোথায় আমেরিকার স্কাইস্ক্রেপার আর কোথায় এই সব দরিদ্রের গুহার মত সঙ্কীর্ণ কুটীর; কোথায় গাউন আর উভারকোট, সান্ধ্য-পরিচ্ছদ আর নৈশ-পরিচ্ছদ, আর কোথায় এদের এক হাত লেংটী; কোথায় মূল্যবান্ প্রস্তরখচিত অলঙ্কারের ঝক্‌ঝকে দীপ্তি আর কোথায় সাহারার অপার রিক্ততা। ডাক্তার ভাবতে ভাবতে ফেরে। রাত গভীর। ফ্যাক্টরীর হৃৎপিণ্ডটা শুধু সেই গভীর নীরবতাকে ধুকু ধুকু জাগিয়ে রেখেছে। হঠাৎ গুদাম ঘরের দিক থেকে সে চাপা বামাকণ্ঠের চীৎকার শুনতে পায়—এই বাবু, ছেড়ে দে, তোর পায়ে ধরছি ছেড়ে দে—তোর বাড়ীতে কি মা-বোন্ নাই?

ত্রস্তে ডাক্তার এগিয়ে উঁকি মেরে দেখে—রমেশ একটি যুবতী কুলি কামিন্-এর কাপড় ধ'রে টান্‌ছে! ডাক্তার চীৎকার ক'রে ওঠে—বাঃ রমেশবাবু, বীরত্বের চমৎকার পাত্রটি আবিষ্কার ক'রেছেন দেখছি—আপনি না মহা নীতিবাদী?

রমেশ হঠাৎ হকচকিয়ে যায়। শেষে আত্মসম্বরণ ক'রে মেয়েটার আঁচল ছেড়ে দিতে দিতে বলে—হ্যাঁ, আপনার মত ডুবে ডুবে জল খেতে তো পারি নে।

—বেশ তো পারো দেখছি। হঠাৎ দরজায় কার ছায়া পড়ে। স্বয়ং ম্যানেজার বাবু। মাঝে মাঝে তিনি এমন রোঁদে বেড়ান। রমেশ মাথা নীচু করে। কিন্তু তার ক্ষুধিত দৃষ্টির প্রখর কাঠিন্য তখনও মিলিয়ে যায় নি একেবারে। ম্যানেজার বাবু গম্ভীরভাবে বলেন—আজকের মত বাসায় যাও, তোমার ডিউটি শেষ, কাল

দেখা যাবে। বাড়ীতে তোমার বোন্ রয়েছে না রমেশ? তুমি এত ইতর—ছিঃ, ছিঃ! চলো কনক!······

পরের দিন গোপন-বিচারে রমেশের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। সে পঞ্চাশ টাকার জ্বালা সে ভুলতে পারে নি বহুকাল। তাই কোন দুর্বোধ্য কারণে ডাক্তারকে সে এর আগে দেখতে না পারলেও এবার থেকে সে তার এক নম্বরের শত্রুতে পরিণত হ'য়ে যায়।

ডাক্তারের দেখাদেখি বনানীও ডাইরী লিখতে আরম্ভ ক'রেছে। বনানী লেখে—শান্ত প্রকৃতির মত প্রশান্ত জীবনেও মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে—ওলোট-পালোট ক'রে দিয়ে যায় জীবনের প্রবহমান সরল ধারাকে। যাঁর সাথে সম্পর্ক পাতালাম 'কাকু', আমার নিজেরই অজ্ঞাতে, অতি সন্তর্পণে কোন্ এক অনির্দেশ্য মুহূর্তে সে সম্পর্কের মূলোচ্ছেদ হ'লো। বুঝলাম, কোন এক অজানা কাব্যের নায়িকা হ'য়েছি আমি—কাকু হ'য়েছেন পাতাল-কন্যা মণিমালার ঘুমন্ত রাজ-কুমার। হ'লোই বা মণিমালা রাজকুমারী, আর নাই হ'লো ডাক্তার রাজকুমার, তবু মণিমালা নিজেকে নূতন রূপে জানলো, নতুন আলোয় নিজের নতুন রূপ উপলব্ধি ক'রলো; তার হৃদয়ের ঘুমন্ত কোরকের বন্ধন উন্মোচন হ'লো—কিন্তু তার মানসলোকের রাজকুমার? সে যে আজও ঘুমিয়ে।

এলেন আমার প্রফেসার। হৃদয়ে নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'লো। রূপের কথা যদি বলো? ইনি সত্যিকারেরই রাজকুমার। রূপের আলোয় ইনি দশদিক আলো ক'রে রেখেছেন। গুণ? তার কি শেষ আছে? বাপ-মার সংস্কার, আর নিজের সংস্কারের দিক থেকেও ইনি সগোত্রীয়। আর দরিদ্র অসহায় ডাক্তার?···

ইনি অর্থাৎ প্রফেসার আমার মনকে সজোরে নাড়া দেন নি ব'ললে ডাইরীর পৃষ্ঠায় আত্মপ্রকাশের সত্যটাকেই টুঁটি টিপে মারা হবে। ইনি জয় ক'রছেন আমাকে নিজ শক্তিতে, আপন সক্রিয়-সচেতন মনের অচেতন যাদুতে। আর ডাক্তার? তাঁর মহিমময় ব্যক্তিত্বের নীরব ঔদাসীন্যই আমাকে টেনে হিঁচড়ে তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে দিচ্ছে?

এই দ্বন্দ্বের হাত থেকে আমার মুক্তি কোথায়? কার গলায় আমি জয়মালা দেবো? জীবনের নতুন জাগরণে আমি যেমন রোমাঞ্চিত, বিহ্বল, জীবনের অভূতপূর্ব সঙ্কটে আমার জীবন তেমনি উতরোল। ভাল আছি কি মন্দ আছি ব'লতে পারিনে—কিন্তু এইটুকু ব'লতে পারি, আমি ভালবেসেছি, হয়তো ভালবাসা পেয়েওছি। জীবনের উপকথা রাজ্যের অমৃত আস্বাদে জীবন আমার ভরপুর। কিন্তু আমার ভালবাসায় যে ঘুর্ণিপাক প'ড়েছে তার হাত থেকে আমার মুক্তি কোথায়? পৃথিবীতে অনেক অনেক সঙ্কটেরই মুক্তির পথ আবিষ্কৃত হ'য়েছে—কিন্তু নরনারীর হৃদয়দ্বন্দ্বের এই জটিল গ্রন্থির উন্মোচনের কি কোন ব্যবস্থা নেই? কার কাছে সে উত্তর চাইবো?···

·

খুব ভোরে বনানীকে ইঞ্জেকসান্ দেবার কথা ছিলো। ডাক্তারকে আজ দূর গ্রামে এক কঠিন রোগীকে দেখতে যেতে হবে—ফেরা সম্ভব নাও হ'তে পারে। তাই ডাক্তার ইঞ্জেকসানের সরঞ্জাম নিয়ে বনানীর ঘরের দরজা পর্যন্ত যায়—শেষের দিকে পা টিপে, কারণ কাদের মৃদু গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছিলো। আধ-বোজা দরজায় কান পেতে ডাক্তার শোনে প্রফেসার আর বনানী মৃদুস্বরে আলাপ ক'রছে। হঠাৎ গলাটা যেন কিসে আটকে ধরে তার—বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে ওঠে। তেমনি নীরবেই সে ফিরে চ'লে যায়।

পরদিন সকালে ছুটতে ছুটতে এসে বনানী বলে—চলুন (কাকু সম্বোধন তার কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে না) চলুন, আমরা পিক্‌নিক্‌ করবো বনে মোটর ক'রে গিয়ে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলে—তোমরাই যাও, আমি আর যাবো না।

—কেন? ব'লে বনানী ভ্রূ কুঁচকায়।

ডাক্তার অন্যদিকে চেয়ে তেমনি ঠাণ্ডা স্বরে বলে—ক্ষুধার্ত কুলিদের চোখের ওপর দিয়ে পিক্‌নিক্‌ ক'রতে যেতে আমার বাধবে বনানী, ওদের রেশান্‌ কিরকম ক'মেছে জানো বোধ হয়?

—আপনার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

শান্ত ধীর কণ্ঠে ডাক্তার বলে—তোমাদের সমগ্র জীবনটাই যে আমাদের কাছে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

—তাই নাকি? তাহ'লে তো বড় মুস্কিলের কথা—ব'লেই সে আর একটুও দেরী না ক'রে ছুটে চলে যায় একটা গানের কলি ভাজতে ভাজতে।

দিন পনেরো পরের কথা। বনানী এতদিন ডাক্তারের কাছে গম্ভীর আছে। বৈজ্ঞানিকের দিকে সে যেন আরও একটু বেশী ঝুঁকেছে। আজ হাতী ধরা দেখতে যাচ্ছে বাগানের বাবুরা। তরুণ, বৈজ্ঞানিক, বনানীও তাদের দলে যোগ দেয়। বনানী ডাক্তারের ঘরের দিকে একবার ফিরেছিলোও, কিন্তু কি মনে ক'রে ফিরে গিয়ে মোটরে ওঠে। উঠে অবাক হ'য়ে দেখে ডাক্তার, তরুণ আর মাষ্টার মশাই-এর পাশে নিঃশব্দে ব'সে আছে। গাড়ী ছাড়লে শব্দের সাথে সুর মিলিয়ে সে চাপা গলায় ডাক্তারের দিকে একটু ঝুঁকেই বলে—আজ বোধ হয় আর বাড়াবাড়ি হ'লো না—না? পনেরো

দিন পরে এই তার প্রথম কথা। ডাক্তারের ঠোঁটের এক প্রান্তে নীরব-কঠিন হাসি মিলিয়ে যায়।

ভোটানের ঠিক সীমানায় হাতী ধরা খ্যাদা। মোটা মোটা শাল-পোষ্টের একটা বৃত্ত। সেই বৃত্তের দু-পাশ দিয়ে বৃত্তের সাথে যোগ রেখে দু'ধার দিয়ে শালপোষ্টের দুটো প্রাচীর চ'লে গেছে গভীর বনের মধ্যে পাহাড়ের পাদদেশে প্রায় আধ মাইল অবধি। সেই প্রাচীর ডালপালার ছাওয়া—যেন মিলিটারী 'কমাউফ্লেজ'। প্রাচীর বেষ্টিত রাজপথ দিয়ে একদল হাতী পাহাড়ীদের কর্তৃক বিতাড়িত হ'য়ে ওই সর্বনাশা বৃত্তের মধ্যে ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত-দৃঢ় গেট্ প'ড়ে গেছে। এইভাবে বন্দী হ'য়ে হাতীগুলো পরস্পরকে আক্রমণে আর আর্তনাদে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে। এবং ভুটিয়া পাহারাদার কর্তৃক ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে হিমালয়ের বনভূমিকে থর থর ক'রে কাঁপিয়ে তুলেছে। সে এক ভীষণ কাণ্ড। বহুদূর থেকে সে আওয়াজ শোনা যায়।

একদল ভুটিয়া পাহারা শেষে পিঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খাচ্ছে, আর একদল রক্তচক্ষু পাহারাদার বল্লম হাতে বৃত্তের বাইরে হিংস্রভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর বন্দী হাতীগুলি বেড়ার দিকে এগিয়ে এলেই খোঁচা মারছে।

হঠাৎ মেয়েলীকণ্ঠে কে বলে—আহা, বাচ্চা দুটোকে যে মেরে ফেললো ওই বড় হাতীগুলো!

চোখাচোখি হ'তে ডাক্তার দেখে বনানী। বনানী সাগ্রহে বলে—ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন, এখানে উঠে আসুন।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে। বৃত্তের মধ্যে তখন অনবরত ধাক্কাধাক্কি, গুতোগুতি চ'লছে। দশটা হাতির অবিরল লড়াই—যেন সাগরজলের আলোড়ন। কি বিকট আওয়াজ

উঠছে। বনানী বাচ্চা দুটোকে দেখিয়ে বলে--কেমন সুন্দর গণেশের মত—না? আহা, বড় মায়া হয়! কেমন ক'রে ও দুটোকে মারছে ওরা দেখেছেন? নিজেদের বাচ্চা। ওইটে মাকুন, (সর্দার) জানেন? এক নিঃশ্বাসে অনর্গল সে ব'লে যায়। ঝরণার মতই সে উচ্ছ্বসিত-উচ্ছলিত—পেছনের ইতিহাস যেন তার গায়ে কোন ছাপই রাখে না।

কি এক অন্ধ অভিমানে ডাক্তার নেমে পড়ে। তার কিছুই ভালো লাগে না। একটা বন্যপথ ধরে সে এগিয়ে চলে অন্যমনস্ক। বন ক্রমেই নিবিড় হ'য়ে আসে। তবু সে এগিয়েই চলে। সামনেই বুনোহাতির টাট্‌কা বিষ্ঠা। সে ভ্রূক্ষেপশূন্য। এইবার তার একটু ভয় হয় বনের অবস্থা দেখে—বিশেষতঃ দূরাগত চীৎকার শুনে। সে ফিরতে আরম্ভ করে দ্রুতপদে। অনেকক্ষণ পরে ক্লান্তপদে এসে পৌঁছয়। দূর থেকেই বনানী ব'লে ওঠে—ওই দেখুন ওঁর কাণ্ড! কাছে এলে সে আশঙ্কার দৃষ্টিতে বলে—আপনার কি ভয় ডর নেই, শুনলেন না, ওই পথে কতকগুলো বড় বড় হাতী পালিয়েছে?

বৈজ্ঞানিক বলেন—ডাক্তারবাবু আমাদের একটু ভাবুক লোক কি না। ডাক্তার নীরবে একটুখানি হাসে।

ভিমা নদীর চরে ভোজনপর্ব শেষ করে সবাই লরীতে ওঠে। ওঠার সময় বনানী ফিসিফিসি ডাক্তারকে বলে—বাড়াবাড়ির জীবনটা কেমন লাগলো বলুন তো?

ডাক্তার নিরুত্তর থাকে।

পরদিন শুকনো মুখে ডাক্তার গিয়ে ম্যানেজার বাবুকে বলে—আমাকে কয়েকদিনের ছুটি দিন।

—কেন বলতো? হঠাৎ ছুটির কেন প্রয়োজন হ'লো? তোমাকে যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, শরীরটা ভালো নেই। কয়েকটা দিনের ছুটি দিন, বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি!

—বাড়ী? তোমার আবার বাড়ী আছে নাকি?

ডাক্তার শুক্‌নো হাসি হাসে। তার ব্যক্তিগত জীবনেতিহাস সবার কাছে এমনি আড়ালে আছে যে কেউ ভাবতে পারে না, তারও একটা অতীত জীবনযাত্রা ছিলো।

বনানী ছুটে এসে বলে—আমার ওপর রাগ ক'রে চ'লেছেন?

—কেন, তোমার ওপর রাগ ক'রতে যাবো?

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে বলে—আমার দিকে চেয়ে বলুন তো ঠিক ক'রে? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, বাড়ী ব'লতে আপনার কিছুই নেই।

—এ ভুল খবরটা তোমাকে কে দিলো বনানী?

—আপনার ডাইরী। দেখুন আমার সাথে লুকোচুরি ক'রে কোন লাভ নেই, আমি আপনার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর জানি। আপনি যেতে চাচ্ছেন যান। দিন কয়েক কোথাও ঘুরে আসুন। আপনার শরীরটা বড়ই খারাপ হ'য়ে পড়েছে। তাই ব'লে আমার ওপর রাগ ক'রে আপনাকে এখান থেকে একেবারে চ'লে যেতে আমি দেবো না।

ডাক্তারের মনে হয় জিজ্ঞেস ক'রে, কোন্ জোরে সে সেকথা ব'লছে। তার ওপর ওর কিসের জোর। কিন্তু সেকথা ব'লতে পারে না ডাক্তার। তবু সে মনে মনে কি একটা অনাস্বাদিত আরাম বোধ করে। বলে, তোমার ওপর রাগ করবো কেন। এমনি শরীরটা একটু খারাপই মনে হচ্ছে তাই দিন কয়েকের জন্যে ঘুরে আসবো।

রাত দশটা। জয়ন্তীর ডাক বাংলোর বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছে ডাক্তার। মাথার ওপরে চামচিকের উপদ্রব বন্ধ করার জন্যে পাঁজা পাঁজা কাঁটা ঝুলানো। সামনেই জয়ন্তী

নদী। ওপরে ঘনগভীর বন—শ্বাপদ সঙ্কুল। আরও দূরে পাহাড়—ধূসর পাহাড়। চাঁদের আলোয় স্বপ্নাতুর পাহাড় আর বন। স্বপ্নাতুর সমগ্র পৃথিবী।

কয়েকদিন আগে ডাক্তার উঠেছে এখানে এসে বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে। দেশে যাবার কথা সত্যিই বাজে। দেশ ব'লতে তার নেই—এক মা ছিলেন। তিনিও বেশ কিছুদিন হলো মারা গেছেন। তাই দেশ ব'লতে তার আজ সমগ্র পৃথিবী।

কিন্তু এই নির্জন আবেষ্টনীতে বিক্ষুব্ধ মন শান্ত তো হয়ই নি বরং কর্মহীন নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে সে আরও ক্ষুব্ধ হবার অবকাশ পেয়েছে। সমস্ত দিন ঘোরাঘুরি ক'রে সন্ধ্যায় এইখানে এসে বসে সে। পেছনের সমগ্র জীবন তখন নিবিড় হয়ে ওঠে তার অনুভূতিতে। কত দুঃখ, কত বেদনায় অভিসিঞ্চিত তার স্বপ্নময় শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি। বহু রাত পর্যন্ত কত কথা সে ভাবে। সব চাইতে ভাবে, বাগানের জীবনের কথা—যা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ভাবতে ভাবতে রাত গভীর হ'য়ে যায়। নীরব জ্যোছনায় পৃথিবী ঘুমায়, পাহাড় ঘুমায়। জয়ন্তীর তীরে তীরে Barking deer, Hog deer, সম্বর ডেকে যায়। নীল কুয়াসার পর্দার আড়ালে পাহাড়শ্রেণী রহস্যাবৃত হ'য়ে থাকে। ঘুমিয়ে আছে হিমালয়। সারাটা শীতই সে এমনই ঘুমিয়ে কাটায়। প্রথম বর্ষার স্নিগ্ধ স্পর্শে তার ঘুম ভাঙবে। ঝড় ও বিদ্যুৎ হ'য়ে উঠবে তার উষ্ণীষ, মেঘ হবে তার মালা। অশ্রুর প্রবাহ বইয়ে হিমালয় বাংলার তৃষ্ণার্ত মাটির বুক শ্যামল ক'রে তুলবে। ঘুমন্ত পাহাড়ের বুকে যেন সেই সবুজ দাগই দেখতে পায় ডাক্তার।······রাত বারোটার গাড়ী আসে। একটু পরেই হঠাৎ চৌকীদার, চৌকীদার ডাক শোনা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তরুণের সাথে বনানীর আবির্ভাব। ডাক্তার অবাক।

বনানী বিস্ময়ে গাঢ় কালো ভ্রূ জোড়া কুঁচকে (সেই ভ্রূর নীচের কালো চোখ জোড়া আনন্দে উজ্জ্বল) বলে—আপনি! তবে নাকি আপনি দেশে গেছেন? ডাক্তার আমতা আমতা করে।

আসল কথা হ'চ্ছে, বনানী জানতো, ডাক্তার বাড়ী যায় নি—তার বাড়ী নেই। জয়ন্তীর উপর ওর তীব্র আকর্ষণের কথাও সে জানতো। তাই পরখ করতে এসেছে।

যাক্—তারপরে দু'দিন ধ'রে ওদের সাথে পাহাড়ে-জঙ্গলে বেড়িয়ে, মহাকাল দেখে, সবুজ ঝোরার ধারে পিক্‌নিক্ করে, রঙীন মাছের ফটো তুলে ডাক্তার ওদেরই সাথে জীপ্‌এ ক'রে বাগানে ফেরে।

ফেরার পরদিন বাইরের কল্ সেরে এসে নিজের বাসার সেক্রেটারীয়াট্ টেবিলে একগোছা ফুল আবিষ্কার করে—তার সাথে একছত্র লেখা—'ফরগেট মি নট্'। মানেটা অভিধানে দেখবেন।

অভিধান খুললে দেখা গেল, লেখা আছে—Emblems of Peace—অর্থাৎ, শান্তির প্রতীক।

এর পরে কয়েকদিন বনানী ডাক্তারের সাথে হাসিতে আর গল্পেতে মসগুল হ'য়েই রইলো। বৈজ্ঞানিকের কথা যেন তার মনেই নেই। আবার কয়েকদিন পরেই ভাবান্তর। টিকিটিও আর দেখা যায় না তার। এই রহস্যময়ী তরুণীটিকে সে বুঝে উঠতে পারে না। তাকে নিয়ে এ খেলা কেন? মন তার আবার ভেঙে প'ড়তে চায়। মনের এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন ফরেষ্ট অফিস থেকে কল্ আসে।

ঘোলাটে চাঁদ। নিষ্প্রভ হলুদ লণ্ঠনের আলো। আবছা বন। ছাড়া ছাড়া কয়েকটি রহস্যাচ্ছন্ন ঘর। অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁর ডাক। বিচিত্র আরণ্যক নিস্তব্ধতা ভেঙে ডাক্তার সিঁড়ি বেয়ে খাড়া উঠে যায় অনেক উঁচুতে ঘরের কাঠের মেঝেতে।

রোগী নয়—রোগিনী। চোখাচুখি হ'তেই রোগিনী বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে বসে বলে—By jove! আপনি—কনকদা?

—আরে, তন্দ্রা! তুমি এখানে? আশ্চর্য তো!

তন্দ্রা হ'চ্ছে ডাক্তারের ক্যাম্পবেলের সহপাঠিনী। গভীর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিলো তাদের একসময়। তাকে ভালবাসা বলা ঠিক যায় না। দীর্ঘকাল সে সম্পর্ক চ'লবার অবকাশ পায় নি। জীবন সংগ্রামের কঠিনতায় বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছিলো পরস্পর। আবার মিললো এসে এক বিচিত্র পরিবেশে। কিন্তু সে কনক আর নেই।

রোগের প্রবল প্রকোপ সত্ত্বেও তন্দ্রার কথার বিরাম নেই, প্রশ্নের শেষ নেই। শেষে অনেক ক'রে থামিয়ে, রোজ রোজ আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে তাকে ফিরতে হয় অনেক রাতে।

এরপর থেকে ডাক্তার নিয়মিতভাবে ফরেষ্ট অফিসে যেতে আরম্ভ করে। দুজনে বনের ধারে গিয়ে বসে। বনানীর স্মৃতি এইভাবে মুছতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু চাইলেই কি মোছা যায়? মানুষের মনটা কি কাদার তাল যে ইচ্ছামত তাকে আকার দেওয়া যায়?

যেদিন তন্দ্রার আসতে দেরী থাকে সেদিন বনের দিকে চেয়ে থাকে সে গভীর বিস্ময়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে স্তব্ধ স্বপন রাজ্যের ঘুম ভেঙে যায় যেন। যে বন এতক্ষণ ছিলো নিস্তব্ধ-নিঝুম হঠাৎ সেই নিঝুমতার গভীর থেকে কত গান, কত শব্দ, কত ছন্দ, কত স্বপ্ন, কত আভাস, কত সৌন্দর্য, কত কলরব যেন জেগে ওঠে। পেছন থেকে তন্দ্রা এসে বলে—কি একেবারে যে তন্ময় হ'য়ে আছেন কবিদের মত? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—কিছুদিন আগে দেখতাম এক ভদ্রলোক রোজই এসে বনের ধারে বসে হা ক'রে চেয়ে থাকত—আজ মনে হ'চ্ছে সে নিশ্চয়ই আপনি—এই যে আপনার সেই typical জামা।

ডাক্তার লজ্জিতভাবে হাসে, বলে হ্যাঁ। তন্দ্রা বলে—আশ্চর্য! এত কাছে থেকেও চিনতে পারি নি?

এরপরে নানা প্রসঙ্গ চ'লতে থাকে। ডাক্তার শোনে—তন্দ্রার ইতিহাস, তন্দ্রা কনকের।

হঠাৎ ডাক্তার বলে—আচ্ছা তন্দ্রা, তুমি তো রাজনীতি ক'রতে—রাজনীতি কি ছেড়ে দিয়েছো আজকাল? এই চা-বাগান তোমাদের সত্যকার রাজনীতির এমন ক্ষেত্র হ'তে পারে যা তুমি ভাবতেই পারো না।

—ভাবতে পারি ব'লেই তো আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আমি এখানে এসেছি কেন জানেন? গলাটা একটু খাটো ক'রে সে বলে—আমাকে পার্টি থেকে পাঠিয়েছে এখানে মজুরদের সমস্যা বুঝে তাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালাবার জন্যে। অনেকদিন আমার চা-বাগানে কেটেছে। আমার কাকা চা-বাগানের ম্যানেজার ছিলেন বহুকাল। কথাটা কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয় বুঝতেই পারছেন। বিশ্বাস ক'রবেন, এর মধ্যে আমি অন্ততঃ সাতদিন মেয়ে মজুরদের বেশে আপনাদের বাগানে গিয়ে মিটিং ক'রে এসেছি। ওদের মধ্যে আমাদের কমরেড আছে কিছু কিছু।

ডাক্তারের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ে। বলে—বলো কি? তুমি এত কাণ্ড ক'রেছো এখানে এসে?

—হ্যাঁ, এত কাণ্ড ক'রেছি। আসল কাণ্ড তো তবু অনেক বাকি। সাহেব বাগানগুলোয় যেমন কুলিদের ওপর অত্যাচার বেড়েছে, তাদের অখাদ্য, কুখাদ্য দিনের পর দিন দিচ্ছে, তাতে ওইসব বাগানে খুব শীগগিরই কুলি বিদ্রোহ হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে—নিয়মিত খবর পাচ্ছি। আমরা আন্দোলনটাকে সংঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল রূপ দেবার চেষ্টা ক'রছি। তবে বড় কঠিন, একেবারে প্রথম কিনা। বাঙালী

বাগানগুলোও ওদের পদাঙ্ক যেমন অনুসরণ ক'রছে তাতে এইসব বাগানেও আন্দোলনের যথেষ্ট সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা সামনে রেখেই আমরা এসেছি।

—আমরা মানে?

—আমরা মানে—আমি ছাড়াও আরও অনেকে। কুলিদের মধ্যে তো আছেই।

গভীর বিস্ময় ও আশা নিয়ে ডাক্তার ফেরে।

কিছুদিন ডাক্তারের খবরাখবর না পেয়ে বনানী একদিন সাইকেল ছুটিয়ে বনের ধারে যায় এবং ডাক্তারের সাথে তন্দ্রাকে দেখতে পেয়ে অবাক হ'য়ে ওদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যায় সাঁ করে। ডাক্তারকে যে সে চেনে তার আভাসও পাওয়া যায় না। ফেরার সময় ডাক্তারের পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মুখটা কঠিন ক'রে শুধু বলে—ও—ও!

তন্দ্রা অবাক হ'য়ে ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

অসহ্য জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে বনানী। শেষ পর্যন্ত সকালের দিকেই সাইকেল নিয়ে বের হয় এবং তন্দ্রাকে খুঁজে বের ক'রে তার সাথে আলাপ জমিয়ে ফেলে এবং ডাক্তারের সাথে ওর সম্পর্ক, ডাক্তারের জীবনের অজ্ঞাত পরিচয় আভাসে ইঙ্গিতে জেনে নেবার চেষ্টা করে। তন্দ্রার কাছে বনানীর মন উদ্ঘাটিত হ'য়ে যায় অতি সহজেই।......

বনানীর যেন কি হয়েছে। বাইরে সে হাসিখুসী বরং অস্বাভাবিক রকম উচ্ছ্বসিত কিন্তু ভেতরে বেগুনী ডুম্‌এর বেগুনী আলোয় অস্পষ্ট হ'য়ে কী যেন ভাবে সে মাথার ওপরে হাত রেখে ব'সে গভীর রাত পর্যন্ত। সে ভাবনা যেন তার এই বেগুনী দেহের মতই অস্পষ্ট অথচ রঙীন্‌। মাঝে মাঝে এক একটা চাপা নিঃশ্বাস পড়ে তার, আর উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকে ডাক্তারের বাসার দিকে চেয়ে, যেন উৎকর্ণ হ'য়ে থাকে কিসের প্রত্যাশায়।...

হঠাৎ একদিন বাগানের লোকে গভীর আতঙ্কের সাথে শোনে, সাহেব বাগানের কুলিরা ক্ষেপে উঠে বাবুদের মেরে ধরে ঘরদোর তছনছ ক'রে দিয়ে লুটপাট ক'রে বাবুদের তাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক বাবু আহত হ'য়েছেন। কোন ইউরোপীয়ান ইঞ্জিনীয়ার নাকি লজ্জায় আত্মহত্যা করেছেন। বাগানকে বাগান বাবু শূন্য। সাহেব বাগান-গুলোতেই প্রধানত এই বিদ্রোহ ঘটেছে। এক আধজন নয় হাজারে হাজারে কুলি ক্ষেপেছে—সেই আপার শান্ত নিরীহ পোষমানা মানুষ-গুলো। প্রথমে লক্ষীঝোরা বাগানেই গণ্ডগোল বাঁধে। সেখানে এক বুড়ী নাকি তিন দিন কাজ ক'রে সাহেবের কাছে 'চিঠা' চাইতে গিয়েছিলো ব'লে সাহেব বুটের লাথি মেরে ফেলে দেয় তাকে। তারপরেই আসল গণ্ডগোল স্বরু হ'য়ে যায়। অবশ্য আসল কারণ হলো বাগান কর্তৃপক্ষ কুলিদের চাল বাগানের কাঁইয়ার সহযোগে বাইরে চোরাবাজারের উচ্চ লাভের লোভে পাচার ক'রেছেন এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ কুলিদের পচা তেতো ভুট্টা সরবরাহ ক'রেছেন।

একটা কথা সবার মুখেই খুব শোনা যাচ্ছিলো—এই অঞ্চলের পাদ্রীরা খৃষ্টান কুলিদের মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে দিয়ে বাবুদের দিকে লেলিয়ে দিয়েছে। কুলিরা অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সাহেবদের উপরও হামলা করেছিলো। সাহেবরা নাকি বলেছে, আমরা কি ক'রবো—আমাদের হাতে যতদিন রাজত্ব ছিলো ততদিন তোমাদের ভালোভাবে খাইয়েছি। এখন তো তোমাদেরই রাজত্ব। তোমাদের নেতারা খাদ্যের ব্যবস্থা না ক'রলে আমরা কি করবো? আরও নাকি ব'লেছে তারা, নোয়াখালির ঘটনার পরে তোমাদের বাবুদের আত্মীয় স্বজন এসে ভীড় ক'রেছে ব'লেই তো রেশান কমাতে হয়েছে আমাদের। দেখগে বাবুদের বাসায় কত বস্তা বস্তা চাল রয়েছে।

কোন কোন বাগানে কুলিরা নাকি বাবুদেরও ডাক দিয়েছিলো—তোমরাও এসো, আমাদের সাথে যোগ দাও। তবে একটা কথা সবার কাছেই শোনা গেলো—মেয়েদের সম্ভ্রম কোথাও ক্ষুণ্ণ করে নি কেউ।

মেসে রীতিমত উত্তেজিত আলোচনা চ'লেছে। কেউ ব'লছে—এ হ'চ্ছে জওহরলাল মন্ত্রীসভাকে হেয় করার মতলব সাহেবদের, নাহলে ষ্টীল ব্রাদার্স ইচ্ছে করলে চাল সাপ্লাই দিতে পারে না! আমাদের আই, টি, পি, এ দিচ্ছে কি ক'রে তাহলে।

কেউ ব'ললো, মুসলীম লীগের হাত আছে এর মধ্যে। তারা তো ইতিমধ্যেই দাবী তুলতে আরম্ভ ক'রেছে শতকরা পঞ্চাশজন বাবু তাদের মধ্য থেকে নেওয়া চাই। কেউ ব'ললো, এসব কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র। কমিউনিষ্টরা দলে দলে বাগানে ঢুকে প'ড়েছে গোপনে গোপনে শুনে এলাম।

কম্পাউণ্ডার বাবু তার পাকা ভ্রূর নীচে সাদা চশমার আড়ালে কটাশে মণির স্বভাবসুলভ সুতীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে ব'ললেন,—হুঃ, সবই তো কারসাজী শোন্‌লাম—কিন্তু বাবা তিতা ভুট্টা—এয়া কোন্ কারসাজী কও তো দেহি। সবাই হেসে ওঠে কম্পাউণ্ডার বাবুর কথার ভঙ্গীতে।

এর পরে সাহেব বাগান আর বাঙালী বাগানের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে জোর আলোচনা চলে অনেকক্ষণ। সব সুবিধে সত্ত্বেও নিজেদের বাগান সম্বন্ধে মেসের বাবুরা খুব বেশী ভরসা রাখতে পারছে না। কেন না—কুলিদের বঞ্চিত ক'রে ভালো চাল, ডাল, চিনি, ছাতি, কম্বল, কাপড় প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারার কথা ভোলা যাচ্ছে না। ভোলা যাচ্ছে না কথায় কথায় শালা শূয়ার-কো বাচ্চা, একদম কুদায় দেগা, শিখলায়ে দেগা প্রভৃতি অম্ল-মধুর

উক্তিগুলি। তবে মুন্সী তাঁদের ভরসা দিয়ে রেখেছে—কই বদমাইস কুলিই বাগানমে আনেসে হাড্ডি গুঁড়া কর দেগা! ইত্যাদি।

সৌরীনের বাবা যে বাগানে কাজ করেন সেই বাগানের সাহেব সেদিন গভীরভাবে গাঢ় কুয়াসার অন্ধকারকে অগ্রাহ্য ক'রেই মোটর হাঁকিয়ে এসেছে এই বাগানের ম্যানেজার বাবুর কাছে ধানের সাহায্যের আবেদন নিয়ে। সাথে তাঁর বন্দুকধারী গুর্খা রক্ষী। একটা কালো ওভ্যালশেপের স্যুটকেশ ভরা টাকা। চোখে তার ভয়ার্ত-উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সেই রাতেই আবার গোপনে চলে গেলো লরী ভর্তি ধান নিয়ে তারা। লরী চালালো বলবন্ত সিং।

কয়েকদিন পরে উত্তেজনা ওপরে ওপরে শান্ত হয়ে এলো কিন্তু তবু সংসারশুদ্ধ লরীতে গুটিয়ে নিয়ে দলে দলে বাবুদের পলায়নের শোভাযাত্রা কিছুদিন পর্যন্ত থামলো না। বহু কুলি ধরা পড়লো। মিলিটারীতে বাগানকে বাগান ছেয়ে গেলো।

সাহেব বাগানের কুলিবিদ্রোহের খবরে দেবরাজের টনক নড়ে। দেবদুর্লভ স্বয়ং ম্যানেজিং ডিরেক্টার পর্যন্ত ছুটে আসেন বাগানে। ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে জরুরী মিটিং বসে। কম্পাউণ্ডার বাবু তখন ডাক্তারের ঘরে বসে ডাক্তারকে বলছিলেন তার মর্মভেদী তেরছা দৃষ্টিতে চেয়ে—দেখলেন তো মশাই ক্যামন দ্যাবতার মত চেহারাখান। আসলে কিন্তু পাকা শয়তান (ফিসিফিসি)। বাগান খোলার সময় এক পয়সাও খরচা না ক'রে প্রায় তিনভাগের একভাগ শেয়ারই কি ভাবে নিজের নামে কইরা ফ্যালায় উনি। ইয়া ছাড়াও আরও বহুত শেয়ার উনি জলের দামে খরিদ করান গোপনে গোপনে। এমন অনেক বুড়ী বা অশিক্ষিত মানুষে শেয়ার কিন্‌ছিলো যারা ডিভিডেণ্ড পাওয়া তো দূরের কথা বাগানের খবরটা পর্যন্ত রাখতো না। উনি লোক লাগাইয়া তাগো শেয়ার কিন্যা লন্। কমু কি

আর। ওনার লোক বাড়ী বাড়ী গিয়া এমুন সব গল্প কইতো যে মনে হইতো ইয়ার পরে শেয়ার কেউ আর কিনবো না। ইয়ার ফলে আদ্ধেক শেয়ারই এনার পকেটে আইসা যায়। বোঝলেন নি। দিব্যি মজা লুটত্যাছে এখন। ছয়জন ডিরেক্টারের মধ্যে চারজন এখন এনাগো পরিবারের লোক। তাই ইনি যা কইবেন তাই হইবো। জেনারেল মিটিংএর খবর কেইবা রাখে। অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডারই নাকে ত্যাল দিয়া ঘুমান আর ইনি মজা লোটেন। এই হইলো ব্যাপার।

শুধু কি এই—বাগানে কাম করতে করতে চুলে পাক্ ধরলো মশয়, সবই আমার নাড়ীনক্ষত্রে। চাবাগান খোলার আগে ইনি কি করতেন জানেন? একটা ব্যাঙ্ক খুলাছিলেন। স্বরটা খাদে নামিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে—আপনারে বিশ্বাস কইর‍্যা কইতাছি কিন্তু, দ্যাখপেন—হঃ, ব্যাঙ্ক খুইল্যা করলো কি, মিথ্যা গোটা কয় কারখানা খুইল্যা তাগো নামে মোটা টাকা কর্জ লইলো। ব্যস্, কিছুদিনেই ব্যাঙ্ক জ্বাললো লাল বাতি।

এবার সাঁই সাঁই ক'রে বলেন, কমু কি আর, কমু কি—এই বাগানের সব কণ্ট্রাক্টই এনার ভাই, ভাইস্তা, পোলাগো নামে। প্যাকিং বাক্স, যন্তরপাতি সব তান্‌রা সাপ্লাই করেন। একর প্রতি দুই মণ সার লাগলো তো লিখাইলো দশ মণ। বয়লার তিন হাজার দিয়া কিনলো তো লিখাইলো দশ হাজার।

ডাক্তারের বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে বঙ্কিম হাসি হেসে— আরে মশয়, পোলাপান্ বয়স আপনাগো, সংসারের আর চেনলেনই বা কি ছাই। যত বড় বড় লোক দ্যাখপেন, অধিকাংশরই কাণ্ডডা এই। আর এক্টা খবর মাত্রই আপনারে কমু। ইয়া তো মহাভারত কওনের আর শেষ নাই। শুনলে বিশ্বাস করবেন না—বাজারে যে

প্যাকিং বাক্স কিনতে পাওয়া যায় তার চাইতে চার পাঁচ টাকা বেশী দিয়া ওনার ফ্যাক্টরীর প্যাকিং বাক্স এই বাগানকে কিনতে হয়। বিশ্বাস হইবে আপনার এই সব লোকডার চেহারা দেইখ্যা।

ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে এইসব শোনে।

এই বাগানেও গোপনে ইস্তাহার আসতে আরম্ভ করেছে। কে আনে, কোত্থেকে আসে, কিভাবে আসে কেউই বুঝতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ দেওয়ালে আটা দেখা যায়। কুলিরা ভীড় ক'রে সেটা দেখে, কেউ কেউ পড়ে। ম্যানেজারের হুকুম হয়েছে, দেখামাত্র ওসব ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

এ বাগানেও ক্রমে অখাদ্য চাল তার ওপরে তেতো ভুট্টা কোন অজ্ঞাত কারণে কুলিদের ভাগ্যে জুটতে আরম্ভ করে। পেটের জ্বালায় কুলিরা পাগল, বাবুরা নির্বিকার। কুলিদের মধ্যে যেতে হয় বলে ডাক্তার সবই জানতে পারে, বুঝতে পারে। তার সমগ্র অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একদিন সে তন্দ্রাকে গিয়ে বলে—দেখো, তোমাদের রাজনীতি কোনদিন বুঝিনি, বুঝতে পারি নি—কিন্তু, রাজনীতি মানে যদি পচা ভুট্টার হাত থেকে কুলিদের বাঁচানো হয়, তাদের পেটভরে দুটো ভাত খাওয়াবার ব্যবস্থা হয় তবে আমি তোমাদের সাথে। আমাকে দিয়ে গোপনে কোন কাজ করাতে চাও তো করাতে পারো—নিজের জীবনের বিপদ আমি গ্রাহ্য করবো না।

ফলে তন্দ্রাদের কাজ অনেক সহজ হ'য়ে যায়। ডাক্তার বস্তীতে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না। ডাক্তার এদের দলের লোকের সাথে পরিচয় ক'রে নিয়েছে। তাদের নিয়ে গিয়ে গোপন ইস্তাহার দেয়, জরুরী খবরাখবর দেয়।

তরুণের সাথে ডাক্তারের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মেছে ইতিমধ্যে। সে-ও বুদ্ধি দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে এদের সাহায্য করে গোপনে। কখনও কখনও লুকিয়ে বস্তীতেও যায়। তন্দ্রার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে তন্দ্রা বলেছিলো,—কিন্তু আপনার বাবার সাথেই যে আপনাকে লড়াই করতে হবে, পারবেন ?

হেসে তরুণ ব'লেছিলো, লড়াই তো আমার বাবার বিরুদ্ধে নয়, কোম্পানীর ডিরেক্টারদের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টারের বিরুদ্ধে। বাবার পরামর্শ নিলে ওরা তো লাভবানই হ'তো সব দিক থেকে। আর তাছাড়া সত্যের কাছে বাবা-মা ছোট। আপনি আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আমার এটা সৌখীন বিলাস মাত্র নয়, এ আমার গভীর জীবনবোধের প্রকাশ। তরুণের কণ্ঠস্বরে তন্দ্রা অবাক এবং ততোধিক উৎসাহিত হ'য়েছিলো।

এই সময়ে মার্টিনের বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'য়ে গেলো। মার্টিনের বৌকে একদিন রাত্রে অন্যের ঘরে অবৈধ অবস্থায় দেখা যায়। অনেক সহ্য করেছিলো মার্টিন, আর পারে নি। ফলে, ওকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। এখন সে আবার ফুলকেরিয়ার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। বস্তীর গোপন সভার ফুলকেরিয়া একজন উৎসাহী পাণ্ডা। পার্টির সাথে ওর যোগাযোগ ঘটেছে। ওদের উদ্দেশ্যের কথা ওকে খুলে ব'লেছে। মনের নিভৃতে জীবনের যে ক্ষুধা একদিন ঘুমন্ত ছিলো—যা থাকে প্রতিটি মজুরের জীবনে, সেই ক্ষুধা জেগে ওঠে তার লাস্যময়ী দেহের আনাচে-কানাচে। ঠিকই তো বাঁচতে তাদের হবে মানুষের মত। তেতো ভুট্টা আর পচা চালের জীবন কিছুতেই সে সহ্য করবে না। যে চোখ থেকে এর আগে রক্ত কটাক্ষ ঝ'রে পড়তো সেই চোখ থেকে এখন রুদ্র-বিক্ষোভের আগুন ঝ'রে পড়ে। মার্টিনকে সে ব'লেছে— বাঁচবি তো মরদের মত বাঁচবি মার্টিন—বুঝলি।

মুন্সী বস্তীর গোপন মিটিং-এর খবর জানতে পেরে ম্যানেজারকে জানায়। ম্যানেজার জানান ওপরে। ঘন ঘন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মোটর আসে। রমেশকে অষ্টপ্রহর তারই আশে পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ফিসিফিসি কত কি সে লাগায়।

একদিন অনেক রাতে ফিরছিলো ডাক্তার। সাঁ ক'রে একটা তীর তার পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়। তীরটা কুড়িয়ে পেয়ে ডাক্তার অবাক হয়। একটু ভয়ও হয়, কে তীর মারবে তাকে এত রাতে? চ'লতে চ'লতে সাঁ ক'রে একটা ছায়া চা-গাছের পাশে স'রে যায়। একটু ভীত অথচ কৌতূহলী হ'য়ে সে এগিয়ে গিয়ে দেখে—এলিজাবেথ। ভীত-সন্ত্রস্ত চোখ ছুটো একবার ডাক্তারের দিকে মেলছে আবার মাটিতে নামাচ্ছে। স্বভাবসিদ্ধভাবে এক হাত তার মাথার ওপরে, আর একহাতে আধখানা ছেঁড়া রুটি। এত রাতেও রুটির সন্ধানে ফিরছে ও। সাপ-বাঘের ভয় নেই। ও যেন চা-বাগানের ক্ষুধিত আত্মা। ডাক্তার অবাক হ'য়ে বাসায় ফেরে।

গভীর রাত। সমস্ত বাগান নিঝুম। ম্যানেজারের খাস কামরায় ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর ম্যানেজার মুখোমুখি বসে। ধীরে ধীরে ম্যানেজিং ডিরেক্টার পকেট থেকে একখানা লেখা কাগজ বের ক'রে বলেন, এই জায়গায় একটা সই দাও তো অশোক।

কাগজটার দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়েই চমকে ওঠেন ম্যানেজার বাবু। হাতের আঙুলগুলো তাঁর কাঁপতে থাকে। ম্যানেজিং ডিরেক্টার অপাঙ্গে চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে। কাগজটার দিকে চেয়ে থেকেই ম্যানেজার বাবু বলেন, এ তো আমি পারি না।

ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসির রেখা মিলিয়ে যায় ম্যানেজিং ডিরেক্টারের, বলেন, কেন পারো না?

ম্যানেজার বলেন, আমি জানি ওসব খরচ বাগানে সত্যি সত্যি হয় নি। আড়াই লক্ষ টাকার মিথ্যা বিল্ পাশ ক'রলে আমার সম্ভ্রম, আমার প্রতিষ্ঠা সব শেষ হ'য়ে যাবে। এতকাল যে সম্মানের ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি—

—কিন্তু সে তো মিথ্যা সম্মান অশোক। তুমি ভালো ক'রেই জানো, মিথ্যা এবং শোষণের ওপরেই চা-বাগান দাঁড়িয়ে আছে, তবে কেন জেনে শুনে—। একটু চাপা ভাবে বলেন তিনি—কিন্তু এটা জানতে তো পারবে না কেউ!

—কিন্তু আমি তো জানতে পারবো, কোন্ মুখে আমি আর তাদের সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবো?

—যে মুখে আজও দাঁড়িয়ে আছো।

—কিন্তু এই মুখের জন্যেই যে এ বাগান আজও কুলি বিদ্রোহ এড়িয়ে আসছে।

—কিন্তু তোমাকে যে পুত্রতুল্য স্নেহ করি সে কথা ভুলে যেও না।

—আশীর্বাদ করুন, পুত্রের মর্যাদা যেন রাখতে পারি।

হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মুখ থেকে কোমলতা ও সৌজন্যের মসৃণ পর্দাটা মিলিয়ে যায়। পকেট থেকে আরও কয়েকখানা কাগজ বের ক'রে তিনি বলেন, কিন্তু এর কি উত্তর দেবে অশোক? তোমার ছেলে যে কুলিদের ক্ষেপাচ্ছে আর তুমি যে গোপনে গোপনে তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছো এ কোন্ সততা? চোখ দুটো তাঁর জ্বলে ওঠে দপ ক'রে।

—গোপনে গোপনে আমি প্রশ্রয় দিচ্ছি?

—না তো কি। তোমার প্রশ্রয় না পেলে বাগানে ব'সেই বাগানের শত্রুতার সুযোগ পায় সে কি ক'রে? একজন বিশ্বাসী লোকের কাছেই আমি এ খবর পেয়েছি জেনে রাখ।

—কিন্তু—

সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিনি বলেন—ও সব কিন্তু টিন্তু নেই, আজ থেকেই সব কিন্তু শেষ হ'য়ে গেলো। তোমার ছেলেকে অবিলম্বে বাগান থেকে সরাতে হবে। বিল্ অবশ্য আমি পাশ করাতে পারবোই। ম্যানেজিং ডিরেক্টার সশব্দে বেরিয়ে যান হিংস্র বাঘের মত।

অনেক রাত পর্যন্ত উত্তেজিতভাবে পায়চারী করেন ম্যানেজার—একদিকে পুত্রস্নেহ অন্যদিকে চাকুরী; একদিকে সত্য আর এক দিকে আকাশজোড়া মিথ্যা; একদিকে নিরাভরণ দারিদ্র্য, অশেষ দুঃখ-ক্লেশ অন্যদিকে অপার সুখ-ঐশ্বর্য আড়ম্বরের জৌলুষ—কোন্‌টা বেছে নেবেন তিনি? তাঁর ব্লাড্ প্রেসার লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। পেছন থেকে এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকে বনানী—বাবা।···

ম্যানেজার আর তরুণ সামনা-সামনি ব'সে। একটা থমথমে নিস্তব্ধতা তাঁদের ঘিরে রেখেছে। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ম্যানেজারবাবু তরুণকে বলেন—তোর বাপ-ঠাকুর্দাকে বুড়ো বয়সে পথে বসাতে চাস্ তরুণ?

সহজ এবং সপ্রতিভভাবে তরুণ বলে—কেন?

—গোপনে গোপনে কুলিদের ক্ষেপাচ্ছিস্ তুই?

—কুলিদের তো আমি ক্ষেপাচ্ছি নে বাবা, ক্ষেপাচ্ছে তোমাদের ডিরেক্টাররা। রেশান্ কমাতে কমাতে তোমাকে নিমিত্ত রেখে তাদের কি হালে এনেছে! যা পায় তাও পচা ভুট্টা—তাতে আবার পাথর। আমি তো ক্ষেপাচ্ছি নে তাদের, বরং ঠাণ্ডা মাথায় সংঘবদ্ধভাবে দাবি জানাবার পরামর্শ দিচ্ছি মাত্র।

—কিন্তু আমাদের বাঁচার পথ বন্ধ ক'রে? একবার ভাবছিস্ নে যে পথে যাচ্ছিস্ তুই সে পথে তোর বাপ্ মা ভিক্ষার পাত্র হাতে ক'রে দাঁড়াবে গিয়ে। ভেবেছিলাম, তুই একটা মানুষের মত মানুষ হয়ে ফিরে আসবি—

—আমি তো মানুষ হ'য়েই ফিরেছি বাবা, বাবার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলে। তুমি তো ছোট বেলা থেকেই শিখিয়েছো, সত্যের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, মানুষের অবিচারের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন চিত্তে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে!

—কিন্তু আমি তো আরও একটা চেয়েছিলাম তরুণ, জগতের একজন সেরা ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে পাঁচজনের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়াবি তুই—

—সে সঙ্কল্প আমার আজও আছে বাবা। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারও তো মানুষ, যন্ত্র তো সে নয়। মানবতার আহ্বান তো তারও কানে এসে বাজে। ক্ষুধিত জনতা তো আমার ইঞ্জিন চালাতে পারবে না, আমি চাই, পারিপার্শ্বিক জগত আমার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার হবার অনুকূল হ'য়ে উঠুক। আজকের রাষ্ট্রে প্রতিভার বিকাশের সুযোগ কোথায়? তুমি তো ভালো ক'রেই জানো বাবা ধনীদের খেয়াল পরিতৃপ্ত করাই বর্তমানে কারখানার ইঞ্জিনীয়ারদের প্রধান কৃতিত্ব—উদ্ভাবনী শক্তির দাম কতটুকু? তার সুযোগই বা কই? তুমি তো বোঝ, যতদিন বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনীয়ার তার সৃষ্টিপ্রতিভা প্রকাশের পরিপূর্ণ ক্ষেত্র না পাচ্ছে, যতদিন মুনাফার চাকায় তার ক্ষমতা থাকছে জড়িয়ে, ততদিন সে বৈজ্ঞানিক নয়, ইঞ্জিনীয়ার নয়—সে খেয়ালীর খেয়ালে বাঁধা একজন সামান্য ক্রীতদাস। আমি ক্রীতদাস হ'তে রাজী নই।

—আদর্শের দিক থেকে তোর কথা ঠিক কিন্তু আদর্শ ও বাস্তব তো এক নয় তরুণ।

—এক নয় বটে, কিন্তু দুয়ে মিলেই একের পরিপূর্ণ রূপ। অসহায় বন্ধ্যা, বিকলাঙ্গ আদর্শের পৃথিবীতে স্থান নেই বাবা।

—কিন্তু তোর বাপ মায়ের স্থান আছে তো পৃথিবীতে?

তরুণ একটু ক্ষীণ ও দুর্বল হাসি হাসে। সহজভাবে উত্তর দেয়—আমার বাবার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, বিশ্বাস আছে এইটুকুই শুধু বলবো।

—কিন্তু বাস্তবে সে কথার অর্থ কি তরুণ? একবার কল্পনায় দেখ, তোর জন্মে তোর বাবা পথে পথে চাকরী ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছে। তোর মা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে বসে; ভাই-বোনগুলো ক্ষুধার্ত হ'য়ে কাঁদছে,—তখন?

তরুণ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—আদর্শের জন্মে সংগ্রাম ক'রতে গিয়ে তেমন দিন যদি কখনও আসে, আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান মনে করবো নিজকে। ভাববো, মানুষের সাথে এক হ'য়ে মেশার পথে যে সীমারেখা ছিলো আমার সে সীমারেখা শেষ হ'য়ে গেলো।

—বলিস্ কি, তুই এত অকৃতজ্ঞ তরুণ! তোর সমস্ত অতীত ভুলে গেলি? একবারও ভাবলি নে তোকে কি অমানুষিক কষ্টে মানুষ ক'রতে হ'য়েছে তোর বাপ-মাকে। জন্মেছিলি তুই এতটুকু হ'য়ে। Body Temperatureও ছিলো না তোর। তোর মা আর আমি রাত নাই, দিন নাই তোকে বুকে ক'রে রেখেছি। নিজেদের Body Temperature দিয়ে তোকে বাঁচিয়েছি। তারপরও কত ঝড় ঝঞ্ঝা—এক নিমেষে সব ভুলে গেলি তরুণ?

লজ্জারুণ মুখে তরুণ বলে—ভুলিনি বাবা, বরং বেশী ক'রে মনে করেছি সে কথা। তাই আমার বন্ধু-বান্ধব যেখানে আছে আমাকে বাবা-maniac ব'লে খেপায়। সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচলিত থেকেই তোমাদের সে ঋণ শোধ ক'রবো আমি।

—কিন্তু তা গ্রহণ করার ক্ষমতা তোর প্রৌঢ় বাপের নেই—সে বড় দুর্বল, বড় অসহায়। শেষের দিকে ম্যানেজার বাবুর কণ্ঠে এক চরম অসহায়ের বেদনা ফুটে ওঠে।

'ব্যথিতস্বরে তরুণ বলে, তোমার বিপদ আমি বুঝেছি বাবা। সে বিপদ থেকে অব্যাহতি দিতে চাই আমি তোমাকে। এখান থেকে আমি চলে যাবো—

ম্যানেজার বাবু একবার চমকে ওঠেন। দু'হাতের মধ্যে মাথা রেখে অনেকক্ষণ ঝিম ধ'রে পড়ে থাকেন। শেষে ধীরে ধীরে যখন মাথা তোলেন তখন দেখা যায় ম্যানেজার বাবুর জুঁইফুল শুভ্র গণ্ড বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। ঠোঁটটা কামড়ে ধরে তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে বলেন—তাই যা তরুণ। কোথাও গিয়ে তুই কোন ভালো কাজের চেষ্টা দেখ। একদিন আমিই তোকে যেতে দিতে চাই নি। আজ আমাকেই ব'লতে হ'চ্ছে, তুই যা। বাপ যদি হোস্ কোনদিন, তো বুঝতে পারবি, কি অসহ্য যন্ত্রণায় আমি এই কথা ব'লছি। তোর লক্ষ্য, আদর্শ আমি পরিত্যাগ করতে ব'লছি নে, বরং তোর এই বলিষ্ঠ, সতেজ আদর্শ নিষ্ঠা পুত্রগর্বে আমার বুক ভরে তোলে। কিন্তু আমরা যে গৃহী, সংসারে চ'লতে গিয়ে চারিদিকের সাথে আমাদের আপোষ ক'রে চ'লতে হয়। আমরা দুর্বল তাই অসহায়।

ম্যানেজার বাবুর বেদনা পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে তরুণ বলে—যাওয়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই বাবা চাল আর পচা ভুট্টার জন্যে কুলিদের সামনে ডিরেক্টাররা তোমাকে scapegoat (বলীর ছাগ) হিসেবে ব্যবহার করছে কিন্তু। ওদের পেট ভরবার মত চালের ব্যবস্থা যদি অচিরে না করতে পারো তাহ'লে তোমার এতকালের সুনাম শুধু নয়, প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে এই আমি

বলে যাচ্ছি। হাজার হলেও অশিক্ষিত অসংযত মজুর তো। তোমার জীবনের মূল্যে ডিরেক্টাররা মুনাফা লুটবে। মজুরদের খাওয়াতে না পারলে তোমার পক্ষে একটি পথই খোলা—পদত্যাগ।

—সে কথা আমিও ভাবছি তরুণ, রাতদিনই ভাবছি—

—কিন্তু ভাববার আর সময় নেই বাবা, এর পরে দেরী হ'য়ে যাবে।

রাত গভীর হ'য়ে গিয়েছিলো। ঘড়িতে দুটো বাজতে দু'জনেই শশব্যস্তে উঠে পড়েন। পরদিন এক নিদারুণ অশ্রুসজল আবহাওয়ার ভেতর তরুণ বিদায় নিয়ে চলে যায়।

বনানী জানালা দিয়ে চেয়ে আছে ডাক্তারের কোয়ার্টারের দিকে আজ বৈজ্ঞানিকের কাছে সেতার বাজাবার সময়ে মনটা তার অন্যমনস্ক, উদাসীন। বৈজ্ঞানিক তার ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে একটু ভর্ৎসনা করলেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি। রাত্রির তরল অন্ধকারে সে রমেশকে ডাক্তারের বাসার সামনে কেমন সন্দিগ্ধভাবে ঘোরাফেরা ক'রতে দেখে। রমেশের সাথে ডাক্তারের কেমন সদ্ভাব ছিলো এবং ইদানীং সেটা কতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো তা সে জানতো। তাই সে সেতার বাজনা বন্ধ ক'রে কৌতূহলী হ'য়ে বাইরে ঝুল বারান্দাটায় বেরিয়ে আসে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো কুলি ডাক্তারের বাসা থেকে সন্দিগ্ধভাবে বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ দূর থেকে বনানীর সাথে রমেশের চোখাচোখি হতেই রমেশ তাড়াতাড়ি ওখান থেকে স'রে পড়ে। ব্যাপারটা বনানীর কাছে আদৌ ভালো মনে হয় না। বিশেষতঃ সে জানতো ডাক্তার তখন বাড়ী নেই। পথ জনশূন্য। সেদিন সোমবার। ছুটি।

বনানীকে শশব্যস্ত অবস্থায় বাইরে বেরোতে দেখে বৈজ্ঞানিক বলেন—কি হ'লো, হঠাৎ বাইরে যাচ্ছো যে? বনানী বলে—কিছু না। এই এমনি একটু।

পরদিন বাগানের লোক হতভম্ব হ'য়ে শোনে ডাক্তারের কোয়ার্টার থেকে চা বোঝাই কয়েকটা বড় বড় প্যাকিং কেস্ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। আবিষ্কর্তা রমেশ। ডাক্তারের অব্যবহার্য অন্ধকার-অন্ধকার একটা ঘর ছিলো, সেই ঘর থেকে আবিষ্কৃত হ'য়েছে। রমেশ ম্যানেজার-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেটা বের ক'রেছে। ডাক্তার নাকি গোপনে গোপনে চায়ের চালানি কারবার খুলেছিলো ফ্যাক্টরীর মজুরদের সাথে বন্দোবস্ত করে। ডাক্তারের মত লোকের বিরুদ্ধে এমন একটা অবিশ্বাস্য হীন অভিযোগ ম্যানেজার উড়িয়েই দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাহস পান নি। রমেশকে ভয় করতেন তিনি। ওপরওয়ালার সাথে তার ক্রমবর্ধমান দহরম-মহরমের কথা তিনি জানতেন। বিশেষত রমেশ নাকি নিজের চোখে রাত্রে চায়ের বাক্স সরাতে দেখেছে।

ম্যানেজার বাবুর মুখখানা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে ওঠে। তরুণের করুণ বিদায়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত। উদ্‌ভ্রান্তভাবেই তিনি ব'লতে থাকেন—কনক চা চুরি করবে। এ যে নিজের চোখে দেখ্‌লেও আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। এ কেমন হ'লো!

বাগানের অনেকেই এ কথা বিশ্বাস না ক'রলেও ম্যানেজিং ডিরেক্টার যথারীতি এলেন। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কয়েকজনকে নিয়ে গোপন তদন্ত বৈঠক ব'সলো। ডাক্তার সগর্বে মাথা উঁচু ক'রেই তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অঞ্জু মঞ্জুকে গোপনে পাঠিয়েছিলো বনানী, তারা এই খবর এনেছে। উদ্‌ভ্রান্তভাবে নিজের ঘরে দাঁড়িয়ে বনানী তার কর্তব্য ঠিক ক'রছিলো। পিঠের ওপর বিস্রস্ত একগোছা চুল। কর্তব্য ঠিক ক'রে তর তর ক'রে সে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন অস্বাভাবিকরকম ঝক্‌ঝকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই রমেশ দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে—কোথায় চলেছো বনানী?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কঠোরভাবে বলে—আপনাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

—না, আমাকে দিতে হবে কেন, 'কাকু' হ'লে বোধ হয় দেওয়া চ'লতো, কি বলো ? অপাঙ্গে সে একবার বনানীর মুখের দিকে চায়।

—কি ব'ললেন ? মুখ সামলিয়ে কথা ব'লবেন।

—সুখী হলাম সে কথা শুনে—ব্যঙ্গের হাসি হেসে রমেশ বলে—কিন্তু যে জন্যে যাচ্ছো তাতে বিশেষ সুবিধা হবে না কিছু। চরিত্রের অপবাদ নিতে না চাও তো ফেরো।

—উঃ, দারুণ একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে ওঠে বনানীর মুখে চোখে। মুখ ফিরিয়ে সে বলে—আপনাকে না আমি বড়দা বলি।

—সত্যি তো আর আমি বড়দা নই—রমেশের চোখে এবার হিংস্র-ক্ষুধাতুর দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হয়।

—তা জানি, আপনি সে শ্রদ্ধার আসনের অধিকারী নন। রমেশ হঠাৎ গিয়ে এগিয়ে খপ্ ক'রে বনানীর হাত ধরে। গর্জে উঠে বনানী এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝড়ের মত ইনস্‌পেক্‌সান্ বাংলোর দিকে ছুটতে ছুটতে বলে—আপনার এত বড় স্পর্ধা, দাঁড়ান।

তদন্ত কমিটির সভ্যদের সামনে সে এক দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং হাঁপাতে হাঁপাতে এক নিঃশ্বাসে ব'লতে থাকে ডাক্তারকে দেখিয়ে—উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আমি জানি। কাল রাত্রে আমি যখন বারান্দায় পায়চারী করছিলাম তখন বড়'দাকে কুলির মাথায় কয়েকটা বাক্স নিয়ে ওই বাসায় আমি ঢুকতে দেখেছি। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বলতে পারি এটা বড়'দা অর্থাৎ রমেশবাবুর ষড়যন্ত্র।

সবাই অবাক্ হ'য়ে ওর মুখের দিকে চায়। ম্যানেজার বাবুর চোখ জোড়া গভীর আনন্দে চক্‌চক্ ক'রে ওঠে। তিনি কেঁদে ফেলবেন বোধ হয়। ঘড়িটার শব্দ শোনা যায় টিক্ টিক্।

বনানীর কথিত মজুর দুটোকে তখনই তলব করা হয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে এসে সব ফাঁস ক'রে দেয়। মোটা বখ্‌সিসের লোভ দেখিয়ে রমেশ ওদের রাজী করিয়েছিল। শেষে কেবল টালবাহানা করাতে তাদেরও মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেছে। তাই তারা সব ফাঁস ক'রে দেয়। এমন কি সেই একদিন রাত্রির তীর মারার কথাও।

হঠাৎ যে চৌকীদারটা ডিভিসান্‌ থেকে নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ নিয়ে আসে এবং যে স্ফীংস্‌-এর মতই নির্বাক-রহস্যময় সেও ধীরে ধীরে এসে বলে যে সে কাল যখন কাগজ নিয়ে ফিরছিলো তখন ওদের দেখেছে। লোকটা যে অতগুলো কথা একসঙ্গে ব'লতে পারে তা কেউ ভাবতে পারে নি' কোনদিন। অভিযোগমুক্ত ডাক্তারের হৃদয় বনানীর প্রতি অপার কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

রমেশ এইবার ফ্যাসাদে প'ড়ে যায় সে আমতা আমতা করতে থাকে। ডিরেক্টাররা কিন্তু ডাক্তারকে জড়াবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলো।······

যে চরম ক্ষণটির জন্যে সমগ্র বাগানের আবহাওয়া প্রস্তুত হচ্ছিলো এবং যে চরম ক্ষণটিকে লক্ষ্য রেখেই তার সব উত্তাপ, সব দাহশক্তি সঞ্চিত ক'রছিলো অবশেষে সেই ক্ষণটিরই রক্তরাঙা অভ্যুদয় ঘটে। মজুরদের অবস্থা সহনশীলতার চরম প্রান্তে উপনীত হয়। ফলে চাপা বিক্ষোভ সেইদিন ফেটে পড়ে। একটা সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা 'জয় হিন্দ, ইনকেলাব জিন্দাবাদ, খাদ্য চাই, তিতো ভুট্টা বন্ধ কর, মজুরী বৃদ্ধি কর, ছয় মাসের বোনাস্‌ আমরাও চাই প্রভৃতি শ্লোগান তুলে সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে ম্যানেজারের বাংলোর দিকে এগিয়ে আসে।

বাগানের ছোট ম্যানেজার সুধীর'দা সেই শব্দ শুনে রামনাম জপ করেন! কলির শেষ হ'য়ে আসছে তাঁর মনে হয়। প্রতিটি বাবুর

কানে এবং প্রাণে সেই স্বর এসে বাজে। ডাক্তারও শোনে। লাফিয়ে উঠে ব'সে সে ভাবে—ওঃ, আজই তো সেইদিন! তাকে তো ব'সে থাকলে চলবে না। মজুরদের পাশে গিয়ে প্রকাশ্যে দাঁড়াতে আজ আর তার লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই। তার সব শালীনতার বাঁধ ভেঙে গেছে। একটা কলুষিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার নিজের প্রতিবাদের সঙ্কল্প নিয়ে তার পা দুটো আপনিই খাড়া হ'য়ে ওঠে। সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে চকিতে একবার মনে হয়—বনানী এ কয়দিন একবারও এলো না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটা পর্যন্ত দিলো না। অভিমানভরে তার মনে হয়—থাক্‌গে ও চিন্তার আজ আর অবসর নেই। হয় তো বনানীর সাথে বিচ্ছেদের সীমারেখা অঙ্কিত ক'রেই আজ আওয়াজ উঠছে জয়হিন্দ্‌। ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যায় একে-দুয়ে বস্তীর সমস্ত মজুর—মার্টিন, ফুলকেরিয়া, শালমা, ফুলমই জীতু, পীরজু, আলফ্রেড, লুই, বাগানের বড় মালি, এমন কি এক টুকরো রুটি হাতে এলিজাবেথ পর্যন্ত। সে ভেবেছে বোধ হয় ওদের সাথে যোগ দিলে রুটি পাওয়া যাবে।

যারা এতদিন ছিলো অতলস্পর্শী নীরতা ও রহস্যময়তায় ভরা, সাত চড় মারলেও কথা বলে নি, তাদের মুখেও আজ এমন বলিষ্ঠ ভাষা। জীবনের জয়গান ফুটেছে।

সুশৃঙ্খলভাবে শোভাযাত্রা এঁকে বেঁকে এগিয়ে আগে। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটতে ছুটতে শ্রান্ত-ক্লান্তভাবে ডাক্তারের পেছনে এসে দাঁড়ায়—বলে, বড্ড দেরী হ'য়ে গেলো।

অদূরে বড়বাসার রেলিং-এ ভর দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলো অঞ্জু, মঞ্জু, বৈজ্ঞানিক, বনানী, এমন কি সদাপ্রসন্ন দাদু পর্যন্ত। বনানীকে দেখিয়ে তন্দ্রা বলে—ওই দেখুন বনানী।

ডাক্তার চকিতে একবার সেদিকে চেয়ে বলে—বনানী ওপরের মানুষ ওপরেই থাক্, ও নেমে আসবে না তন্দ্রা। নীরব অভিমানে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে।

শোভাযাত্রা বড় বাসার একেবারে কাছে এসে পড়েছে। বনানীর পায়ের তলা থেকে পৃথিবী স'রে যাচ্ছে। সে ভাবছে, সে ছুটে গিয়ে ওদের দলে যোগ দেয়, ডাক্তারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যুগযুগান্তের সঞ্চিত সংস্কারের বেড়া তার আর ডাক্তারের মাঝে প্রাচীর তুলে দাঁড়ায়। আজ স্পষ্ট করে সে বোঝে এই বেড়া ডিঙোবার ক্ষমতা তার নেই। হঠাৎ তার মনে হয়, এক চির-বিচ্ছেদের গলিত গ্লেসিয়ার মৃত্যুরূপে তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। সে ছুটতে যায়, কিন্তু মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাদের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও শোভাযাত্রা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে। মজুররা সামনে হঠাৎ পুলিশবাহিনী দেখে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে। বাগানের প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরে ম্যানেজিং ডিরেক্টার সদর থেকে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাদের পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়।

হঠাৎ আকাশে কালো ধোঁয়া দেখা যায়। চীৎকার ওঠে—আগুন! আগুন! বড় বাসায় আগুন দিয়েছে কুলিরা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলো বাসা থেকেও চীৎকার ওঠে আগুন, আগুন—বাঁচাও! বাঁচাও! নারীকণ্ঠের ভীত চীৎকার। লুঠ পাটও চলতে থাকে। তন্দ্রাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। পুলিশ ইনস্পেক্টার বেশ একটু ভীত হ'য়ে পড়েন। শোভাযাত্রাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাতে উদ্যত হ'য়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর হাত স্থির হ'য়ে যায়। হতভম্ব হ'য়ে যান তিনি। ডাক্তারও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে ব'লে ওঠে—আরে! অর্থাৎ, ডাক্তার এঁরই বাসায় থেকে তার ডাক্তারী বিদ্যা অর্জন করে।

ওদিকে বড়বাসায় 'আগুন', 'আগুন' রব ওঠার সাথে সাথে এবং বনানীর মূর্চ্ছার খবর পেয়ে ব্লাড্‌প্রেসারে শয্যাশায়ী উত্তেজিত ম্যানেজার বাবু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বন্দুক নিয়ে ছোটেন উন্মত্তভাবে এবং তাঁর স্ত্রী হাউ মাউ ক'রে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেও বন্দুকের ট্রিগারটা স্থানচ্যুত হ'য়ে গর্জন তোলে গুড়ুম গুম্‌। শোভাযাত্রার সামনে ছিলো পতাকা ঘাড়ে ফুলকেরিয়া। ম্যানেজার বাবুকে বন্দুক হাতে ছুটে আসতে দেখেই তার পার্শ্বস্থিত মার্টিন পতাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দেয়। ছুটন্ত গুলি এসে বিদ্ধ করে মার্টিনের বুক। মার্টিন লুটিয়ে পড়ে। এক ঝলক তাজা রক্ত অভিষিক্ত করে মাটি। অভিষিক্ত করে ফুলকেরিয়াকে। ফুলকেরিয়া মার্টিনকে বুকে জাপটিয়ে ধরে। সমস্ত ঘটনাটা পর পর নিমেষে দ্রুত ঘটে যায়।

এই সব দেখে ভীত হয়ে বৈজ্ঞানিক তল্পি-তল্পা নিয়ে বাগান থেকে সরে পড়েন।

জ্যোৎস্না টী এষ্টেট্‌ নীরব অনেকদিনই হ'য়েছে—কিন্তু এমন নীরব কোনদিন হয় নি। মেরুপ্রদেশের অতলস্পর্শী নীরবতা যেন তার বুক চেপে ব'সেছে।

জ্যোছনা রাত। এমন নিষ্ঠুর-নীরব জ্যোছনা বাগানের লোক কোনদিন দেখেনি। রাত গভীর। সেই গভীর রাতে সদ্য-রচিত একটা কবরের পাশে ব'সে কে সেই কবরের ওপর থোকা থোকা সাদা ফুল সাজিয়ে দিচ্ছে। মার্টিনের কবরের ওপর ফুলকেরিয়ার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। সেই রাতে আর একজনেরও ঘুম নাই। ঘুরতে ঘুরতে সে-ও কবরের উপান্তে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং পা টিপে টিপে এগোতে এগোতে সেই ধব্‌ধবে সাদা মূর্তিটির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর

কার্যকলাপ দেখতে থাকে। একটু পরে তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু স্নিগ্ধস্বরে বলে—কাঁদছিস কেন ফুল (ফুলকেরিয়ার কান্নার কম্পন সে অনুভব করছিলো)—তুই তো মার্টিনকে মরদ হ'তে দেখতে চেয়েছিলি—ও তো তাই হ'য়েছে। ওর মত মরদ হবার সৌভাগ্য ক'জনার হয়রে। মার্টিনকে ভালবাসতিস্ তুই তা জানি, কিন্তু মার্টিনকে ভালবাসে না এমন মানুষ কে আছে রে আজ। তোর দুঃখের অংশ তারা সবাই নেবে। সেই তোর সান্ত্বনা।

ডাক্তারের স্পর্শে ফুলকেরিয়া মুহূর্তমাত্র চমকেছিলো, তারপরে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলো অঝোর জ্যোছনার তলে ওই পবিত্র-শুভ্র কবরের মতই। তার চোখ বেয়ে পবিত্র জলধারা গড়িয়ে পড়ছিলো। বেঁচে থেকে যে মার্টিন ফুলকেরিয়ার পূর্ণ হৃদয় পায় নি, আজ পবিত্র মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে সে তাকে পেয়েছে—সম্পূর্ণরূপেই পেয়েছে। প্রেমের এমন বিজয় পৃথিবী ক'দিনই বা দেখলো?

কিন্তু সেই মুহূর্তে কেউ লক্ষ্য করলো না একটু দূরে বাগানের আলোছায়ায় আবৃত হয়ে ভেজা চোখে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি রহস্যময়ী মূর্তি। কেউ জানলো না সে কে। সে কি মানুষ? কি চায় সে?

শেষ